পৌরাণিক বাগধারা

নাবীল অনুসূর্য

পৌরাণিক বাগধারা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পৌরাণিক বাগধারা

নাবীল অনুসূর্য

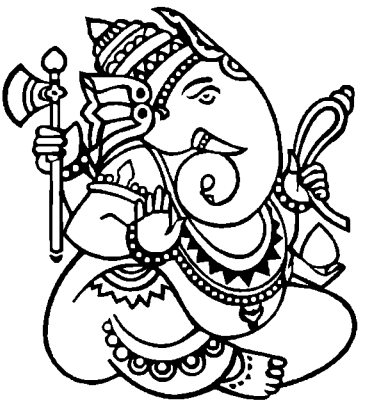

অবসর

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সোহেল মোহাম্মদ রানা

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8798-03-1

POURANIK BAGDHARA (Mythological Idioms) by Nabeel Onusurjo
Published by Abosar Prokashana Sangstha.
46/1, 46/2 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : February 2017. Price : Taka 350.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৪৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬২৬০২৪০৯০

বিকাশ পেমেন্ট
০১৭২০৩০৪০৭২, ০১৭১১৫৪২০০৭

Website : **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, protikbooks@gmail.com
abosarprokashoni@yahoo.com

Online Distributor
www.rokomari.com/abosar, Phone : 16297, 01519521971
www.rokomari.com/protik, Phone : 16297, 01519521971
www.sorbonam.com, Phone : +88 01511008877

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শহীদুল জহির
যাঁর লেখা আমার ভীষণ প্রিয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা তের

রামায়ণ ২১-৭২

রাম না হতেই রামায়ণ ২৩
শাপে বর ২৪
ধনুকভাঙা পণ ২৫
কাল রাম রাজা হবে, আজ রামের বনবাস ২৮
লক্ষ্মণের ফল ধরা (ধর লক্ষ্মণ) ২৯
দেবর লক্ষ্মণ (লক্ষ্মণের মতো দেবর হোক) ৩১
মান্ধাতার আমল ৩২
যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ ৩৪
রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব (রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ, মারীচের দশা) ৩৭
এক রামে রক্ষা নাই দোসর সুগ্রীব (দোসর লক্ষ্মণ) ৪০
অকালবোধন ৪২
ঘরের শত্রু বিভীষণ (ঘর-সন্ধানী বিভীষণ) ৪৩
ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট (ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট) ৪৫
লঙ্কাকাণ্ড (রাম-রাবণের যুদ্ধ) ৪৫
রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন ৪৬
নাগপাশে আবদ্ধ করা, নাগপাশে বাঁধা ৪৭
গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত ৪৮
কুম্ভকর্ণের ঘুম/নিদ্রা ৫০

www.pathagar.com

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙা/ নিদ্রা ভঙ্গ ৫১
রামের হনুমান ৫২
গন্ধমাদন বয়ে/তুলে আনা ৫৪
কালনেমির লঙ্কা ভাগ (মনে মনে লঙ্কা ভাগ, লঙ্কা ভাগ করা) ৫৫
রাবণের চিতা ৫৬
শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম ৫৭
সোনার লঙ্কা ছারখার (রাবণের পুরী ছারখার) ৫৯
লঙ্কায় সোনা সস্তা ৬০
লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা ৬১
লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা ৬১
সাত খণ্ড (সারা রাত) রামায়ণ পড়ে, বলে সীতা কার বাপ/ভাই? ৬২
অগ্নিপরীক্ষা ৬৩
ধরণী দ্বিধা হও ৬৩
সীতাদুঃখ ৬৪
যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ ৬৬
সীতা সতী ৬৬
রামরাজত্ব ৬৮
রামরাজ্য ৬৮
সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই ৬৯
রাম বলেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলেন এক্ষণ/রামের ভাই লক্ষ্মণ ৭০

মহাভারত ৭৩-১১৪

যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে/ভূ-ভারতে (ভারত ছাড়া কথা নাই) ৭৫
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ৭৭
পঞ্চপাণ্ডব ৮০
পাণ্ডববর্জিত দেশ ৮৩
শকুনি মামা ৮৩
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ৮৬
কীচক বধ ৮৯
বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার ৯২
বিদুরের খুদ ৯৩
দাতা কর্ণ ৯৫
কুরুক্ষেত্র ৯৭

www.pathagar.com

শিখণ্ডী খাড়া করা ৯৮
শরশয্যা (ভীষ্মের শরশয্যা) ১০১
অশ্বত্থামা হত ইতি গজ (অশ্বত্থামা হত) ১০২
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল, শল্য হলো রথী ১০৪
সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ? ১০৭
ভুশণ্ডির কাক (কাক ভূষণ্ডি, ভুষণ্ডি কাক, ভুশণ্ডি কাক) ১১০
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ১১২

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১১৫-১৩০
যদুবংশ ১১৭
যশোদা কী ভাগ্যবতী, পরের পুতে পুত্রবতী ১১৯
না বিয়ায়ে কানায়ের মা ১২০
কুঁতিয়ে ম'ল দেবকী, নাম পাড়ান যশোদারানী ১২১
গোকুলের ষাঁড় (ধর্মের ষাঁড়) ১২১
পুতনা রাক্ষসী ১২২
বৃন্দে দূতী ১২৩
কানায়ে ভাগিনা ১২৫
বিনা দানে মথুরা পার ১২৬
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ১২৬
কংস মামা ১২৭
কংস রাজার বদ ফরমাশ ১২৯

বিষ্ণু ও দশাবতার ১৩১-১৫৪
নগদ নারায়ণ ১৩৩
অতিথি নারায়ণ ১৩৪
ভগবানের আসন বটপত্র ১৩৪
অমৃতে অরুচি ১৩৫
ধন্বন্তরি বিদ্যা ১৩৭
রাহুর গ্রাস ১৩৮
রাহুর দশা ১৩৯
অতি মন্থনে বিষ (গরল) ওঠে ১৪০
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ১৪১
লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড় ১৪৩

www.pathagar.com

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ১৪৪
শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায় ১৪৪
ধ্রুব সত্য ১৪৬
ধুন্ধুমার কাণ্ড ১৪৮
দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ১৪৯
অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই (অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই) ১৫০
পরশুরামের কুঠার ১৫৩

শিব ১৫৫-১৭২
হরিহর আত্মা (অভেদাত্মা হরিহর) ১৫৭
সাপকে মারলে শিবেরও লাগে ১৫৮
রুদ্রমূর্তি ১৫৮
সদাশিব ১৫৯
তাণ্ডবলীলা ১৬০
সতী সাবিত্রী ১৬১
দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ১৬৪
শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে ১৬৫
কাশীতে ভূমিকম্প ১৬৬
ব্যাস-কাশী ১৬৭
গণেশ উল্টানো ১৬৮
অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে ১৬৯
ভূতের মুখে রামনাম ১৭০
অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ১৭১
শিবের কোনো খোঁজ নাই, গাজনের ঘটা ভারি ১৭২

আরো পৌরাণিক ১৭৩-২০৪
কলিকাল (ঘোর কলিকাল, ঘোর কলি) ১৭৫
সবে কলির সন্ধ্যা ১৭৯
একাদশে বৃহস্পতি ১৭৯
শনির দশা (শনির ফের, শনির আছর) ১৮০
যজ্ঞের ঘোড়া ১৮১
অগস্ত্য যাত্রা ১৮৩

www.pathagar.com

গজ-কচ্ছপ লড়াই (গজ-কচ্ছপী লড়াই) ১৮৫
বালখিল্য স্বভাব, বালখিল্যতা ১৮৬
চোরা গরুর সঙ্গে (বা গরু চুরির অপরাধে) কপিলার বন্ধন ১৮৮
রক্তবীজের ঝাড় ১৮৯
চণ্ডমূর্তি ১৯১
বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায় ১৯২
যক্ষের চোখে ঘুম নাই ১৯৩
যক্ষের ধন ১৯৪
যমের খাতায় তলব পড়া/নাম ওঠা (যমের ডাক আসা, যমলোকের ডাক আসা) ১৯৫
যমের দোসর ১৯৬
যমের অরুচি ১৯৭
চিত্রগুপ্তের খাতা ১৯৯
জড়ভরত ১৯৯
ঠুঁটো জগন্নাথ/ সাক্ষীগোপাল ২০০
সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে ২০২
রসাতলে যাওয়া ২০৩

ভিনদেশি পুরাণ ২০৫-২১৪
ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠা ২০৭
প্যান্ডোরার বাক্স খোলা ২০৮
অ্যাকিলিস হিল/ অ্যাকিলিসের গোড়ালি ২০৯
কিউপিডের তীর ২১১
কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি ২১২

নির্ঘণ্ট ২১৫-২২৮

বর্ণানুক্রমিক তালিকা ২২৯-২৩১

এগার
www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ব্যাকরণ বেশ খটোমটো একটি বিষয়। এর আবার অনেকগুলো ভাগ আছে, সেগুলোর নামগুলোও ভীষণ খটোমটো। মূল ভাগ চারটি—ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। নামগুলো শুনতে কঠিন মনে হলেও ভাগগুলো খুব সোজা। ব্যাকরণের যেসব অংশে ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো থাকে ধ্বনিতত্ত্বে। এমনি করে শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।

বাগধারা তো বাক্যের বিষয়। বাগধারা নিজেরাই অনেক সময় একেকটা বাক্যের আকার ধারণ করে। আর বাক্য ছাড়া বাগধারার তো প্রয়োগও হবে না। আর তাই বাগধারার আলোচনা করা হয় বাক্যতত্ত্বে। প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ব্যাকরণের যে কয়টি অংশ খটোমটো নয়, বরং বেশ মজার, সেগুলোরই একটি এই বাগধারা। বাগধারা বিষয়টাই এমন যে, বলা হয় এক রকম করে, কিন্তু বোঝায় আরেক রকম অর্থ। বাগধারার সংজ্ঞাও এটাই। একটি বা কয়েকটি শব্দ বাক্যে একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে শব্দগুলোর সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করলে শব্দটিকে বা শব্দগুলোকে বলা হয় বাগধারা। অর্থাৎ, বাগধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়—

- এক বা একাধিক 'নির্দিষ্ট' শব্দ; এই শব্দগুলোর পরিবর্তন করা যাবে না।
- শব্দগুলো প্রচলিত সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে পৃথক কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করবে।

ব্যাকরণের খটোমটো ভাষায় বললে—কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠে তখন সে সকল শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাগধারা বা বাক্যরীতি বলা হয়। কিংবা বলা যায়, আক্ষরিক অর্থ ছাপিয়ে যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দ বলে।

www.pathagar.com

বাগধারার জন্ম হয় মুখে মুখে। সাধারণত কোনো ঘটনা থেকেই জন্ম হয় বাগধারার। কোনো একটা ঘটনা মানুষের মনে দাগ কাটলে, মানুষ তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায়-ও সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আনে। আর তখনই জন্ম হয় বাগধারার। যেমন, এক অলস লোকের গল্প ছিল। সে ভীষণ অলস। এত অলস, নড়তেও যেন কষ্ট হয়। একদিন সে খেজুর গাছের নিচে শুয়ে ছিল। তখন একটা খেজুর টুপ করে ঠিক তার গোঁফের মাঝখানে এসে পড়ল। জিভ দিয়ে একটু কসরত করলেই খেজুরটা তার পেটে চালান করে দেওয়া যায়। কিন্তু লোকটি এতই অলস, এইটুকু পরিশ্রমেও তার ভীষণ আপত্তি। তাই সে হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়েই থাকল। কখন খেজুরটা এমনি এমনি গড়িয়ে তার মুখে এসে পড়বে, আর সে খেজুর খাবে। কিন্তু খেজুরটাও গড়িয়ে তার মুখে আসে না, তারও খেজুর খাওয়া হয় না। শেষে পাশ দিয়ে এক লোক যাচ্ছিল, তাকে দেখে সে বলে উঠল, "ভাই, খেজুরটা একটু মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে?" সেই গল্প থেকেই মানুষ অলস লোক দেখলেই তাকে বলতে শুরু করল—'গোঁফখেজুরে'।

প্রবাদ-প্রবচনও অনেকটা বাগধারার মতোই। তবে বাগধারার সংজ্ঞা দিয়ে প্রবাদ-প্রবচনকে চিহ্নিত করাটা বেশ মুশকিল। কারণ, প্রথমত, বাগধারা যেখানে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট শব্দ নিয়ে গঠিত হয়, সেখানে প্রবাদ-প্রবচন নিজেই একটা বাক্যাংশ বা বাক্য। দ্বিতীয়ত, বাগধারায় অবশ্যই শব্দগুলো প্রচলিত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে পৃথক কোনো অর্থ প্রকাশ করবেই। কিন্তু প্রবাদ-প্রবচনে এর ব্যত্যয়ও ঘটতে পারে। শব্দগুলো প্রচলিত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েই একটা বৃহৎ ভাবের দ্যোতনা আনতে পারে। তাই বাগধারার নিকটবর্তী হয়েও প্রবাদ-প্রবচনকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রবাদ-প্রবচনকে বরং ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়—

- জনশ্রুতি বা গণমানুষের ব্যবহার থেকে উৎপত্তি, তথা বহুপ্রচলিত।
- উপদেশমূলক বা জ্ঞানগর্ভ উক্তি বা বাক্য।
- কোনো চিরন্তন সত্য, অথবা বহু অভিজ্ঞতাজাত সত্যের প্রকাশ।
- বহুকাল ধরে প্রচলিত থাকা।
- ভাষিক সৌন্দর্য থাকা।

আভিধানিক ভাষায় বললে—গণমানুষের ভাষায় বহুকাল ধরে প্রচলিত যেসব উপদেশমূলক জ্ঞানগর্ভ উক্তি বা জনশ্রুতিতে চিরন্তন সত্য বা বহু অভিজ্ঞতাজাত সত্য ভাষিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায় সেগুলোকে প্রবাদ-প্রবচন বলে।

অর্থাৎ, প্রবাদ-প্রবচন বিষয়টাই এমন যে, এদের পেছনে একটা করে গল্প থাকাটাই স্বাভাবিক। কোনো না কোনো গল্প, ঘটনা বা অমন কোনো কিছু

www.pathagar.com

থেকে উৎপত্তি বলেই মানুষ সেগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে মনে রাখে, তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় সেগুলোকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনে। যেমন, একবার তের ব্রাহ্মণ কোনো তীর্থে যাচ্ছিল। পথে তারা বারোটি নারিকেল পেল। চাইলে তারা ভাগাভাগি করে বারো জন বারোটি নারিকেল ঘাড়ে নিয়ে বহন করতে পারত। কিন্তু তারা করল ঠিক উল্টোটা। তাদের মধ্যে যে কমবয়সী ব্রাহ্মণ ছিল, বারোটা নারিকেলই তার কাঁধে তুলে দিল। বারোটা নারিকেল মিলিয়ে ওজন তো কম নয়। অতটা ওজন নিয়ে সেই তরুণ ব্রাহ্মণ বেশি দূর যেতে পারল না। খানিকটা পথ যেতেই তার ঘাড় ভেঙে গেল। তখন নারিকেলগুলো দেয়া হলো আরেক ব্রাহ্মণকে। খানিক পথ যেতে বারো নারিকেলের ওজনে তারও ঘাড় ভেঙে গেল। এভাবে এক-এক করে তের জন ব্রাহ্মণেরই ঘাড় ভেঙে গেল। এভাবে যে কাজ সবাই মিলে সহজেই করা যেত সে কাজ একজনকে দিয়ে করাতে গিয়ে উল্টো সবাইকেই হার মানতে হলো। সেই গল্প থেকে, সবাই মিলে কাজ না করে, পুরোটা কাজের ভার একজনের ঘাড়ে তুলে দিলে, তখন বলা হয়, 'বারো নারিকেলে তের বামুনের ঘাড় ভাঙে'।

অবশ্য সব বাগধারা আর প্রবাদ-প্রবচন এমন লোকগল্প থেকে এসেছে তা নয়। অনেক বাগধারা এসেছে পুরাণ থেকেও। পুরাণ বলতে মূলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানমূলক ধর্মগ্রন্থগুলোকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেসব ধর্মীয় কাহিনি আছে, সেগুলোই পুরাণের কাহিনি। আর সেসব কাহিনি থেকে যেসব বাগধারা তৈরি হয়েছে, সেগুলোকেই বলা যেতে পারে 'পৌরাণিক বাগধারা'।

আমাদের এই ভূখণ্ডের প্রাচীন ধর্মমত হল সনাতন বা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন। মুসলমানদের আগমন অপেক্ষাকৃত পরের ঘটনা। ইসলাম এই উপমহাদেশের অন্যতম আচরিত ধর্ম। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের প্রধান ধর্মই ইসলাম। তবে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ মূলত মধ্যপ্রাচ্যে। আর তাই ইসলাম-প্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিকভাবে ভারতীয় পুরাণের উত্তরসূরি। সেই অর্থে আমাদের দেশের প্রধান ধর্ম ইসলাম হলেও সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের পুরাণ বলতে বোঝায় সনাতন (হিন্দু) ও বৌদ্ধ ধর্মের পৌরাণিক গ্রন্থগুলোকেই। বিশেষ করে বাংলা ও এর আশপাশের অঞ্চলে বহুল জনপ্রিয় পৌরাণিক গ্রন্থগুলো হলো—রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এগুলোর পৌরাণিক আখ্যান থেকে আমাদের ভাষাতে প্রচুর বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন হয়েছে।

তাই পৌরাণিক বাগধারা বলতে মূলত এই সব পৌরাণিক গ্রন্থের কাহিনি থেকে যেসব বাগধারা এসেছে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এসব গ্রন্থের

www.pathagar.com

আখ্যান থেকে বেশ কিছু প্রবাদ-বাক্য ও প্রবচনও বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোকেও এখানে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

পাঠকদের পড়ার সুবিধার্থে এই পৌরাণিক বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলোকে পৌরাণিক আখ্যানগুলোর কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যাতে সমস্তটা মিলে একটা কাহিনির আকার দেয়া যায়। বাগধারাগুলোকে সাতটি ভাগে ভাগ করে সাজানো হয়েছে—

- রামায়ণ
- মহাভারত
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- বিষ্ণু ও দশাবতার
- শিব
- আরো পৌরাণিক
- ভিনদেশি পুরাণ

এর প্রথম তিনটি ভাগ সরাসরি নির্দিষ্ট একটি করে পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে সংকলিত বাগধারা নিয়ে সাজানো হয়েছে—রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই তিনটি পৌরাণিক গ্রন্থই এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। একসময় এখানকার সব ধর্মের মানুষই এগুলো অন্তত গল্পের মতো করে হলেও পড়ত। এই তিনটি ভাগেই বাগধারাগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে সবগুলোকে একত্রে একটি গল্পের মতো করে পড়া যায়। সেই গল্পের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে, প্রয়োজনে বাগধারার সঙ্গে সঙ্গতি নেই এমন তথ্যও জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সবগুলো মিলে এমন একটি গল্পের মতো দাঁড়িয়েছে, যেসব পাঠক আগে ওগুলো পড়েননি তারাও মূল কাহিনির খানিকটা আস্বাদন পাবেন। আর ধারাবাহিকতা থাকায় বুঝতেও খানিকটা হলেও সুবিধা হবে। তবে যারা কাহিনিগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচিত তারা পড়তে গিয়ে বাড়তি সুবিধা তো পাবেনই।

পরের দুটি ভাগে স্থান পেয়েছে যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বাগধারাগুলো। অবশ্য পৌরাণিক কাহিনির মজাই হলো, সব কাহিনিতেই সবার কোনো না কোনো ভূমিকা বা অংশগ্রহণ থাকেই। কাজেই বিষ্ণু-শিবের ভূমিকা আছে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক বাগধারার কাহিনিতেও। আর কৃষ্ণ নিজেই তো বিষ্ণুর অবতার। তাই এই দুই ভাগে সেসব বাগধারাগুলোকেই রাখা হয়েছে, যেগুলো সরাসরি বিষ্ণু বা শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সঙ্গে বিষ্ণুর স্ত্রী এবং শিবের স্ত্রীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাগধারাগুলোকেও রাখা হয়েছে। এই বাগধারাগুলোও এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পড়তে গেলে খানিকটা হলেও ধারাবাহিকতার স্বাদ পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ ভাগে স্থান পেয়েছে ভারতীয় পুরাণ থেকে আসা বাকি সব বাগধারাগুলো, যেগুলো উপরের কোনো ভাগেই পড়েনি। অবশ্য সেগুলোকেও খানিকটা ধারাবাহিকতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আবার এমন অনেক বাগধারাও আছে, যেগুলোকে চাইলে একাধিক ভাগেও স্থান দেয়া সম্ভব। সেগুলোকে সম্ভাব্য সবচেয়ে সংশ্লিষ্ট ভাগে, কিংবা যে ভাগে ফেললে ধারাবাহিক পঠনে সুবিধা হয়, এই দুই বিবেচনা মিলিয়ে যে কোনো একটি ভাগে রাখা হয়েছে।

তবে বাগধারাগুলোর এই ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনি বা চরিত্রের সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতাকে প্রথম বিবেচ্য করা হয়নি। প্রথম বিবেচ্য হিসেবে নেয়া হয়েছে ধারাবাহিক পঠনের সুবিধাকে। পাঠক যাতে পুরোটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা একটা ধারাবাহিক গল্পের মতো করে পড়তে পারেন, সেটাকেই বিবেচনায় নিয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর তাই এখানে পৌরাণিক আখ্যান বা চরিত্রের সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতা খুঁজতে যাওয়াটা ভুল হবে। তা নইলে বিষ্ণু-শিব যেমন রামায়ণ-মহাভারত-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরে আসতে পারেন না, তেমনি গ্রন্থগুলোর নামও তালিকায় এই অনুক্রমে আসার কথা না।

আর শেষ ভাগে আছে মূলত কতগুলো ইংরেজি বাগধারা, যেগুলোর উৎস পৌরাণিক আখ্যান, এবং বাংলায় লেখকরা মাঝে মধ্যে ব্যবহারও করেন। কতগুলো আবার আমরা কথা বলার সময়ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করি।

আশা করি, পৌরাণিক বাগধারার এই সংকলন উৎসাহী পাঠকদের ভালো লাগার খোরাক হবে।

নাবীল অনুসূর্য
(নাবীল আল জাহান)
মিরপুর, ঢাকা
জানুয়ারি ২০১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পৌরাণিক বাগধারা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রামায়ণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাম না হতেই রামায়ণ

অর্থ : কারণের পূর্বেই কার্য সম্পাদন, হেতুর পূর্বেই যথাপ্রাপ্তি

'রামায়ণ' গ্রন্থটি মূলত অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র বা রামের জীবনী। গ্রন্থটির রচয়িতা বাল্মীকি। তাকে ভারতের আদিকবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাল্মীকি প্রথম জীবনে ডাকাত ছিলেন। তার নাম ছিল রত্নাকর। একদিন তিনি নারদ মুনির পথ আটকে দাঁড়ালেন, ডাকাতি করতে। তখন নারদ মুনি তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে খুন-ডাকাতি তথা দস্যুবৃত্তির মহাপাপের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। রত্নাকর তখন তার এই মহাপাপের প্রতিকার জানতে চাইলে, নারদ মুনি তাকে রামমন্ত্র জপার উপদেশ দেন।

রত্নাকর টানা ষাট হাজার বছর তপস্যা করে, তবেই সিদ্ধিলাভ করেন। ষাট হাজার বছর এক জায়গায় ধ্যান করায়, রত্নাকরের শরীরে উইপোকা বাসা বাঁধে। তার শরীর উইঢিবিতে ঢেকে যায়। এই উইপোকা বা বল্মীকে শরীর ঢেকে গিয়েছিল বলে, তার নাম হয় বাল্মীকি। পরে নারদ তার কাছে ফিরে এসে, তাকে রামচন্দ্রের কাহিনি শুনিয়ে, তারপর দেবলোকে ফিরে যান।

পরে একদিন বাল্মীকি তমসা নদীর তীরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তার শিষ্য ভরদ্বাজ। দেখলেন, এক জোড়া বক পরম প্রেমে মিলিত হচ্ছে। এমন সময় এক শিকারি তীর মেরে পুরুষ বকটিকে মেরে ফেলল। তখন নারী বকটি বুকফাটা বিলাপ জুড়ে দিল। তা দেখে উত্তেজিত বাল্মীকি শিকারিটিকে অভিশাপ দিলেন। আর সেই অভিশাপটিই একটি শ্লোক বা ছন্দে-বাঁধা পয়ারের আকারে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥"

বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় এ রকম—"হে ব্যাধ, তুমি যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনকে বধ করলে, তার ফলস্বরূপ জীবনে কখনো শান্তি পাবে না।"

www.pathagar.com

ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, এটাই সৃষ্টির আদিশ্লোক বা আদিকবিতা, মানে প্রথম কবিতা। এই শ্লোক উচ্চারণের পর, ব্রহ্মা বাল্মীকির আশ্রমে আসেন। তাকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। তার আদেশে বাল্মীকিও রামায়ণ রচনা করতে শুরু করেন।

এর মধ্যে সীতা গর্ভবতী হলে, রাম লোক-অপবাদের ভয়ে, প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে সীতাকে ত্যাগ করেন। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে যান। রামায়ণ রচনা শেষ হলে, বাল্মীকি রামেরই দুই যমজ সন্তান লব আর কুশকে প্রথম রামায়ণ শেখান। রাম অশ্বমেধযজ্ঞতে বাল্মীকিকে দাওয়াত করলে, বাল্মীকি লব-কুশকে নিয়ে যান। তারাই প্রথম সবাইকে রামায়ণ গান গেয়ে শোনান।

রামায়ণ ৭ খণ্ডে বিভক্ত—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। মোট শ্লোকের সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। অনেকে অবশ্য দাবি করে, আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচিত নয়, পরে রচিত। আবার, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের কাহিনিতেও পার্থক্য দেখা যায়।

সে যাই হোক, সব জায়গাতেই রামায়ণের মূল কাহিনি একই। আর তা হলো, রামের জীবনী। রামায়ণ রামের জীবদ্দশাতে রচিত হতে শুরু করলেও, সেটা রামের শেষ জীবনের কথা, যখন সে অযোধ্যার রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যাকে নিয়ে এই রামায়ণ, সেই রামের জন্ম বা আবির্ভাবের আগে রামায়ণের কথা ভাবাই যায় না। তেমনি কোনো কাজ করার আগেই তার ফল পাওয়ার কথাও ভাবা যায় না। প্রয়োজন না হতেই কাজ করার ব্যাপারটাও একই। কিন্তু যদি সে রকমই পরিস্থিতি হয়, প্রয়োজন না হতেই কোনো কাজ করা হয়, কিংবা কাজ করার আগেই তার ফল পাওয়া যায়, কিংবা তেমনটা আশা করা হয়, তখন বলা হয় 'রাম না হতেই রামায়ণ'।

শাপে বর
অর্থ : অনিষ্টে ইষ্ট লাভ

দিলীপ ছিলেন সূর্যবংশের রাজা। তার ছেলের নাম রঘু। এই রঘু প্রায় সমস্ত পৃথিবী জয় করেছিলেন। পরে তার নাম থেকেই এ বংশের আরেক নাম হয় রঘুবংশ। এই রঘুর ছেলে অজ, অজের ছেলে দশরথ। শাপে বর বাগধারাটি এসেছে এই দশরথের কাহিনি থেকেই।

দশরথের তিন স্ত্রী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে তার শান্তা নামে এক মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু তার কোনো ছেলে ছিল না। তাই

www.pathagar.com

নিয়ে তার দুঃখও কম ছিল না। তিনি সূর্যবংশের রাজা, তার বিশাল রাজ্য। অথচ তার কোনো ছেলে নেই। তার পরে সূর্যবংশ রক্ষা করবারও কেউ নেই।

একবার এই রাজা দশরথ গিয়েছিলেন মৃগয়ায়, মানে শিকারে। রাতের বেলায়, আলো-আঁধারিতে দেখলেন, একটা হাতি যেন। দেরি না করে তক্ষুনি বাণ মেরে হাতিটা শিকার করলেন।

কিন্তু ওটা আসলে হাতি ছিল না। এক মুনির ছেলে কলসি থেকে পানি খাচ্ছিল। কলসিটাতে পানি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। তাই মুনির সেই ছেলে কলসি থেকেই পানি খাচ্ছিল। আর আলো-আঁধারিতে সেই ছেলেটিকেই রাজা দশরথের মনে হয়েছিল, একটা হাতি যেন।

সেই ছেলের বাবা যে মুনি, তিনি ছিলেন অন্ধ। সেই অন্ধ মুনি পরে ছেলে হারানোর দুঃখেই মারা যান। মরার আগে রাজা দশরথকে অভিশাপ দিয়ে যান, রাজা দশরথও তার মতো ছেলে হারানোর দুঃখে মারা যাবেন।

সে অভিশাপ রাজা দশরথের জন্য উল্টো বর হয়ে গেল। কারণ, তার তো তখনো ছেলেই ছিল না। মুনির অভিশাপে উল্টো তার ছেলে না-হওয়ার দুঃখ ঘুচে গেল। ফিরে এসে দশরথ ছেলে কামনায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞ শুরু করলেন। তারপর সেই যজ্ঞের পায়েস কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে খেতে দিলেন। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাদের পায়েস থেকে আবার খানিকটা করে দিলেন ছোট বৌ সুমিত্রাকে।

ফলে তাদের তিনজনেরই ছেলে হলো। সুমিত্রা দুই ভাগ পায়েস খেলেন বলে, তার দুই ছেলে হলো। কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর একজন করে। এই কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, আর সুমিত্রার দুই ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

এ রকম যদি কেউ কাউকে এমন কোনো অভিশাপ দেয়, বা কারো এমন কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা করে, যেটা উল্টো তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়, মানে কারো মন্দ করতে গিয়ে যদি উল্টো তার ভালো হয়ে যায়, তখন বলা হয়, শাবে বর হয়েছে।

ধনুকভাঙা পণ
অর্থ : কঠিন প্রতিজ্ঞা

ধনুকভাঙা পণের এই ধনুকটির নাম হরধনু। দেবতাদের আদেশে ধনুকটি বানিয়েছিলেন বিশ্বকর্মা। তিনি ছিলেন দেবশিল্পী। তিনি আসলে দুটো ধনুক বানিয়েছিলেন। তার একটি দেয়া হয়েছিল বিষ্ণুকে, আরেকটি হর, মানে শিবকে। এই হরধনুটা ছিল শিবের ধনুক।

www.pathagar.com

একবার দেবতারা জানতে চাইলেন, বিষ্ণু আর শিবের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী। ব্রহ্মা সে উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে, উল্টো বিষ্ণু আর শিবের মধ্যে বিরোধ লাগিয়ে দিলেন। তাই নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিষ্ণু এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিলেন। সে হুঙ্কারে শিব একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখন দেবতারাও ঝটপট রায় দিয়ে দিলেন, বিষ্ণুই বেশি শক্তিশালী।

তাই শুনে শিব তো ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন। তার হরধনু নিয়ে দেবতাদের সবার মাথা কাটতে ছুটে এলেন। দেবতারা কোনো মতে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তারপর তার কাছ থেকে হরধনুটা নিয়ে তাদের কাছে রেখে দিলেন। আর বিষ্ণু তার ধনুকটা গচ্ছিত রাখলেন ভৃগু মুনির ছেলে ঋচীকের কাছে। পরে দেবতারা শিবের সেই হরধনুটা রাখতে দেন দেবরাতের কাছে। এই দেবরাত ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। এই দেবরাতেরই বংশধর জনক সীরধ্বজ। তিনি ছিলেন মিথিলার রাজা। হরধনুটা বংশানুক্রমে তার কাছেই ছিল।

একদিন জনক সীরধ্বজ যজ্ঞভূমিতে লাঙল দিচ্ছিলেন। এমন সময়, জমিতে লাঙলের যে দাগ পড়ে, সেই দাগ থেকে এক মেয়ে উঠে আসেন। জমিতে লাঙলের এই দাগকে বলে সীতা। তার থেকে উঠে এসেছিলেন বলে, জনক সীরধ্বজ এই মেয়ের নাম রাখলেন সীতা।

সীতা ছাড়াও সীরধ্বজের আরেক মেয়ে ছিল—ঊর্মিলা। এই সীরধ্বজের ভাইয়ের নাম কুশধ্বজ। কুশধ্বজেরও দুই মেয়ে ছিল—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। এই চার জনই একসাথে বড় হয়েছিল। একদিন চার বোন বাগানে খেলছিল। খেলতে খেলতে তারা এক ফুলের গাছ দেখতে পেল। তাতে ভীষণ সুন্দর ফুল ফুটে আছে। তারা ফুল ছিঁড়তে গেল। কিন্তু নাগাল তো আর পায় না। শেষে সীতা ঘর থেকে শিবের হরধনুটা নিয়ে এলেন। তারপর সেই ধনুক দিয়ে তীর মেরে ফুল পাড়তে লাগলেন।

ব্যাপারটা জনক সীরধ্বজের চোখে পড়ল। তিনি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। এই হরধনু তো আর সাধারণ কোনো ধনুক না। যে কেউ তো আর এই ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়তে পারবে না। সে জন্য রীতিমতো ভুবনজয়ী বীরের প্রয়োজন। সব দেখে, তিনি তখন সীতার নাম দিলেন বীর্যশুল্কা।

ধনুকের দুই মাথার সাথে যে তার বাঁধা থাকে, যেটা টেনে তীর ছোঁড়া হয়, সেটাকেই বলা হয় ধনুকের গুণ, জ্যা বা ছিলা। জনক সীরধ্বজ সীতাকে বীর্যশুল্কা নাম দেয়ার সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করেন, যে এই হরধনুতে গুণ বা জ্যা পরাতে পারবে, তার সাথেই সীতার বিয়ে দেবেন। সে প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা দিয়ে রাজ্যে-রাজ্যে জানিয়েও দেয়া হয়।

www.pathagar.com

এবার সীতার পাণিপ্রার্থীর ঢল নামল। বহু রাজা এলেন পরীক্ষা দিতে। ব্যর্থ হলেন সবাই। ব্যর্থ রাজাদের তালিকা দিন দিন লম্বা হতে লাগল। শেষে ব্যর্থ রাজারা সবাই মিলে ঠিক করলেন, এই অপমানের শোধ নিতে হবে। তারা মিথিলা আক্রমণ করবেন।

আশেপাশের সব রাজ্যের রাজারা মিলে মিথিলা আক্রমণ করলেন। তবু জনক সীরধ্বজ তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুল নড়লেন না। টানা এক বছর সব রাজাদের মিলিত আক্রমণ তিনি একাই ঠেকিয়ে গেলেন।

বছরখানেকের প্রতিরোধে তার বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু তিনি তার প্রতিজ্ঞা থেকে নড়লেন না। উল্টো দেবতাদের কাছে তপস্যা শুরু করলেন। দেবতারাও তাকে চতুরঙ্গ শক্তি দান করলেন। তাই দিয়ে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন।

তখন জনক এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞে যোগ দিতে এলেন রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণও। সঙ্গে এলেন বিশ্বামিত্র মুনি। গিরিব্রজ হয়ে, বিশালাপুরী হয়ে তারা মিথিলাতে আসলেন। আসার পথে, মিথিলার কাছেই, অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন রাম।

রামের আসার খবর শুনে জনক নিজেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এলেন। জানালেন, বার দিন পরে দেবতারা যজ্ঞভাগ নিতে আসবেন। আর বিশ্বামিত্রও তাকে জানালেন, রাম হরধনুটি দেখতে চান।

পরদিন জনক সীরধ্বজ রামকে সেই হরধনুটি দেখালেন। তিনি রামকে হরধনুর কাহিনিও বললেন। বললেন তার প্রতিজ্ঞার কথাও। তখন রাম হরধনুটি নিয়ে অবলীলায় তাতে জ্যা লাগালেন। তারপর তাতে একটা টঙ্কার দিলেন। মানে জ্যা টেনে ছেড়ে দিয়ে শব্দ করলেন। আর সেই টঙ্কারে হরধনুটা ভেঙেই গেল।

তখন জনক সীরধ্বজ খুশি মনে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। রাজা দশরথকে খবর দিয়ে অযোধ্যা থেকে মিথিলায় আনালেন। কুশধ্বজকেও মিথিলায় আনালেন সাংকাশ্যা থেকে। তারপর শুধু রামের সাথে সীতারই না, দশরথের চার ছেলের সাথে তার ও তার ভাই কুশধ্বজের চার মেয়েরই বিয়ে দিলেন সীরধ্বজ। বিজয় নামক ক্ষণে তাদের বিয়ে হলো।

এমনিভাবে জনক সীরধ্বজ ধনুক ভাঙার পণ রক্ষা করেছিলেন। সে প্রতিজ্ঞা রাখতে তিনি এমনকি প্রতিবেশী সব রাজ্যের রাজাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন, তবু তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুল নড়েননি। কেউ যখন এমনি কঠিন প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই সে প্রতিজ্ঞার অন্যথা করে না, তখন সে প্রতিজ্ঞাকে বলা হয় ধনুকভাঙা পণ।

www.pathagar.com

কাল রাম রাজা হবে, আজ রামের বনবাস

অর্থ : আশায় নৈরাশ্য

রাম ছিলেন সূর্যবংশের যুবরাজ। তাদের রাজ্য ছিল অযোধ্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথ তার বাবা। দশরথের তিন স্ত্রী ছিল—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে তার শান্তা নামে এক মেয়েও হয়েছিল, কিন্তু কোনো ছেলে ছিল না। পরে এক অন্ধ মুনি রাজা দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যুর অভিশাপ দিলে, সেই শাপই তার জন্য বর হয়ে যায়। তার তিন স্ত্রীর গর্ভে চার ছেলে হয়। কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, আর সুমিত্রার দুই ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

এই চার ভাইয়ের মধ্যে বেশ ভাবও ছিল। সবাই-ই বীর, রাজা দশরথের সুযোগ্য পুত্র একেকজন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর ছিলেন রাম। রাজা দশরথ তাকে যুবরাজ হিসেবেও ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন। মানে, তার পরে তার উত্তরসূরি হিসেবে রাজা হবেন রাম।

রামের রাজা হওয়াতে তার ভাইদেরও কারও আপত্তি ছিল না। তাই রাজা দশরথ যখন রামের রাজ্যাভিষেকের ঘোষণা দিলেন, তার ভাইরা বরং খুশিই হলেন। তার তিন মা-ও তাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। তারাও খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু এই মাদেরই একজন শেষে গোল পাকালেন।

পরদিন রামের অভিষেক। মানে, পরদিন রামকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হিসেবে বরণ করে নেয়া হবে। তাকে রাজমুকুট পরিয়ে রাজসিংহাসনে বসানো হবে। এমন সময়ে বাধল গোল। পাকালেন দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেয়ী। পরদিন রাম রাজা হবেন শুনে, প্রথমে তিনি অবশ্য খুশিই হলেন। তার আভরণের একটা অংশ খুলে দাসী মন্থরাকে দিলেন, রামকে উপহার হিসেবে দিয়ে আসতে। এই দাসী মন্থরাই আসলে গোল পাকাল। সে-ই তখন কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করল। বোঝাল, রাম রাজা হয়ে গেলে, ভরতের আর এই জীবনে রাজা হওয়া হবে না। তখন মন্থরার প্ররোচনাতে, কৈকেয়ী নিজের ছেলে ভরতকে রাজা বানানোর জন্য, রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

শম্বরের যুদ্ধে একবার রাজা দশরথ ভীষণ আহত হয়েছিলেন। তখন কৈকেয়ী তার সেবা করেছিলেন। তার সেবায় দ্রুতই সুস্থ হয়ে ওঠেন দশরথ। তখন খুশি হয়ে তিনি কৈকেয়ীকে দুটো বর দিয়েছিলেন। মানে দুটো ইচ্ছা পূরণ করে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু তখন কৈকেয়ীর চাইবার মতো কোনো অভাবই ছিল না। তাই তিনি কোনো বরও চাননি। বলেছিলেন, পরে প্রয়োজন

www.pathagar.com

হলে দুটো বর চেয়ে নেবেন। ভরতকে রাজা বানানোর জন্য, তিনি এবার সেই পাওনা 'বর' দুটি ব্যবহার করলেন। এক বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠালেন। অন্য বরে ভরতকে রাজা বানানোর ব্যবস্থা পোক্ত করলেন।

ঘটনা শুনে রামও পিতৃসত্য পালনের জন্য স্ত্রী সীতাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে বনবাসে চলে গেলেন। ছোট দুই ভাই লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের মধ্যে লক্ষ্মণ ছিলেন রামের অনুরক্ত, শত্রুঘ্ন ভরতের। লক্ষ্মণও বনবাসে রামের সঙ্গে গেলেন।

ওদিকে ভরতের মা ষড়যন্ত্র করলেও, ভরত তাতে সায় দিলেন না। তিনি উল্টো রামকেই রাজা করতে তোড়জোড় শুরু করলেন। রামকে শত অনুরোধ করলেন, বনবাসে না যেতে। কিন্তু রাম কিছুতেই তার কর্তব্য থেকে পিছপা হলেন না। তিনি ঠিকই সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে গেলেন। সঙ্গে গেলেন অনুগত ছোট ভাই লক্ষ্মণ। তখন রামের এক জোড়া পাদুকা বা জুতা সিংহাসনে রেখে, রামের প্রতিনিধি হয়ে, ভরত অযোধ্যা শাসন করতে শুরু করলেন।

এভাবেই, রাম যখন অযোধ্যার সিংহাসনে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তার আগের দিন তাকে বনবাসে যেতে হয়। অযোধ্যার রাজা হওয়ার বদলে তাকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তাই আনন্দের মধ্যে যদি অকস্মাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদ আসে, আকস্মিক কোনো ঝামেলা এসে উপস্থিত হয়, যাকে বলে আশার বদলে নৈরাশ্য ভর করে, তখন বলা হয়—কাল রাম রাজা হবে, আজ রামের বনবাস।

লক্ষ্মণের ফল ধরা (ধর লক্ষ্মণ)

অর্থ : কোনো চিন্তা না করেই আদেশ পালন করা

রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ। রাম রাজা দশরথের বড় বৌ কৌশল্যার ছেলে। দশরথের ছোট বৌ সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে—লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন। এদের মধ্যে ছোট শত্রুঘ্ন ছিলেন ভরতের অনুরক্ত, আর লক্ষ্মণ রামের। এই লক্ষ্মণ রামের এতটাই অনুরক্ত ছিলেন, তিনি সকল কাজেই রামের সাথে সাথে থাকতেন। রামের সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

রাম যখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়ে তাড়কা রাক্ষসকে বধ করেন, তখনো তার সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ। সেখান থেকে মিথিলায় যান রাম। সেখানকার রাজা জনক সীরধ্বজের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে শিবের একটা বিশাল ধনুক ছিল। শিবের আরেক নাম হর। সে নামেই ধনুকটির নাম—হরধনু। জনক সীরধ্বজ ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে সেই ধনুকে জ্যা পরাতে পারবে, তার সঙ্গে

www.pathagar.com

তার পালক কন্যা সীতার বিয়ে দেবেন। রাম যখন সেই ধনুকে জ্যা পরান, পরে এক টঙ্কারে সেই ধনুক ভেঙে ফেলেন, তখনো তার সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ। পরে রাম জনক সীরধ্বজের বড় মেয়ে সীতাকে বিয়ে করেন, আর ছোট মেয়ে ঊর্মিলাকে বিয়ে করেন লক্ষ্মণ। সীরধ্বজের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়েকে বিয়ে করেন তাদের অন্য দুই ভাই—ভরত ও শত্রুঘ্ন।

ভাইদের মধ্যে রামই বড়। স্বাভাবিকভাবেই রাজা দশরথ তার উত্তরাধিকারী হিসেবে রামকেই যুবরাজ বানিয়েছিলেন। পরে তাকে সিংহাসনে বসানোরও ঘোষণা দেন। কিন্তু তার অভিষেকের আগের দিন, ভরতের মা কৈকেয়ী রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নামেন। সে ষড়যন্ত্রের ফলে, রাজা হওয়ার বদলে রামকে উল্টো চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। আর রামের হয়ে রাজ্য চালনার ভার নেন ভরত।

ঘটনা শুনে রামও পিতৃসত্য পালনের জন্য স্ত্রী সীতাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে বনবাসে যাওয়াই স্থির করেন। ছোট দুই ভাই লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নের মধ্যে লক্ষ্মণ ছিলেন রামের অনুরক্ত, শত্রুঘ্ন ভরতের। শত্রুঘ্ন ভরতের সঙ্গে থেকে যান। আর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনবাসে যান।

সেখানে শূর্পণখা এসে গোল বাধালে, সীতাকে খেতে উদ্যত হলে, রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দেন। পরে তিনি রামের সাথে মিলে শূর্পণখার দুই ভাই খর-দূষণ ও তাদের বাহিনীকে মেরেকেটে পঞ্চবটী বন রাক্ষসমুক্ত করেন।

এই বনবাসের সময় রাম-লক্ষ্মণ বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনতেন, পশুপাখি শিকার করতেন। সে সবেই তাদের পেটপুজোর কাজ চলত। তো প্রতিদিনই রাম লক্ষ্মণকে ফল দিতেন খেতে। দেয়ার সময় বলতেন, "ফল ধর"। লক্ষ্মণও ভাইয়ের কথামতো সে সব ধরে রাখতেন। মানে রেখে দিতেন। যাকে বলে ফল সংরক্ষণ করে রাখতেন। কিন্তু খেতেন না।

তাদের বনবাস শেষ হলে, লক্ষ্মণ সেই ফলগুলোর সব কয়টা রামের সামনে এনে হাজির করলেন। রাম তো দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এগুলো খাওনি কেন? লক্ষ্মণও উত্তরে জানালেন, আপনি তো আমাকে ফলগুলো ধরতে বলেছিলেন, খেতে তো বলেননি। তাই আমিও ফলগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছি, খাইনি।

কেউ যখন লক্ষ্মণের মতো এভাবে অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করে, তাকে যা বলা হয়, তাই করে, কিন্তু তার বেশি একটুও করে না, কেন কাজটা করতে বলা হয়েছে তাও চিন্তা করে না, তখন তার এই কোনো চিন্তা না করে আদেশ পালন করাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—লক্ষ্মণের ফল ধরা। আর এ ধরনের

www.pathagar.com

লোকদের, যারা কোনো চিন্তা না করে কেবল যা আদেশ করা হয়েছে, তাই পালন করে, তাদের ব্যঙ্গ করে বলা হয়—ধর লক্ষ্মণ।

দেবর লক্ষ্মণ (লক্ষ্মণের মতো দেবর হোক)
অর্থ : যে দেবর ভাবীর একান্ত অনুগত

অযোধ্যার রাজা দশরথের স্ত্রী ছিলেন তিনজন—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। এই তিন স্ত্রীর চার ছেলে—কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, আর সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মন্থরা দাসীর প্ররোচনায় কৈকেয়ী রামের সাথে শত্রুতা করলেও, চার ছেলের মধ্যে তেমন কোনো শত্রুতা ছিল না। তবে ছোট দুই ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মধ্যে, লক্ষ্মণ ছিলেন রামের অনুগত, আর শত্রুঘ্ন ভরতের।

এই চার ভাইয়ের বিয়েও একসাথেই হয়। সীতার পালক বাবা ছিলেন মিথিলার রাজা জনক সীরধ্বজ। সীতা ছাড়াও রাজা জনকের আরেক মেয়ে ছিল—ঊর্মিলা। তার ভাই কুশধ্বজেরও ছিল দুই মেয়ে—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। জনক সীরধ্বজ তার দুই মেয়ে ও তার ভাইয়ের দুই মেয়ে, এই চার মেয়ের বিয়ে দেন দশরথের চার ছেলের সঙ্গে। রামের বিয়ে হলো সীতার সাথে। লক্ষ্মণের বিয়ে হলো রাজা জনকেরই আরেক মেয়ে ঊর্মিলার সাথে। আর ভরত-শত্রুঘ্নের বিয়ে হলো কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সাথে।

আগে থেকেই লক্ষ্মণ রামের ভীষণ অনুগত ছিলেন। এর পর থেকে তিনি সীতারও ভীষণ অনুগত হয়ে পড়লেন। এমনকি রাম দণ্ডকারণ্যে বনবাসে গেলে, লক্ষ্মণও তাদের সঙ্গে যান। আর পুরোটা সময়েই তিনি রামের তো বটেই, সীতারও সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এমনকি তিনি যে বড় ভাই রামের কোনো কথা অমান্য করতেন না, যার সঙ্গে তিনি বনবাসে পর্যন্ত এলেন, ভাবী সীতার কথায় তিনি সেই ভাই রামের কথাও অমান্য করেছিলেন। আর অমান্য করেছিলেন বলেই, রাবণ সীতাকে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছিল।

শূর্পণখা সীতাকে খেতে উদ্যত হলে, রামের আদেশে লক্ষ্মণ তার নাক কেটে দিয়েছিল। এই শূর্পণখা ছিল রাবণের বোন। তখন শূর্পণখা রাবণের কাছে এসে তাকে এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করল। তখন রাবণও সীতাকে অপহরণের পরিকল্পনা আঁটল। পরিকল্পনা মোতাবেক সে মারীচকে সঙ্গে নিয়ে সেই বনে এল। তারপর মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ নিয়ে সীতার সামনে সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অমন একটা সোনার হরিণ দেখে সীতারও ভীষণ লোভ হলো। তিনি রামকে বললেন, হরিণটা ধরে দিতে।

www.pathagar.com

রাম তখন লক্ষ্মণকে সীতার পাহারায় রেখে, নিজে গেলেন সেই সোনার হরিণ ধরতে। যাওয়ার সময় বারবার করে লক্ষ্মণকে নিষেধ করে গেলেন, সীতাকে ছেড়ে যেন তিনি দূরে কোথাও না যান।

মারীচ প্রাণপণ পালানোর চেষ্টা করলেও, শেষতক আর রামের হাত থেকে বাঁচতে পারল না। রামের শরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করল সে। মরার আগে, রামের গলা নকল করে 'হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!' বলে চিৎকার করতে লাগল। তখন সীতাও মনে করলেন, রামের কোনো বিপদ হয়েছে। স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় তিনি লক্ষ্মণকে বারবার করে বলতে লাগলেন, গিয়ে রামকে সাহায্য করতে। লক্ষ্মণ অবশ্য প্রথমে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত ভাবীর অনুরোধ ফেলতেও পারলেন না তিনি। ভাইয়ের কথা অমান্য করে ভাইকে সাহায্য করতে চলে আসলেন। আর সেই সুযোগে রাবণও সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল লঙ্কাপুরীতে।

ঘটনার ফলাফল যাই হোক, এখানে একটা জিনিস স্পষ্ট, লক্ষ্মণ তার ভাইয়ের প্রতি যতটা অনুগত ছিলেন, তার ভাবীর প্রতি তারচেয়ে কোনো অংশেই কম অনুগত ছিলেন না। পরে অযোধ্যার রাজা হওয়ার পর, রাম যখন সীতাকে বনবাসে পাঠান, লক্ষ্মণ তারও প্রতিবাদ করেছিলেন। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। উল্টো লক্ষ্মণের ওপরই দায়িত্ব পড়ে সীতাকে বনবাসে রেখে আসার। সে ঘটনাটিও ভীষণ বেদনাবিধুর। সীতাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে লক্ষ্মণ ভীষণ কাঁদতে থাকেন। সীতার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেন না। পরে নৌকায় করে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে, তারপর সব কথা খুলে বলেন।

তাই কেউ যদি তার ভাবীর প্রতি ভীষণ অনুগত হয়, ভাবীকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে আর তার সব কথা মেনে চলে, তখন তাকে বলা হয় দেবর লক্ষ্মণ।

অমন দেবর পাওয়াটা সত্যিই বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। সব মেয়েরাই চায়, তাদের অমন দেবর থাকুক। তাই মেয়েদের আশীর্বাদ করতে প্রায়ই এমনটা বলা হয়, লক্ষ্মণের মতো দেবর হোক।

মান্ধাতার আমল

অর্থ : পুরনো দিনের, অনেক পুরনো

মান্ধাতা এক রাজার নাম। তিনি ছিলেন সূর্যবংশের রাজা যুবনাশ্বের ছেলে। রামও এই সূর্যবংশেরই রাজা ছিলেন। মান্ধাতার জন্মের ইতিহাসটা আবার খুব অবাক-করা। তার বাবা যুবনাশ্বের কোনো ছেলে হচ্ছিল না। তখন তিনি মুনিদের আশ্রমে গিয়ে যোগ সাধনা করতে শুরু করলেন; যাতে তার একটি

www.pathagar.com

ছেলে হয়। একসময় মুনিরা তার সাধনায় সন্তুষ্ট হলেন। তখন তার ছেলের জন্য তারা এক যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞ শেষ হলো মধ্যরাতে। তখন কলসি ভর্তি মন্ত্রপূত জল বেদিতে রেখে তারা ঘুমাতে গেলেন। এই কলসির জল যুবনাশ্বের স্ত্রী খেলে, তাদের ছেলে হবে।

সে কথা অবশ্য যুবনাশ্ব জানতেন না। রাতে তার খুব তৃষ্ণা পেল। তখন তিনি নিজেই সেই কলসির পানি পান করে ফেললেন। সকালে উঠে মুনিরা পুরো ঘটনা শুনে মুচকি হেসে বললেন, সন্তান তাহলে তোমার পেট থেকেই হবে। তবে তারা যুবনাশ্বকে গর্ভধারণের কষ্ট থেকে মুক্তি দিলেন। একশ বছর পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের শরীর থেকেই মান্ধাতার জন্ম হলো।

এবার দেখা দিল আরেক সমস্যা। মান্ধাতাকে তো মা গর্ভে ধারণ করেননি। ফলে তার মায়ের বুকে দুধ এল না। এখন বুকের দুধ ছাড়া মান্ধাতা বাঁচবেন কী করে? এই সমস্যার সমাধান করলেন স্বয়ং ইন্দ্র। তিনি নিজে মান্ধাতাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন। তার মুখে নিজের তর্জনী পুরে দিলেন। দিয়ে বললেন, "মাম ধাস্যতি", মানে আমাকে পান করো। সেখান থেকেই তার নাম হয় 'মাম-ধাতা' বা মান্ধাতা। ইন্দ্রের সেই আঙুল ছিল অমৃতক্ষরা। মানে সেই আঙুল দিয়ে অমৃত ঝরত। ইন্দ্রের সেই আঙুলের গুণে মান্ধাতা এক দিনেই বড় হয়ে গেলেন।

পরে বিন্দুমতীর সাথে মান্ধাতার বিয়ে হয়। এই বিন্দুমতী ছিলেন শশবিন্দুর মেয়ে। মান্ধাতা-বিন্দুমতীর তিন ছেলে—পুরুকুৎসু, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ। আর ছিল ৫০ মেয়ে। এই মেয়েদের তারা বিয়ে দিয়েছিলেন ঋষি সৌভরির সঙ্গে।

যুবনাশ্বের পরে রাজা হলেন মান্ধাতা। তিনি ছিলেন নিরামিশাষী। রাজা হিসেবেও ছিলেন খুব ভালো। প্রজাদের ভালো-মন্দের প্রতি তার ভীষণ খেয়াল ছিল। একবার তার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি মুনিদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। মুনিরা জানালেন, তার রাজ্যে একজন শূদ্র তপস্যা করছেন। এমনিতেই ব্রাহ্মণ ছাড়া কারো তপস্যা করার নিয়ম নেই। তায় আবার তখন সত্যযুগ চলছিল। সে যুগে পাপ-অনাচারের ফল হাতেনাতেই ফলত। তাই মান্ধাতার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হচ্ছিল। সেই শূদ্রকে হত্যা করলেই অনাবৃষ্টি দূর হবে। কিন্তু মান্ধাতা তাতে রাজি হলেন না। তখন মুনিরা তাকে জানালেন, তাহলে রাজা মান্ধাতাকেই ভাদ্র মাসে শুক্লা একাদশী পালন করতে হবে। মান্ধাতা তাই করলেন। তারপর তার রাজ্যে বৃষ্টি হলো।

পরে তিনি পৃথিবী-বিজয়ে বের হলেন। যুদ্ধ করতে করতে মান্ধাতা সারা পৃথিবী-ই জয় করে ফেললেন। কেবল যুদ্ধে জিততে পারলেন না রাবণের সঙ্গে। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে মান্ধাতার যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে কেউ-ই জিততে

www.pathagar.com

পারছিলেন না। যাকে বলে, সমানে সমানে লড়াই চলছিল। শেষে তারা যুদ্ধ বাদ দিয়ে সন্ধি করলেন। আর সেই সন্ধির মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো।

এরপর মান্ধাতা স্বর্গরাজ্য জয়ের অভিযানে বের হলেন। তখন ইন্দ্র তাকে থামালেন। বললেন, তুমি তো এখনও পুরো পৃথিবী-ই জয় করতে পারনি। লবণাসুর এখনও তোমার অধীনতা স্বীকার করেননি। আগে তা করে এস, তারপর না হয় স্বর্গ জয়ের কথা ভেবে দেখ।

এই লবণ ছিলেন রাজা মধুর ছেলে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণভক্ত। তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে নিজের ত্রিশূলের একটি শূল দিয়েছিলেন। এই শূল শত্রুদের ভস্ম করে আবার মধুর হাতেই ফিরে আসত। সাথে অবশ্য শিব এটাও বলে দিয়েছিলেন, দেবতা বা ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা করলে এই শূলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। মধু আবার সাথে চেয়ে নিয়েছিলেন, এই শূল যেন উত্তরাধিকারসূত্রে তার বংশের সবাই ব্যবহার করতে পারে। সেটা অবশ্য শিব দেননি। কেবল তার ছেলে লবণকে এই শূলের অধিকার দেন।

এই বাবা-ছেলের মধ্যে বাবা মধুর সঙ্গে লড়াই হয় রাবণের। আর ছেলে লবণের সাথে মান্ধাতার। মধু-রাবণের যুদ্ধে জেতেন রাবণ। তার হাতে মারা পড়েন মধু। কিন্তু মান্ধাতা লবণকে হারাতে পারেননি। তিনি উল্টো লবণের হাতে মারা পড়েন।

এই রাজা মান্ধাতা ছিলেন সত্যযুগের রাজা। একেকটা দৈবযুগকে যে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়, তার প্রথমটা এই সত্যযুগ। তারপর ত্রেতাযুগ-দ্বাপরযুগ হয়ে, এখন চলছে কলিযুগ। মানুষের বছরের হিসেবে একেকটা দৈবযুগের মেয়াদকাল ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর। এর মধ্যে প্রথম ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বছর হলো সত্যযুগ। তার পরের ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বছর জুড়ে ত্রেতাযুগ, পরের ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর দ্বাপরযুগ, আর শেষ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর কলিযুগ। মানে, এই মান্ধাতা কম করে হলেও ২৫ লক্ষ বছরেরও বেশি সময় আগের রাজা। মানে, রাজা মান্ধাতার আমল মানেই যে বহু পুরনো দিনের কথা, সে বলাই বাহুল্য। তাই অনেক পুরনো দিনের বোঝাতে বলা হয়, মান্ধাতার আমলের।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ

অর্থ : ক্ষমতা পেলে ভালো মানুষও খারাপ/অত্যাচারী হয়ে যায়

রাবণ ছিল বিশ্রবা মুর্নি আর কৈকসী রাক্ষসীর বড় ছেলে। কৈকসী রাক্ষসীর বাবা সুমালী রাক্ষস ছিল রাক্ষসদের রাজা। এই সুমালীরা ছিল তিন ভাই—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। তারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে

www.pathagar.com

লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়েছিল। ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই লঙ্কাপুরী। সে পুরীর চারপাশে সাগর। সাগরের বুকে ত্রিকূট পর্বতের উপরে তার অবস্থান। দৈর্ঘ্যে বিশ যোজন*, প্রস্থে দশ। চারপাশে স্বর্গপ্রাচীর। তারপরে কুমিরে ভরা প্রশস্ত পরিখা। সে পরিখার উপরে যন্ত্রচালিত সেতু। সেতুর শেষ মাথায় সোনার দরজা।

আর সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর লঙ্কাপুরীর রাজা হয় সুমালী। রাজত্ব পেয়েই তারা আর সবাইকে উৎপীড়ন করতে শুরু করে। শেষমেশ সবাই অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বিচার দিল। তখন বিষ্ণু এলেন তাদের দমন করতে। তার সাথে রাক্ষসদের ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে রাক্ষসরা হেরে গেল। বিষ্ণুর হাতে মালী মারা পরল। সুমালী ও মাল্যবান বাকি রাক্ষসদের নিয়ে পাতালে গিয়ে আশ্রয় নিল। লঙ্কার সিংহাসনে বসলেন কুবের।

সে পরাজয়ের শোধ নেয়ার জন্যই সুমালী রাক্ষস তার মেয়েকে এমন কারো সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছিল, যাতে তার নাতি বিষ্ণুকে হারাতে পারে। আর সে ভাবনা থেকেই সুমালী তার মেয়ে কৈকসীকে বিশ্রবা মুনির সাথে বিয়ে দেয়।

বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসীর ছেলে হয় ঠিকই। কিন্তু একে কৈকসীর উদ্দেশ্য ছিল মন্দ। তায় আবার সে বিশ্রবা মুনির কাছে গিয়ে সন্তান কামনা করেছিল একদম সকালবেলাতেই। তাই বিশ্রবা মুনি সোজা বলে দিলেন, তার সন্তানরা বীর হবে ঠিকই, কিন্তু রাক্ষস হবে। খুবই খারাপ স্বভাবের রাক্ষস। পরে অবশ্য কৈকসী অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল বলে, শেষ সন্তান, মানে বিভীষণ এই শাপের হাত থেকে বেঁচে যান। কৈকসীর এই অভিশপ্ত পুত্রদের মধ্যে সবার বড় রাবণ।

রাবণ দেখতে ছিল বীভৎস আর কুৎসিত। তার দশটা মাথা, বিশটা হাত আর বিশটা চোখ। গায়ের রং কুচকুচে কালো, জ্বলজ্বলে চুল, ঠোঁটের রং লাল। আর স্বভাব-চরিত্রে ছোট থেকেই ভীষণ অহঙ্কারী, দাম্ভিক।

ছোটবেলাতেই রাবণরা তিন ভাই একবার ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করেছিল। তখন ব্রহ্মা তাদের বর চাইতে বললে, রাবণ অমরত্বের বর চায়। কিন্তু সে তো আর দেয়া সম্ভব নয়। তাই রাবণ বর চায়, তাকে যেন কোনো দেব-দানব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ মারতে না পারে। আর সেই বর পাওয়ার পরই রাবণের অপকর্মের শুরু।

তখন লঙ্কায় রাজত্ব করছিলেন যক্ষদের রাজা কুবের। প্রথমেই রাবণ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কা দখল করল। সেখানে আবার রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন করল।

---

* *যোজন দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার একক। ৪ ক্রোশে ১ যোজন। আর ৮ হাজার হাতে ১ ক্রোশ। এখনকার হিসাবে (মানে মেট্রিক সিস্টেমে), ১ ক্রোশ মানে দুই মাইলের কিছু বেশি।*

www.pathagar.com

নিজে থাকার জন্য সেখানে বানাল সুরম্য অলকানগরী। তারপর একে-ওকে অত্যাচার-নিপীড়ন করতে শুরু করল। অবশ্য সব যুদ্ধেই যে সে জিতেছিল, তেমনটা নয়। নর্মদার তীরের হৈহয় রাজ্য আক্রমণ করলে, সেখানকার রাজা কার্তবীর্য তাকে পরাস্ত করে। আবার বানররাজ্য আক্রমণ করলে, বানররাজ বালীর হাতে পরাজিত হয় সে। পরে একবার যমের সাথেও যুদ্ধে নামে রাবণ। সে যাত্রায় অবশ্য কেউ-ই জিততে পারছিল না। শেষে ব্রহ্মার হস্তক্ষেপে তাদের যুদ্ধ থামে।

আরেকবার রাবণের সাথে দেখা হয় শিবের দুই অনুচরের একজন, নন্দীর সঙ্গে। এই নন্দীর মুখ আবার বানরদের মতো। তাই দেখে রাবণ তো হেসেই খুন। তাতে রেগে গিয়ে নন্দী রাবণকে অভিশাপ দেন, তার মতো বানরের হাতেই রাবণের বংশলোপ হবে। আর সে অভিশাপ শুনে, ক্ষেপে গিয়ে রাবণ কৈলাস পর্বত ধরে উপরে তুলতে থাকে। তখন ওই কৈলাস পর্বতেই শিব তার দুই অনুচর আর স্ত্রী গঙ্গাকে নিয়ে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাই শিবকেই এসে রাবণকে থামাতে হয়।

রাবণের এমনি অপকর্মের সংখ্যা কম নয়। দিন দিন সে আরো বেশি বেশি অত্যাচারী আর অহঙ্কারী হতে থাকে। আর দেব-দানবদের অতিষ্ঠ করে তুলতে থাকে। সে এমনকি ঋষিকন্যাদের অপহরণ করতেও শুরু করে। একবার মহর্ষি কুশধ্বজের মেয়ে বেদবতী তপস্যা করছিল। তাকে দেখে রাবণ আর লোভ সামলাতে পারলো না। তাকে অপহরণ করতে গেল। আর কোনো পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বেদবতী আগুনে আত্মাহুতি দিল। অবশ্য তার আগে সে অভিশাপ দিয়ে গেল, সে পরজন্মে কোনো ধার্মিকের ঘরে মেয়ে হয়েই জন্মাবে। তারপর রাবণের মৃত্যুর কারণ হবে।

নলকূবর ছিল কুবেরের ছেলে। তার সাথে সখ্য ছিল স্বর্গের অপ্সরী রম্ভার। একদিন রম্ভা যাচ্ছিল নলকূবরের সাথে দেখা করতে। পথে পড়ে গেল রাবণের সামনে। রাবণ তাকে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ধর্ষণ করল। পরে নলকূবর ঘটনা জানতে পেরে তাকে অভিশাপ দিল, এরপর যদি আর কোনো মেয়ের উপর সে বলপ্রয়োগ করে, সেই ঘটনাই তার মৃত্যুর কারণ হবে।

আরেকবার রাজা মরুত্ত যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে গিয়ে হাজির হলো রাবণ। তারপর সে যজ্ঞে যত ঋষিরা এসেছিলেন, সবাইকে গপাগপ খেয়ে ফেলল। এ ছাড়াও সে যুদ্ধ বাধিয়েছিল সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবার সাথে। তাদের সবাইকেই সে পরাজিত করেছিল। তার সাথে যুদ্ধ করে হেরে যান অযোধ্যার রাজা অনরণ্যও। রাবণের হাতে প্রাণ দেয়ার আগে তিনি অভিশাপ দেন, তার বংশজাত রাজা রামের হাতে রাবণের পরাজয় ঘটবে।

www.pathagar.com

আরেকবার রাবণ সাগরে গিয়ে সাপদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। যুদ্ধে সব নাগদের হারিয়ে দেয় সে। বরুণের ছেলেদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরও হারায়। অশ্মনগরে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণে মারে ৪০০ কালকেয় দানব। তাদের মধ্যে তার আপন বোন শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্ব-ও ছিল। সে ঘটনার পরেই রাবণ শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে থাকতে দেয়।

আর ওখানে থাকতে গিয়ে শূর্পণখাই রাবণের পতন ডেকে আনে। রামের সঙ্গে প্রেম করতে গেলে রাম-লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দেয়। সে ঘটনার প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে। তাই নিয়ে লেগে যায় রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ। সে যুদ্ধেই পতন ঘটে রাবণের।

সব মিলিয়ে, রাবণ সাহসী ও বীর ছিল, তার চরিত্রে রাজস্বভাব ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ছিল ভীষণ অহঙ্কারী, দাম্ভিক আর অত্যাচারী। সে সবাইকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করে বেড়াত। তাই, কেউ যখন ক্ষমতায় বসে রাবণের মতো দাম্ভিক, অত্যাচারী আর উৎপীড়ক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যখন কোনো আপাত নিরীহ মানুষ ক্ষমতা পেয়ে অমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন তার এই পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে বলা হয়—'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ'।

রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব
(রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ, মারীচের দশা)
অর্থ : দুই দিকেই বিপদ
সমার্থক বাগধারা : শাঁখের করাত, উভয়সংকট

সুন্দ ছিল হিরণ্যকশিপু বংশের এক অসুর। তার সাথে বিয়ে হয় তাড়কার। এই তাড়কার বাবা সুকেতু নামের এক যক্ষ। সুকেতু তপস্যা করে ব্রহ্মাকে খুশি করেছিল। তখন ব্রহ্মার বরে, হাজার হাতির শক্তিতে বলীয়ান এক মেয়ে হয় সুকেতুর। সেই মেয়েই এই তাড়কা। পরে তাড়কার সাথে সুন্দের বিয়ে হয়। তাদের এক শক্তিশালী ছেলেও হয়—মারীচ।

একবার মারীচের বাবা সুন্দের সঙ্গে অগস্ত্য মুনির ঠোকাঠুকি লেগে যায়। তখন অগস্ত্য মুনি রেগে গিয়ে সুন্দকে হত্যা করেন। তাতে আবার ক্ষেপে যায় সুন্দের স্ত্রী তাড়কা ও তাদের ছেলে মারীচ। তারা দুজনেই অগস্ত্য মুনিকে খেতে উদ্যত হয়। তখন উল্টো অগস্ত্য মুনি ওদের দুজনকেই অভিশাপ দিয়ে দেন। তার শাপে দুজনেই রাক্ষস হয়ে যায়। তাড়কা হয় বিকৃত মুখের রাক্ষস, আর মারীচ ভীষণ দর্শন রাক্ষস।

www.pathagar.com

রাক্ষস বনে গিয়ে তারা দুজনে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উৎপাত শুরু করে। আশ্রমের সবাইকে বিরক্ত করে বেড়াতে শুরু করে। তাদের অত্যাচারে আশ্রমের ব্রাহ্মণ, অন্যান্য মানুষ, গরু—সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শেষে তাদের অত্যাচার এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, অগস্ত্য মুনির তপোবনটাই হয়ে গেল তাড়কা রাক্ষসীর বন।

তখন বিশ্বামিত্র এই রাক্ষস মা-ছেলেকে দমন করার জন্য রাজা দশরথকে অনুরোধ করলেন। তার অনুরোধে রাজা দশরথ তার দুই ছেলে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে হাজির হলেন সেই তপোবনে। রামের হাতে দুজনেরই পরাভব ঘটল। রামের বাণে প্রাণ হারাল তাড়কা রাক্ষসী। আর তার আরেক বাণে মারীচ শত যোজন (হাজার মাইল) দূরে গিয়ে পড়ল।

পরে এই মারীচ গিয়ে জোটে রাবণের সঙ্গে। মানে, রাবণের অনুচর হয় সে।

একবার মারীচ আরো দুই রাক্ষসসহ দণ্ডকারণ্যে এক ঋষিকে হত্যা করেছিল। তারা তিনজন তিনটা হরিণের রূপ ধরে গিয়েছিল সেখানে। তো তারা হরিণ সেজে সেই ঋষিকে হত্যা করে মজা করে তার মাংস খাচ্ছে। এমন সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। ওরা তখন সেই একই বনে বনবাসে গেছে। রামকে দেখেই মারীচ চিনতে পারল। মনে পড়ে গেল, এই রামই তার মাকে হত্যা করেছে। তাকেও বাণ মেরে শত যোজন দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে তখনই দুই সঙ্গীকে নিয়ে প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু প্রতিশোধ নেয়া তো হলোই না, উল্টো রামের বাণের আঘাতে তার সঙ্গী দুই রাক্ষসই মারা পড়ল। সে কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এল। সেই সঙ্গে এটাও বুঝে গেল, এই রামের সাথে লাগতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না। তখন থেকে সে দণ্ডকারণ্যে তপস্বীর ছদ্মবেশে বসবাস করতে শুরু করল।

এদিকে দণ্ডকারণ্যে মারীচ তপস্বীর ছদ্মবেশে বাস করছে। অন্যদিকে রাম-লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দিয়েছে। তখন শূর্পণখা গিয়ে রাবণকে বোঝাতে লাগল, এর প্রতিশোধ নিতে হবে। সে জন্য সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে আসতে হবে। সে রাবণের কাছে সীতার রূপেরও বিশদ বর্ণনা দিতে লাগল। সব শুনে রাবণও ঠিক করল, সীতাকে অপহরণ করতে হবে। সে জন্য সে এল মারীচের কাছে। সীতাহরণ করার জন্য মারীচের সাহায্য রাবণের দরকার হবে।

রাবণের পরিকল্পনাটাও মন্দ নয়। মারীচের মায়াবিদ্যা জানা আছে। সে যেভাবে মৃগ, মানে হরিণের রূপ ধরে ঋষিকে হত্যা করেছিল, তেমনি হরিণের রূপ ধরে রাম-লক্ষ্মণকে সীতার কাছ থেকে আলাদা করবে। সেই সুযোগে

www.pathagar.com

রাবণ গিয়ে সীতাকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু মারীচ এ পরিকল্পনাতে কোনোভাবেই রাজি হলো না। কারণ রামের বীরত্বের কথা তার ভালোমতোই জানা আছে। বার দুয়েক সে কোনোরকমে রামের হাত থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। আবারও সে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চায় না।

প্রথমবার তো মারীচ রাবণকে না-ই বলে দিল। কিন্তু রাবণও তো তার বোনের নাক কাটার প্রতিশোধ নেবেই। তখন সে প্রথমে মারীচকে তার রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দেওয়ার লোভ দেখাল। তাতেও রাজি হলো না মারীচ। এ যে তার জীবন-মরণের প্রশ্ন। হরিণ সেজে রাম-লক্ষ্মণের সামনে গেলে, তাকে যে আর রাম-লক্ষ্মণের হাত থেকে বেঁচে ফিরতে হবে না! তাদের বাণের আঘাতেই যে তাকে মরতে হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

লোভ দেখিয়েও যখন কাজ হলো না, তখন রাবণ ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করল। সোজা বলে দিল, মারীচ যদি হরিণ সেজে যেতে রাজি না হয়, তাহলে রাবণের হাতেই ওকে প্রাণ দিতে হবে।

এবার মারীচ পড়ল উভয়সংকটে। এদিকে হরিণ সেজে গেলে সে রামের হাতে মারা পড়বে, না গেলে রাবণের হাতে মারা পড়বে।

শেষে সে রামের হাতে জীবন দেয়াই মনস্থ করল।

শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। মায়াবলে মারীচ সোনার হরিণ সেজে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার সামনে গেল। সেই হরিণ দেখে সীতার খুবই পছন্দ হলো। সে রামের কাছে আবদার করে বসল, তার ওই সোনার হরিণ চাই। তখন রামকেও সেই হরিণ ধরতে ছুটতে হলো। যাওয়ার সময় লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দিয়ে গেল, সীতাকে পাহারা দেয়ার জন্য। ওদিকে জীবন বাঁচাতে মারীচও প্রাণপণ ছুটতে লাগল। ওকে ধরার জন্য রামও পিছু পিছু ছুটতে লাগল। শেষে ধরতে না পেরে, রাম ওর দিকে বাণ ছুঁড়ে মারল। লুটিয়ে পড়ল হরিণ-রূপী মারীচ। এবার সে স্বরূপে ফিরে এল। আর মরার আগে রাবণের জন্য আরো একটু সুবিধা করে দিয়ে গেল। মরতে মরতে সে রামের গলা অনুকরণ করে আর্তনাদ করতে লাগল—হা সীতা! হা লক্ষ্মণ!

রাম তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দ্রুত ফিরতে শুরু করল। ওদিকে সে আর্তনাদ শুনে সীতা-লক্ষ্মণ মনে করল, রাম সত্যি সত্যি ভীষণ বিপদে পড়েছে। সীতা জোরাজুরি শুরু করল, লক্ষ্মণ যেন রামকে বাঁচাতে যায়। লক্ষ্মণ অবশ্য প্রথমে সীতাকে ফেলে আসতে রাজি হচ্ছিল না। কারণ, রাম তাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে, সীতাকে পাহারা দেয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতার কথাও সে ফেলতে পারল না। রামকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। আর রাবণ তো সেই সুযোগের জন্যই বসে ছিল। ফাঁক পেয়েই সে তার কার্যসিদ্ধি

www.pathagar.com

করে নিল। অবশ্য সে সীতাকে ফুসলিয়ে আনতে পারল না। শেষে তাকে জোর করেই তুলে নিয়ে এল।

তো এই মারীচ যেমন বিপদে পড়েছিল, তার হরিণ সেজে রামের সামনে গেলেও মৃত্যু, আবার না সাজলেও মৃত্যু, কেউ যদি তেমন বিপদে পড়ে, তখন সে তার অবস্থা বোঝাতে বলে—রামে মারলেও মরব, রাবণ মারলেও মরব। অথবা বলে, আমি এখন—রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ। এই কুরঙ্গ মানে হরিণ। কিংবা—আমার এখন মারীচের দশা।

এক রামে রক্ষা নাই দোসর সুগ্রীব (দোসর লক্ষ্মণ)
অর্থ : যে একাই যথেষ্ট, অন্য কেউ তার সহায় হওয়া

একবার ব্রহ্মা যোগাসনে বসে ছিলেন। সে সময় তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। সে জল থেকে এক দিব্যবানরের জন্ম হলো। নাম ঋক্ষরজা। পরে এই ঋক্ষরজার তেষ্টা পেলে, তিনি গেলেন কাছের এক পুকুরে, পানি খেতে। তখন পুকুরের জলে তার প্রতিচ্ছবি দেখে, মনে করলেন, ও বুঝি তার কোনো শত্রু। তিনি তার ছায়াকে মারতেই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেই, ঋক্ষরজা এক অতুলনীয়া সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হলেন। ইন্দ্র আর সূর্যের ঔরসে এই মেয়ের দুই ছেলে হলো। ইন্দ্রের ছেলে বালি, আর সূর্যের ছেলে সুগ্রীব। বালি বড়, সুগ্রীব ছোট।

পরদিন ঋক্ষরজা আবার তার আপন রূপ ফিরে পেলেন। তখন তিনি তার দুই ছেলেকে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাকে বানরদের রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বানিয়ে দিলেন।

ঋক্ষরজার মৃত্যুর পর বড় ভাই বালি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হলেন। পরে এই বালির সঙ্গে শত্রুতা হয় মায়াবী নামের এক রাক্ষসের। এই মায়াবী ছিল দুন্দুভির ছেলে। তখন মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালিকে যুদ্ধের আহ্বান জানাল। বালিও তাতে সাড়া দিলেন। সঙ্গে গেলেন বালির ছোট ভাই সুগ্রীবও। দুই ভাইকে একসাথে দেখে মায়াবী ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। বালিও পেছন পেছন সে গর্তে ঢুকল। আর সুগ্রীব সে গর্তের মুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন তার ভাই বের হয়ে আসবেন তার জন্য।

বসে থাকতে থাকতে, এক বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। বালি আর আসেন না। তারপর একদিন সুগ্রীব দেখলেন, গর্তের মুখে ফেনা ফেনা

www.pathagar.com

রক্ত। তাই দেখে তিনি ধরেই নিলেন, বালি মারা গেছেন। তখন তিনি একটা বড় পাথর দিয়ে সেই গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে রাজত্ব গ্রহণ করলেন। বালির বিধবা স্ত্রী তারাকেও গ্রহণ করলেন তিনি।

ওদিকে এর কিছুদিন পরে, মায়াবীকে মেরে ফিরে এলেন বালি। এসে দেখেন, গর্তের মুখ পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করা। তাই দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেলেন বালি। আর কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে তো দেখেন, ওদিকে এলাহি কাণ্ড ঘটে গেছে। সব কিছু দেখে, ক্ষেপে গিয়ে, তিনি সুগ্রীবকে রাজ্য থেকেই বের করে দিলেন। সুগ্রীব অবশ্য অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। তাকে পুরো ঘটনাটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বালি কিছুতেই ওর কথা বিশ্বাস করলেন না।

তখন সুগ্রীব ওর বাহিনী নিয়ে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে চলে এলেন। কারণ, মতঙ্গ মুনির অভিশাপে বালি ওখানে আসতে পারতেন না।

ওদিকে তখন রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছেন। রাম-লক্ষ্মণ বের হয়েছেন সীতাকে খুঁজতে। খুঁজতে খুঁজতে তারাও মতঙ্গ মুনির আশ্রমে চলে এলেন। সেখানে তাদের সঙ্গে সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হলো। তখন সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বোঝাপড়া হলো, রাম সুগ্রীবকে সাহায্য করবেন বালিকে হারিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা পুনরুদ্ধার করতে। বিনিময়ে সুগ্রীব রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামের হয়ে লড়বেন। সে অনুযায়ী, রাম সুগ্রীবের সঙ্গে গিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা উদ্ধার করে দিলেন। রামের বাণের আঘাতে বালি মারা গেলেন। পরে সুগ্রীবও সমস্ত বানর বাহিনী নিয়ে রামের সঙ্গে লঙ্কায় এলেন। তাদের সহযোগিতা নিয়ে রাম রাবণকে হারিয়ে সীতাকে উদ্ধার করলেন। আর লঙ্কার সিংহাসনে বসালেন বিভীষণকে।

রাম নিজেই ছিলেন এক বীর। তার বীরত্বগাথার গল্প নিয়েই রামায়ণ রচিত। রাবণকে হারানোর জন্য সেই রাম একাই যথেষ্ট হওয়ার কথা। রাম একা গেলেও রাবণের পক্ষে তাকে হারানো সহজ তো হতোই না, হয়তো সম্ভবও হতো না। তার উপর তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সুগ্রীবকে। মানে সুগ্রীবের সমস্ত বানর বাহিনী। (কিংবা রামের সঙ্গে গেল তার আরেক ভাই লক্ষ্মণ, যে নিজেও কম বীর নয়।) তেমনি, কোনো একজন, যে একাই একটা কাজ করতে যথেষ্ট, কিংবা কারো মোকাবেলা করতে যথেষ্ট, সে যদি সঙ্গে অমন আরো কাউকে নিয়ে আসে, কিংবা অমন আরো কেউ তার সঙ্গী হয়, তখন বলা হয়—এক রামে রক্ষা নাই দোসর সুগ্রীব (দোসর লক্ষ্মণ)।

www.pathagar.com

অকালবোধন

অর্থ : অসময়ে আহ্বান

একবার রম্ভ নামের এক দানব শিবের তপস্যা করতে শুরু করেছিল। শিব তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হলে, রম্ভ তার কাছে ত্রিলোকজয়ী ছেলের বর চাইল। শিব তার সেই বর পূরণ করলেন। সেই বরে, রম্ভের এক ছেলে হয়—মহিষাসুর।

পরে মহিষাসুর ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করল—কোনো পুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না। তার উপর শিবের কাছ থেকে তার বাবার পাওয়া বর তো ছিলই—সে ত্রিলোকজয়ী হবে। এবার আর তাকে ঠেকায় কে! দিনে দিনে মহিষাসুর দুর্দান্ত অত্যাচারী হয়ে উঠতে লাগল। সে এমনকি দেবতাদেরকেও স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিল।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবতারা সোজা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। সব শুনে বিষ্ণুও খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। পরে অবশ্য তিনি ঠিকই একটা উপায় বাতলে দিলেন। সব দেবতাদের তেজ বা শক্তি মিলিয়ে যদি কোনো নারী দেবীকে সৃষ্টি করা যায়, তবে সেই নারীর পক্ষে মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব।

তখন দেবতারাও তাই করলেন। তাদের সবার প্রার্থনায়, তাদের মিলিত তেজ বা শক্তি এক নারীর রূপ নিল। এই নারীই দেবী দুর্গা। তখন দেবতারা তাদের সব অস্ত্রও দুর্গাকে দিলেন। আর সকল দেবতাদের শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে তিনবার বধ করলেন। প্রথম বার উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয় বার ভদ্রকালী রূপে, আর তৃতীয় বার দেবী দুর্গার রূপে। এদের মধ্যে উগ্রচণ্ডার আঠারটা হাত, ভদ্রকালীর ষোলটা হাত, আর দুর্গার হাত দশটা।

অবশ্য দুর্গার হাতে মৃত্যুতে মহিষাসুরের কোনো দুঃখ ছিল না। উল্টো সে দেবীর কাছে অনুরোধ করেছিল, যাতে সে দেবীর পূজার অংশ হতে পারে। দেবী তার সে আশা পূরণও করেছিলেন। সে জন্যই দুর্গাপ্রতিমার পায়ের কাছে মহিষাসুর থাকে। দেবতা, মানুষ, রাক্ষস—যারাই দুর্গার পূজা করে, সবার দুর্গাপ্রতিমাতেই জায়গা হয় মহিষাসুরের।

সত্যযুগের চন্দ্র বংশের রাজা সুরথ দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। ত্রেতাযুগে রাবণও দুর্গার পূজা করত। সে চৈত্র মাসে, মানে বসন্তকালে তার পূজা করত বলে, সে পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত।

তবে রাম-রাবণের যুদ্ধে দুর্গাপূজা রাবণের বিরুদ্ধেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাবণ-বধের জন্য রাম দুর্গার পূজা করেন। সে পূজাও তিনি করেছিলেন অসময়ে, পূজার সময় হওয়ার আগেই। তাতে দেবীও সাড়া দিয়ে জেগে

www.pathagar.com

উঠেছিলেন। দেবীর সেই অসময়ের পূজায় সাড়া দেয়ার ঘটনাটাকে, অকালে বা সময়ের আগেই দেবীর এভাবে জেগে ওঠার ঘটনাটাকেই বলা হয় অকালবোধন।

সে রকম কেউ যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কোনো কাজ করে বসে, তখন রামের সেই পূজার প্রসঙ্গ টেনে এই বাগধারা ব্যবহার করা হয়।

ঘরের শত্রু বিভীষণ (ঘর-সন্ধানী বিভীষণ)
অর্থ : যে স্বজন শত্রু

বিভীষণ ছিল রাবণের ছোট ভাই। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ—বিশ্রবা মুনির তিন ছেলে। ওদের এক বোনও ছিল—শূর্পণখা। ওদের মা কৈকসী ছিল সুমালী রাক্ষসের মেয়ে। কৈকসীর আরেক নাম নিকষা। এই সুমালী-ই তার মেয়ে নিকষাকে বিশ্রবা মুনির কাছে পাঠিয়েছিল। কারণটি অবশ্য মহৎ ছিল না।

সুমালীরা ছিল তিন ভাই—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। এরা একবার সুমেরু পর্বতে কঠোর তপস্যা শুরু করেছিল। শেষে ব্রহ্মা তাদের বরে তুষ্ট হন। তখন তাদেরকে তিনটি বর দেন—তারা হবে অজেয়, শত্রুহন্তা ও চিরজীবী। এবং সব সময় পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকবে। বর পাওয়ার পর তারা সমস্ত জগৎ জুড়ে উৎপাত শুরু করে। তাদের উৎপাতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শেষে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে দেবতা আর ঋষিরা মিলে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে এর প্রতিকার চান। তখন বিষ্ণু তাদের দমন করেন। বিষ্ণুর হাতে মালীর মৃত্যু হয়। মাল্যবান ও সুমালী দল-বল পরিবার-পরিজন নিয়ে পাতালে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এরই মধ্যে তারা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ত্রিকূট পর্বতে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়েছিল। তারা চলে গেলে, বিশ্রবা মুনির পরামর্শে কুবের সেখানে বসতি গাড়েন। কুবেরও ছিলেন বিশ্রবা মুনির ছেলে। ব্রহ্মার বরে তিনি ধনাধিপতি হয়েছিলেন। তার হাতে পরে লঙ্কাপুরী ভীষণ জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এর অনেক দিন পরে, একবার সুমালী পাতাল থেকে মর্ত্যলোকে আসে ঘুরতে। ঘুরতে ঘুরতে লঙ্কাপুরীতে এলে, সে কুবেরের ঐশ্বর্য, আর তার হাতে পরে লঙ্কাপুরীর জাঁকজমকের খোলতাই দেখে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। আবার লঙ্কাপুরীর দখল নেয়ার ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। সাথে প্রতিশোধের ব্যাপারটা তো আছেই। তখনই তার মাথায় আসে এই ফন্দি—বিশ্রবা মুনির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তাহলেই কুবেরের মতো ধনকুবের আর ক্ষমতাধর সন্তান পাওয়া যাবে। তখন তাদের হাতছাড়া হওয়া লঙ্কাপুরীও ফের দখল করা যাবে।

www.pathagar.com

তারপর সেই উদ্দেশ্যে সে তার মেয়ে কৈকসী (নিকষা) রাক্ষসীকে পাঠিয়ে দেয় বিশ্রবা মুনির কাছে। বিশ্রবা মুনি তখন তপোবনে তপস্যা করছিলেন। কৈকসী তার কাছে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। মাথা নিচু করে মাটিতে আঙুল দিয়ে এলোমেলো দাগ টানতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৈকসীর প্রতি চোখ পড়ল বিশ্রবা মুনির। তিনি তপস্যা বন্ধ করে কৈকসীকে তপোবনে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কৈকসী তার পরিচয় মুনিকে বললেও, তপোবনে যাওয়ার কারণ বলল না। উল্টো বলল, তপোবলে সে কারণ জেনে নিতে।

তখন বিশ্রবা মুনি ধ্যানে বসে কৈকসীর আসার কারণ জেনে নিলেন। কৈকসীর বাসনাও পূরণ করলেন। কিন্তু তার আগেই জানিয়ে দিলেন, এমনিতেই কৈকসী সকালে এসেছে। তার উপর তার ধ্যানও ভাঙিয়েছে। তার উপর উদ্দেশ্যও মহৎ নয়। তাই, তার সন্তানরা হবে রাক্ষস। খুবই খারাপ স্বভাবের রাক্ষস।

তখন কৈকসী অনেক অনুনয়-বিনয় করলে বিশ্রবা মুনি খানিকটা নরম হন। শেষে অভিশাপটা খানিকটা কমিয়ে দেন। জানান, তার ছোট ছেলে রাক্ষস হলেও, ভীষণ ধার্মিক হবে। কৈকসীর এই ধার্মিক রাক্ষস ছোট ছেলেই বিভীষণ।

তার অনেক দিন পরের কথা। তখন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ছিল বনবাসে। রাবণও বোনজামাই বিদ্যুজ্জিহ্বকে মেরে ফেলার পর, তার বোন শূর্পণখাকে সেই বনেই থাকতে দিয়েছিল। সেখানেই রামের দেখা পেল শূর্পণখা। তাকে প্রেম নিবেদন করল। রাম-লক্ষ্মণ দুজনেই তাকে ফিরিয়ে দিলে, সে রেগে গিয়ে সীতাকে খেতে উদ্যত হলো। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দিল। সেই নাক কাটার বদলা নিতে রাবণ আবার সীতাকে তুলে নিয়ে গেল। আর এই ঘটনা থেকেই রাম-রাবণের যুদ্ধের সূত্রপাত।

রাবণের এই সীতাকে তুলে নিয়ে আসার ঘটনাটাকে বিভীষণ কখনোই সমর্থন করতে পারেনি। সে বারবার রাবণকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সীতাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাবণ তার কথা তো শোনেইনি, উল্টো বিভীষণ যতবার এ প্রসঙ্গ তুলেছে, ততবারই রাবণ তাকে ভর্ৎসনা করেছে।

সীতাহরণ মেনে নিতে পারেনি রাবণের আরেক ভাই কুম্ভকর্ণও। তবে শেষ পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের কাছে তার পরিবারই বড় হয়ে ওঠে। আর তাই সে রাবণের এই কাজ সমর্থন না করলেও, রাবণের পক্ষ হয়ে রামের বিরুদ্ধে ঠিকই যুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু বিভীষণ তা করেনি। সে তার পরিবারকে ত্যাগ করে হলেও, রামের পক্ষে যোগ দেয়। সে রাক্ষস-রাজ্যের নানা গোপন কথা, আর রাক্ষসদের নানা গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে রামকে জিততে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়,

www.pathagar.com

সে এমনকি নিজে রাক্ষস হয়েও, রামের পক্ষ নিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানেও লড়াই করে।

এভাবে রামের পক্ষ নিয়ে বিভীষণ হয়তো ন্যায়ের পক্ষে থেকেছে, ধর্মের পক্ষে থেকেছে, কিন্তু আপন পরিবারের সাথেই সে শত্রুর মতো আচরণ করেছিল। আর তাই, ঘরের কেউ, মানে পরিবারের কেউ শত্রুর মতো আচরণ করলে, বা নিজেদের পক্ষের কেউ বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করলে, তাকে বলা হয় 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' (বা ঘর-সন্ধানী বিভীষণ)।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট (ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট)
অর্থ : গৃহশত্রুই বিনাশের কারণ

রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সে যুদ্ধে রামের জয়লাভের পেছনে বিভীষণের যথেষ্টই অবদান ছিল। বিভীষণ তার আপন পরিবার-কুল-জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হয়তো রাবণকে এভাবে পরাজিত হতে হতো না। রাক্ষসদের হারতে হতো না। আর তাই ধর্মের চোখে বিভীষণ ভালো হলেও, রাক্ষসদের চোখে বিভীষণ রীতিমতো গৃহশত্রু, বিশ্বাসঘাতক।

কোনো ঘরে যদি এমন গৃহশত্রু থাকে, তাহলে সে ঘরের বা পরিবারের পতনের জন্য বাইরের পক্ষের বা শক্তির খুব বেশি পরিশ্রম করা লাগে না। গৃহশত্রুই সে ঘরের বা পরিবারের পতন ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। এই অর্থ বোঝাতেই 'ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট' (ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট) বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

লঙ্কাকাণ্ড (রাম-রাবণের যুদ্ধ)
অর্থ : হুলস্থুল সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি

রামের বাবা দশরথ ছিলেন অযোধ্যার রাজা। তার বড় ছেলে রাম। কাজেই দশরথের পরে রামেরই রাজা হওয়ার কথা। কিন্তু রামের সৎমা দাসী মন্থরার প্ররোচনায় নিজের ছেলে ভরতকে রাজা বানানোর ষড়যন্ত্রে নামলেন। তার ষড়যন্ত্রে পরে দশরথেরও রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হলো। আর ছেলে রামও বাবার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য সোজা চলে গেলেন বনবাসে-দণ্ডকারণ্যে। সঙ্গে নিলেন স্ত্রী সীতাকে। ভাই লক্ষ্মণও চললেন সাথে। আর রামের সৎভাই ভরত তখন রামের এক জোড়া পাদুকা বা জুতা সিংহাসনে রেখে, রামের প্রতিনিধি হয়ে অযোধ্যা শাসন করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে রাবণ তো তখন দুর্ধর্ষ রাক্ষসরাজ। আজ এখানে এদের সাথে যুদ্ধ করছে, তো কাল ওখানে ওদের সাথে যুদ্ধ করছে। মেরেকেটে সবাইকে একাকার করে দিচ্ছে। এমনি একবার সে যুদ্ধে নামল অশ্মনগরে। সে যুদ্ধে তার হাতে প্রাণ দিল ৪০০ কালকেয় দানব। তাদের মধ্যে ছিল তার বোন শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্ব-ও। তখন আর কী করা, রাবণ শূর্পণখাকে দণ্ডকারণ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

আর ওখানে থাকতে গিয়ে শূর্পণখাই রাবণের পতন ডেকে আনল। রামকে দেখে তার ভালো লেগে গেল। সে রামের সঙ্গে প্রেম করতে গেলে, রাম-লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কেটে দিল। সে ঘটনার প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। সীতাকে না পেয়ে, রাম-লক্ষ্মণ বের হলো সীতাকে খুঁজতে। পথে তাদের সাথে পক্ষীরাজ জটায়ুর দেখা হলো। তিনিই তাদের জানালেন, সীতাকে রাবণ অপহরণ করেছে। পরে তাদের সাথে দেখা হলো হনুমানের। তার মাধ্যমে তাদের বন্ধুত্ব হলো বানররাজ সুগ্রীবের সাথে। পরে রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বানর বাহিনী সঙ্গে নিয়ে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন।

সে এক ভীষণ যুদ্ধ হলো। হাজারে হাজারে বানর-রাক্ষস মারা পরল। সবার শেষে লাগলো রাম-রাবণ যুদ্ধ। সে এক ঘোরতর যুদ্ধ। তেমন যুদ্ধ কেউ কখনো দেখেনি। ভীষণ যুদ্ধ শেষে অবশ্য রামেরই জয় হলো। রামের হাতে মারা পড়ল রাবণ। কেবল রাবণই না, যুদ্ধে রাবণের আত্মীয়স্বজন রাক্ষসদের বেশিরভাগই মারা পড়ল।

এই রাম-রাবণের পুরো যুদ্ধের বর্ণনা আছে রামায়ণের যে অংশটাতে, সে অংশের বা কাণ্ডের নাম লঙ্কাকাণ্ড।

যখন দুজনের বা দুপক্ষের মধ্যে সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি লেগে যায়, রীতিমতো হুলস্থুল বেধে যায়, তখন লঙ্কার ওই রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়, ওরা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে। কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলা হয়, ওরা রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে।

রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন
অর্থ : একের দোষে অপরের কষ্ট
সমার্থক বাগধারা : উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

লঙ্কা যুদ্ধের শুরুতেই রাম এক বিশাল সমস্যায় পড়েন। লঙ্কাপুরী তো সাগরের ওপারে। এই সাগর পার হয়ে ওপারে যাওয়া যাবে কী করে!

www.pathagar.com

রাম তখন সাগরের পাড়ে বসে সমুদ্রের আরাধনা শুরু করলেন। আরাধনা করতে করতে পেরিয়ে গেল তিন দিন তিন রাত। তবু সমুদ্র দেখা দিলেন না। শেষে ক্ষেপে গেলেন রাম। বাণ ছুঁড়ে মারলেন সাগরে। বাণে বিদ্ধ করে সাগরের সব জল শুষে নিতে উদ্যত হলেন।

তখন ভয় পেয়ে গেলেন সমুদ্র। দেখা দিলেন। রামের কাছে ক্ষমাও চাইলেন। তারপর সাগর পাড়ি দেয়ার বুদ্ধিও দিয়ে দিলেন তাকে। জানিয়ে দিলেন, বানর বাহিনীর মধ্যে এক বানর আছে, তার নাম নল। এই নলের বাবাই স্বর্গের স্থপতি বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মার ছেলে নলই পারবে সাগরের উপরে সেতু বানাতে।

নলের পারার অবশ্য কারণও ছিল। একবার বিশ্বকর্মা মন্দর পর্বতে তপস্যা করছিলেন। পাশেই মায়ের সাথে খেলছিল নল। খেলার ছলে সে বারবার দৈবতমকে সাগরে ফেলে দিচ্ছিল। আর তার মা বারবার গিয়ে তাকে সাগর থেকে তুলে আনছিল। বিশ্বকর্মার ধ্যান ভাঙলে, তার স্ত্রী তাকে ছেলের এই অদ্ভুত খেলার কথা জানাল। তখন সেই খেলার কথা শুনে বিশ্বকর্মা নলকে বর দিলেন, নল যা কিছুই জলে ফেলুক না কেন, তা ডুববে না।

দায়িত্ব পেয়ে নল সাগরের বুকে সেতু বানাল। সেই সেতু দিয়ে রাম-লক্ষ্মণ ও বানর বাহিনী সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করলেন।

কিন্তু সমস্যা হলো সমুদ্রের। কারণ, রাম সমুদ্রকে যে বাণ মেরেছিলেন, সেটা আর ছুটাতে পারলেন না। শেষে সমুদ্রই অনুরোধ করলেন, সে বাণ দ্রমকুল্য নামের এক জায়গায় ছুঁড়তে। রামও তখন দ্রমকুল্য লক্ষ্য করে শরটা ছুঁড়লেন। সেটা দ্রমকুল্যের যেখানে গিয়ে পড়েছিল, সে জায়গাটার নাম মরুকান্তার। রামের ছোঁড়া শর পড়ে সেখানে যে গর্ত হয়েছিল, সেখান থেকে ক্রমাগত জল উঠতে থাকে। সেটার নাম দেয়া হয় ব্রণকূপ।

এভাবে কোনো দোষ না করেও সমুদ্র রামের বাণে বাঁধা পড়ে। রাবণের দোষে লঙ্কার যুদ্ধ হলো, আর বিনা দোষে বাঁধা পড়ল সমুদ্র। আর তাই যদি একজনের দোষে আরেকজনকে কষ্ট করতে হয়, তখন এই প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়—এ যে রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন।

নাগপাশে আবদ্ধ করা, নাগপাশে বাঁধা
অর্থ : দুশ্ছেদ্য বন্ধন

নাগপাশ এক ধরনের পৌরাণিক অস্ত্র। এটা মূলত বরুণের অস্ত্র। বরুণ ঋষিদের অন্যতম প্রধান দেবতা। বেদের অনেক জায়গাতেই বরুণের উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে। আছে মিত্রেরও উল্লেখ। তবে বেদে বেশিরভাগ সময়েই তাদের দুজনকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে 'মিত্রাবরুণ' নামে। বেদ অনুসারে এরা দিন-রাতের দেবতা। মিত্র দিনের, মানে আলোর দেবতা। আর বরুণ রাতের, মানে আবরণের দেবতা। বেদ অনুসারে অবশ্য মিত্র, বরুণ উভয়েই ইন্দ্রের নামান্তর। তবে অন্যান্য অনেক পুরাণেই তাদের পৃথক বলা হয়েছে।

এই নাগপাশ পরে ইন্দ্রজিতের হাতে আসে। ইন্দ্রজিতের আসল নাম মেঘনাদ। সে রাবণের ছেলে। স্বর্গ জয় করার সময় রাবণ ছেলে মেঘনাদকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে মেঘনাদ প্রথমে ইন্দ্রের ছেলে জয়ন্তকে পরাজিত করে। তারপর সে স্বয়ং ইন্দ্রকেও পরাজিত করে। মেঘনাদ শিবের কাছ থেকে বর পেয়েছিল যে, সে মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করতে পারবে। সেই কৌশলেই মেঘনাদ ইন্দ্রকে হারিয়েছিল। পরে ব্রহ্মা তাকে বর দিলে সে ইন্দ্রকে মুক্ত করে। আর ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তার নাম হয় ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রের কাছ থেকে ইন্দ্রজিৎ নাগপাশ অস্ত্রও পায়। কাউকে এই নাগপাশ ছুঁড়লে, লক্ষ লক্ষ সাপ বের হয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। কেবলমাত্র গরুড় অস্ত্র প্রয়োগেই এই নাগপাশ ছোটানো যায়। কেননা, গরুড় সাপের শত্রু।

আবার কোনো কোনো পুরাণে আছে, ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘনাদ এই অস্ত্র ইন্দ্রের কাছ থেকে পায়নি। তাকে এই অস্ত্রটি জোগাড় করে দেয় তার স্ত্রী প্রমীলা। সে নাগদেবীর উপাসনা করে, তার কাছ থেকে স্বামীর জন্য নাগপাশ অস্ত্র সংগ্রহ করে।

লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ এই নাগপাশ অস্ত্র প্রয়োগ করে। যুদ্ধের শুরুতেই ইন্দ্রজিৎ বানরদের যুবরাজ অঙ্গদের কাছে পরাজিত হয়। তখন ক্ষেপে গিয়ে সে নাগপাশ নিয়ে এসে রাম-রাবণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে। রাম-রাবণ নাগপাশে আবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ওই গরুড় অস্ত্রের কল্যাণেই তারা ছাড়া পায়।

কোনো বন্ধন যদি এমন নাগপাশ অস্ত্রের মতো হয়, নাগপাশ অস্ত্রের প্রয়োগে যেমন লাখ লাখ সাপ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, তেমনি যদি কোনো বন্ধন কাউকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, তখন এই নেতিবাচক বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়; বলা হয় তাকে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে/আবদ্ধ করেছে।

গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত

অর্থ : ভীষণ অলস, যে বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায়

রাবণরা ছিল তিন ভাই। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে কুম্ভকর্ণই ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তার খিদেও ছিল ভীষণ। জন্মের পরপরই সে ভীষণ খিদায় কয়েক

www.pathagar.com

হাজার রাক্ষস প্রজাকে খেয়ে ফেলেছিল। শেষে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করে তাকে থামিয়েছিলেন।

পরে ওরা তিন ভাই—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ গোকর্ণ আশ্রমে তপস্যায় বসল। উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্টও করল। তারপর কুম্ভকর্ণ বর চাইল—অমরত্ব।

কিন্তু ব্রহ্মা রাজি হলেন না। তিনি উল্টো বর না দিয়েই চলে এলেন। দেবতারাও ব্রহ্মাকে গিয়ে বললেন, কুম্ভকর্ণকে বর দিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই ও যা খায়! ততদিনে কুম্ভকর্ণ খাদক হিসেবে বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছে। রাক্ষস-প্রজা যে কত খেয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। আরো খেয়েছে স্বর্গের সাতজন অপ্সরী, ইন্দ্রের দশজন অনুচর আর অসংখ্য মুনি-ঋষি। বর পেয়ে অমর হয়ে গেলে যে কী হবে, ততদিনে তা আর দেবতা-মুনি-ঋষিদের বুঝতে বাকি নেই। হয়তো ত্রিভুবনই খেয়ে ফেলবে।

ওদিকে কুম্ভকর্ণ আবার কঠোর তপস্যায় বসে গেছে। সে তপস্যা এমন কঠোর, পুরো পৃথিবী ভীষণ গরম হয়ে উঠল। এই যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, এমন অবস্থা! ব্রহ্মা তো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। তার স্ত্রী সরস্বতীকে বললেন, কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে। ব্রহ্মা যখন কুম্ভকর্ণের কাছে বর জানতে চাইবেন, তখন কুম্ভকর্ণের বদলে সরস্বতী-ই যেন অন্য একটা বর চান।

তেমনি-ই হল। ব্রহ্মা তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কুম্ভকর্ণ কী বর চায়, জানতে চাইলেন। কুম্ভকর্ণ বলল 'অনন্ত জীবন'। কিন্তু গলায় ঘাপটি মেরে থাকা সরস্বতী সেটাকে বদলে দিলেন। কুম্ভকর্ণের গলা দিয়ে বেরুল 'অনন্ত নিদ্রা'। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলে নিশ্চিন্তে বর দিয়ে দিলেন।

চৈতন্য আসার পর তো কুম্ভকর্ণের মাথায় হাত! পরে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সে কী অনুনয়-বিনয়। শেষে ব্রহ্মা বরটা একটু পাল্টে দিলেন—ছয় মাস পরপর একদিনের জন্য কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে। অবশ্য তাতেও একটা সমস্যা থেকেই গেল—অসময়ে ঘুম ভাঙলে আবার কুম্ভকর্ণের মৃত্যুও হতে পারে। কুম্ভকর্ণের এই ঘুম কেবল যে ছয় মাস স্থায়ী হতো, তাই না। সে ঘুমটাও হতো একদম গাঢ়, মড়ার মতো।

পরে তার বড় ভাই, লঙ্কার অধিপতি রাবণ তার ঘুমানোর জন্য এক বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। সে প্রাসাদ দৈর্ঘ্যে দুই যোজন, প্রস্থে এক যোজন। সে প্রাসাদ দেখতেও ছিল ভীষণ সুন্দর। সেখানেই ছয় মাসব্যাপী ঘুমাত কুম্ভকর্ণ। তারপর একদিনের জন্য উঠে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করে, আবার পরদিনই ঘুমিয়ে যেত।

www.pathagar.com

এই কুম্ভকর্ণ বিশাল বীর ছিলেন। তার শৌর্য-বীর্যের তুলনা ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মার বরের কারণে বছরের প্রায় পুরোটাই ঘুমিয়ে কাটত তার। সে প্রসঙ্গ টেনে, যে ব্যক্তি ভীষণ অলস, এমন অলস যে দিনের বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়, তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।

কুম্ভকর্ণের ঘুম/নিদ্রা
অর্থ : মড়ার মতো ঘুম

ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ একেক বারে ছয় মাস করে ঘুমাত। তারপর একদিনের জন্য উঠে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করে, আবার পরদিনই ঘুমিয়ে যেত সে। রাম যখন লঙ্কাপুরী আক্রমণ করতে গেলেন, তখন একবার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল। তখনো সাগরের উপর দিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত ওই ভাসমান সেতুটা বানানো হয়নি। পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করতে সেদিন রাবণ একটা মন্ত্রণা সভা ডাকল। এই ব্যাপার নিয়ে ওটা ছিল রাবণের দ্বিতীয় মন্ত্রণা সভা। সে সভায় তার দুই ভাই কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ দুজনই উপস্থিত ছিল। এই দুজনের কেউ-ই তার সীতাহরণের ব্যাপারটা সমর্থন করেনি। তবে কুম্ভকর্ণ শেষ পর্যন্ত রাবণকে আশ্বাস দিল, যুদ্ধে সে রাবণের সঙ্গেই থাকছে।

এরপর তো কুম্ভকর্ণ ঘুমুতে গেল। তারপরই লেগে গেল যুদ্ধ। রাম-রাবণের যুদ্ধ। আর কয়েক দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের পরই রাক্ষসরা একদম বেকায়দায় পড়ে গেল। শেষে আর উপায় না দেখে রাবণ সিদ্ধান্ত নিল, কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে।

কিন্তু কুম্ভকর্ণ তো ঘুমিয়েছে মোটে নয় দিন হলো। ছয় মাসের আগে তো তার ঘুম ভাঙে না। এদিকে কুম্ভকর্ণকে ছাড়া চলছেও না। নইলে রাক্ষসদের পরাজয় স্রেফ সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে এলাহি কাণ্ড জুড়ে দেয়া হলো।

প্রথমে দুনিয়ার রাক্ষস এসে কুম্ভকর্ণের কানের কাছে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সঙ্গে বিকট সব বাদ্যবাজনা। কিন্তু কুম্ভকর্ণের কোনো হেলদোলই হলো না। তখন কতগুলো রাক্ষস সাহস করে তার চুল টানতে শুরু করল। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল না। তখন কতগুলো রাক্ষস গিয়ে তার কান কামড়াতে শুরু করল। যাদের সাহস একটু বেশি, তারা কানে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে লাগল। তাতেও কোনো লাভ হলো না।

www.pathagar.com

তখন রাক্ষসরা সবাই সবার অস্ত্র দিয়ে কুম্ভকর্ণকে মারতে শুরু করল। যাদের অস্ত্র বর্শা-বল্লম, তারা সেগুলো দিয়ে কুম্ভকর্ণকে খোঁচাতে লাগল। যাদের অস্ত্র গদা, তারা তাদের গদা দিয়ে কুম্ভকর্ণকে আঘাত করতে লাগল। কিছুতেই কিছু হলো না। কোনোমতেই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো গেল না।

যদি কেউ এমন মড়ার মতো ঘুমায়, শত ডাকাডাকিতেও কাজ হয় না, তখন তার সেই ঘুমকে বলা হয় কুম্ভকর্ণের ঘুম। আর যাদের ঘুম স্বভাবতই এমন গাঢ়, মড়ার মতো, শত ডাকলেও উঠতে পারে না, তাদের ঘুমের জন্য তো এই বাগধারা শতভাগ প্রযোজ্য।

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙা/ নিদ্রা ভঙ্গ

অর্থ : প্রয়োজনীয় কাজে দীর্ঘদিনের উপেক্ষা শেষে উদ্যোগ গ্রহণ

রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর জন্য এলাহি কাণ্ড জুড়ে দেয়া হয়েছিল। তার কানের কাছে বাদ্য-বাজনা বাজানো থেকে শুরু করে বর্শা-বল্লম দিয়ে খোঁচা মারা, গদার আঘাত করা—কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে আর কোনো পথ না পেয়ে হাজারখানেক হাতি আনা হলো। সেই হাতিগুলোকে চড়িয়ে দেয়া হলো কুম্ভকর্ণের উপর। হাজারখানেক হাতি থপথপ করে কুম্ভকর্ণকে পায়ে দলে চলতে লাগল।

তখন নড়েচড়ে উঠল কুম্ভকর্ণ। হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল। অবশেষে ঘুম ভাঙল কুম্ভকর্ণের।

তারপর অবশ্য যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে একাই হিসাব-নিকাশ প্রায় উল্টেই দিয়েছিল কুম্ভকর্ণ। বানরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় সে। তার একার হাতেই কাটা পড়ে বহু বানরসৈন্য। বানরদের সেরা বীর হনুমানও তার কাছে পরাজিত হয়। সুগ্রীবকে তো অজ্ঞান করে ধরেই নিয়ে যাচ্ছিল লঙ্কাপুরীতে। শেষে জ্ঞান ফিরলে আঁচড়ে-কামড়ে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালান বানররাজ সুগ্রীব।

অবশ্য লক্ষ্মণ আর বিভীষণের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি কুম্ভকর্ণ। ভাই বলে বিভীষণের সঙ্গে লড়াই করেনি। আর লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করলে কুম্ভকর্ণ তাকে এড়িয়ে যায়। তার বীরত্বের প্রশংসা করে, তাকে পাশ কাটিয়ে, সরাসরি রামের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় সে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রামের কাছে হেরে যায় কুম্ভকর্ণ। তবে তার আগে তাদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে রামের বাণের আঘাতে কুম্ভকর্ণের হাত থেকে তার গদা পড়ে যায়। তারপর রাম শরের আঘাতে কুম্ভকর্ণের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দেন। ক্ষেপে গিয়ে কুম্ভকর্ণ হাতের কাছে যা পায় খেতে থাকে।

www.pathagar.com

খেয়ে ফেলে কাছের বনের অসংখ্য বানর আর ভল্লুক। তারপর আবার গদা হাতে নিয়ে বিপুল বিক্রমে রামের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে।

তখন রাম বায়ব্যাস্ত্র দিয়ে কুম্ভকর্ণের সেই গদাসহ হাত কেটে ফেলেন। কুম্ভকর্ণ তখন অন্য হাত দিয়ে একটা আস্ত তালগাছ উপড়ে নেয়। তারপর সেই তালগাছ দিয়েই রামকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। রাম তখন ঐন্দ্রাস্ত্র ছুঁড়ে কুম্ভকর্ণের অন্য হাতটিও কেটে ফেলেন। আর অর্ধচন্দ্র বাণ মেরে কেটে ফেলেন তার দুই পা। শেষে আবার ঐন্দ্রাস্ত্র ছুঁড়ে মাথা কেটে ফেললে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুবরণ করার আগে কুম্ভকর্ণ বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে যথাসময়ে যুদ্ধ শুরু করেনি। রাম যখন লঙ্কা আক্রমণ করেছে, তখন সে ঘুমাচ্ছিল। রাম-সুগ্রীবের মিলিত বাহিনীর কাছে যখন একের পর এক রাক্ষস সেনাপতিরা পরাজিত হচ্ছিল, একের পর এক রাক্ষস বীরদের পতন ঘটছিল, তখনো সে ঘুমাচ্ছিল। একদম শেষ পর্যায়ে এসে, যখন রাবণ আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি, তখনই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করা হয়।

আর তাই কোনো প্রয়োজনীয় কাজ যদি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করে ফেলে রাখা হয়, কিংবা কোনো কাজ করে ফেলাটা জরুরি হয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন না করা হয়, এভাবে অনেক দেরি করে, তারপর যখন একদম শেষ মুহূর্তে এসে সে, কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন ব্যঙ্গ করে বলা হয়, অবশেষে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল (বা নিদ্রা ভঙ্গ হলো)।

রামের হনুমান

অর্থ : নিতান্ত অনুগত ভৃত্য/কর্মচারী

হনুমান বায়ুর ছেলে। তিনি বায়ুর মতোই বেগবান, আর ভীষণ পরাক্রমশালী। হনুমানের মা অঞ্জনা একদিন তাকে গুহায় রেখে গিয়েছিলেন তার জন্য ফল আনতে। এরই মধ্যে হনুমানের এত খিদা পেয়ে গেল, তিনি নিজেই বেরিয়ে গেলেন খেতে। গিয়ে দেখেন, আকাশে জ্বলজ্বলে সূর্য। তার মনে হলো, ওটা একটা ফল, ঝুলছে আকাশে। ফল মনে করে তিনি আস্ত সূর্যটাই খেতে গেলেন। সূর্য আবার ওকে বাঁচাতে তখন ঠাণ্ডা হয়ে রইলেন।

হনুমান সূর্যের রথে এসে দেখেন, সূর্যের রথে রাহু বসে আছে। তিনি তখন রাহুকেই সেই ফল মনে করে খেতে যান আর কি। আর কোনো পথ না দেখে রাহু ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলো। ইন্দ্র এক বজ্রপ্রহার করে হনুমানকে নিচে ফেলে দিলেন। তাতে হনুমানের 'হনু'র, মানে মুখের একদম দফারফা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তখন ছেলের শোকে বায়ু গুহায় গিয়ে বসে রইলেন। এদিকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বাতাসের জন্য হাহাকার পড়ে গেল। নিরুপায় হয়ে, সবাই গিয়ে ধরলো ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা তখন সবাইকে নিয়ে বায়ুর কাছে গেলেন। হনুমানকে বাঁচিয়ে তুললেন।

তখন বায়ু তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে ত্রিভুবনে প্রবাহিত হতে শুরু করলেন। আর অন্য সব দেবতারাও খুশি হয়ে হনুমানকে বর দিতে শুরু করলেন। তাদের বরে হনুমান ভীষণ পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন। বজ্রের আঘাতে 'হনু' ভেঙে গেছে বলে, ব্রহ্মা ওর নাম দিলেন 'হনুমান'।

তার অনেক পরের কথা। তখন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনবাসে ছিলেন। শূর্পণখার অপমানের শোধ নিতে, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। রাম-লক্ষ্মণও বের হলেন সীতাকে খুঁজতে। খুঁজতে খুঁজতে তারা পৌঁছে গেলেন মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। ওখানে তখন বানরদের রাজা সুগ্রীব থাকেন। কারণ তার বড় ভাই বালি ভুল বুঝে তাকে বানরদের রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা থেকেই বের করে দিয়েছেন। তাই তিনি তার দলবল নিয়ে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ, মতঙ্গ মুনির শাপে বালি এখানে আসতে পারেন না। হনুমান তারই দলের একজন। একজন বলাও ঠিক না, তার বানর বাহিনীর সেরা বীর এই হনুমান।

তো আশ্রমে নতুন মানুষের আনাগোনার খবর পেয়েই সুগ্রীব হনুমানকে পাঠালেন তাদের পরিচয় জানতে। আর পরিচয় জেনে হনুমান তাদেরকে একদম পিঠে করে নিয়ে গেলেন সুগ্রীবের কাছে।

তখন থেকেই হনুমান রামের ভক্ত। রামের প্রতি তার এই ভক্তি-ভালোবাসার কোনো জাগতিক কারণ বা মোহ—কিছুই ছিল না। যাকে বলে নিষ্কাম ভক্তি। এই হনুমান কেবল বীর ও পরাক্রমশালীই ছিলেন না, তার চরিত্রও ছিল উন্নত। যেমন ছিলেন তেজস্বী, তেমনি ধৈর্যশীল। নীতিবান, সরল, বিনয়ী, আবার একই সঙ্গে বুদ্ধিমান ও পৌরুষদীপ্ত।

রাম-রাবণের যুদ্ধে সুগ্রীব রামের পক্ষে যুদ্ধ করেন। আর সুগ্রীবের বিশাল বানর বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছিলেন হনুমান। সব দেবতাদের বর যে তার সঙ্গী! সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কাপুরীর খবর আনার প্রয়োজন হলে হনুমান ইয়া বড় এক লাফ দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যান লঙ্কায়। তারপর সব খোঁজখবর নিয়ে, রেকি করে, সীতার সঙ্গে দেখা করে, শেষে লেজের আগুনে লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, তবেই ফেরেন।

যুদ্ধ শুরু হলে, তাতেও হনুমান অশেষ বীরত্ব দেখান। তার হাতে মারা পড়ে বহু রাক্ষস। এমনকি জম্বুমালী, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, দেবান্তক, ত্রিশিরা,

www.pathagar.com

নিকুম্ভের মতো ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস-সেনাপতিও তার হাতে মারা যায়। আবার ভয়ঙ্কর সে যুদ্ধে একবার রাবণের একটা শক্তিশেল লক্ষ্মণকে আঘাত করলো। লক্ষ্মণ সে, শক্তিশেলে ঘায়েল হয়ে মরতে বসলেন। তখন বানরদের রাজচিকিৎসক সুষেণ বললেন, গন্ধমাদন পর্বত থেকে ঔষধি লতা আনতে হবে। নইলে লক্ষ্মণকে বাঁচানো যাবে না। তখন এই হনুমানই গন্ধমাদনে যান সেই লতা আনতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি আর ঔষধি লতা চিনতে পারেন না। পরে পুরো গন্ধমাদন পর্বতই তুলে নিয়ে আসেন হনুমান।

অযোধ্যায় রামের অভিষেকের পর, বানররা যখন কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসছিল, তখন রাম তার শরীরের সব অলঙ্কার দুই বানর বীরকে দেন। তাদেরই একজন হনুমান। পরে রাম তার নিজের গলার হারও খুলে হনুমানকে পরিয়ে দেন। তারপর স্রেফ জানিয়ে দেন, হনুমান তার জন্য যা যা করেছেন, সে ঋণ তিনি কোনোদিনই শোধ করতে পারবেন না। বিনিময়ে হনুমান উল্টো প্রার্থনা করেন, রামের প্রতি তার ভক্তি ও ভালোবাসা যেন অবিচলিত থাকে। সঙ্গে অবশ্য একটা বরও চেয়ে নেন হনুমান—যতদিন পৃথিবীতে রামের কথা প্রচলিত থাকবে, ততদিন যেন তিনিও বেঁচে থাকেন।

রামের জন্য হনুমান যে এত কিছু করলেন, তার সবই নিতান্তই রামের প্রতি তার ভক্তি থেকে, ভালোবাসা থেকে। সে ভক্তির জোরেই তিনি একা লঙ্কাপুরীতে গিয়ে, সীতার সঙ্গে দেখা করে, ফেরার পথে আবার লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মানে, রামের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। রামের জন্য যা যা করার দরকার পড়েছে, যখন রাম যা যা আদেশ দিয়েছেন, সবই হনুমান জীবন পণ রেখে হলেও পালন করেছেন। এ রকম যে ভৃত্য বা কর্মচারী তার মনিবের প্রতি অনুগত, মনিবের জন্য প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখতেও দ্বিধা করে না, তাদেরকেই বলা হয়—রামের হনুমান।

গন্ধমাদন বয়ে/তুলে আনা

অর্থ : কাউকে কোনো জিনিস আনতে দিলে, যদি আরো অনেক কিছু নিয়ে আসে

ভয়ঙ্কর রাম-রাবণের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রামের পুরো বাহিনীই ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাম-লক্ষ্মণ পর্যন্ত ব্যথা-যাতনায় কাতর হয়ে পড়েন। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পুরো বানর বাহিনীও। তখন বানরদের রাজচিকিৎসক সুষেণ এক ওষুধ বাতলান। সে জন্য ঔষধি লতা নিয়ে আসতে হবে গন্ধমাদন পর্বত থেকে।

www.pathagar.com

এই গন্ধমাদন আসলে হিমালয়ের উত্তরের এক পর্বতের নাম। এই নয়নাভিরাম পর্বত জুড়ে আছে নানা ঔষধি গাছ। ওখানে মূলত ৪ ধরনের ঔষধি গাছ আছে—মৃত সঞ্জীবনী বা মৃতকে জীবিত করার, বিশল্যকরণী বা ব্যথানাশক, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী। এসব ঔষধি বৃক্ষের যে কেবল ঔষধি গুণই আছে, তাই নয়। এগুলোর গন্ধও ভীষণ। এই পর্বতের আশেপাশে যেই আসে, তাকেই গাছগুলো গন্ধে মত্ত করে তোলে। তাই এই পর্বতের নাম 'গন্ধমাদন'।

কিন্তু যুদ্ধ করে সবাই ক্লান্ত, ব্যথায় কাতর, যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। অত দূরে যাবে কে? তখন দায়িত্ব বর্তালো হনুমানের কাঁধে। তিনি ইয়া বড় এক লাফ দিয়ে পৌঁছে গেলেন গন্ধমাদনে। নিয়ে আসলেন সেই লতা। আর তার গন্ধেই সবার ব্যথা-যাতনা উবে গেল।

পরের বার অবস্থা দাঁড়াল আরো গুরুতর। রাবণের একটা শক্তিশেল লক্ষ্মণকে আঘাত করলো। লক্ষ্মণ সেই শেলের ঘায়ে আহত হয়ে মরতে বসলেন। আবার সুষেণ গন্ধমাদন থেকে ঔষধি লতা আনার আদেশ দিলেন হনুমানকে। হনুমান আবারো লাফিয়ে পৌঁছে গেলেন গন্ধমাদনে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর ঔষধি লতা চিনতে পারেন না। কোনটা যে সুষেণ নিতে বলেছেন, সে আর কিছুতেই মেলাতে পারেন না। তখন হনুমান পুরো গন্ধমাদন পর্বতই তুলে নিয়ে গেলেন সুষেণের কাছে। তারপর সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণও সুস্থ হয়ে উঠলেন।

সেখান থেকেই, কাউকে যদি একটা জিনিস আনতে বললে সে অনেকগুলো জিনিস নিয়ে হাজির হয়, তখন এই কাহিনির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়, একেবারে 'গন্ধমাদন বয়ে এনেছে'।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ (মনে মনে লঙ্কা ভাগ, লঙ্কা ভাগ করা)
অর্থ : ঘটনা ঘটার আগেই লাভের হিসাব করা
সমার্থক বাগধারা : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

কালনেমি ছিল রাবণের মামা। সে বিখ্যাত হয়ে আছে গাছে কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দেয়ার জন্য। না, সে সত্যি সত্যি কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দেয়নি। কিন্তু যা করেছে, তার অর্থ অমনই দাঁড়ায়।

তখন লঙ্কার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মানে রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণ একবার শক্তিশেল মেরে রামের ভাই লক্ষ্মণকে মেরেই ফেলেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বানরদের রাজচিকিৎসক সুষেণ হনুমানকে পাঠাল গন্ধমাদন পর্বতে। সেখানকার এক ঔষধি লতা দিয়েই কেবল লক্ষ্মণকে বাঁচানো সম্ভব। ওদিকে রাবণও তার মামা কালনেমিকে পাঠাল হনুমানকে আটকাতে।

www.pathagar.com

কিন্তু কালনেমি এমনি এমনি যেতে রাজি হলো না। রাবণ তখন তাকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল। কালনেমি যদি হনুমানকে আটকাতে পারে, রাবণ তাকে লঙ্কারাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দেবে। কালনেমি শুধু যে প্রতিশ্রুতিই আদায় করল, তাই না। কাজে নামার আগেই, লঙ্কারাজ্যের কোন অর্ধেক নেবে, সেটাও মনে মনে ঠিক করে নিল। লঙ্কা ভাগ করে, নিজের অংশ ঠিক করে, তাই নিয়ে মনে মনে বিশাল পরিকল্পনাও করে ফেলল সে। তারপর গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে হনুমানকে আটকানোর ফন্দি আঁটল।

হনুমান গন্ধমাদনে গেলে, কালনেমি তাকে নিজের আশ্রমে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল। হনুমানের তো তখন এসব আতিথ্য গ্রহণের সময় নেই। সে কালনেমিকে না বলে দিয়ে, পাশের পুকুরে নামল গোসল করতে। নামতে না নামতেই এক কুমির এসে হনুমানের পা কামড়ে ধরল। আর যায় কোথায়, হনুমান সাথে সাথে ওই কুমিরকে ধরে মেরে ফেলল।

আসলে ওই কুমির ছিল এক অভিশপ্ত অপ্সরা, মানে স্বর্গের নর্তকী। এক দক্ষের অভিশাপে সে কুমির হয়ে ছিল। হনুমানের হাতে নিহত হয়ে তার শাপমুক্তি ঘটল। তাকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনায় সে তো হনুমানের উপর বেজায় খুশি হলো। তারপর তাকে কালনেমি সম্পর্কে সব বলে দিল। বলে দিল, কী কূটবুদ্ধি নিয়ে সে হনুমানকে তার আশ্রমে দাওয়াত দিচ্ছে।

শুনে আর কী, হনুমান কালনেমিকে ধরে এমন জোরে ছুঁড়ে মারল, শূন্যে উড়তে উড়তেই বেচারা মারা গেল। আর তার মৃতদেহটা উড়ে গিয়ে পড়ল একেবারে রাবণের সিংহাসনের উপর।

এরকম কেউ যদি ঘটনা ঘটার আগেই লাভের হিসাব করতে শুরু করে, মানে গাছে কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল দিতে শুরু করে, তখন উপরের ওই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয় 'কালনেমির লঙ্কা ভাগ' করছে। কিংবা বলা হয়, 'মনে মনে লঙ্কা ভাগ করছে'। অথবা আরো সংক্ষেপে বলা হয়, 'লঙ্কা ভাগ করছে' আর কি।

রাবণের চিতা

অর্থ : অনন্তকালীন শোকের স্মৃতি, অন্তহীন যন্ত্রণা বা মর্মদাহ

লঙ্কাপুরে তো রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হলো। ভীষণ যুদ্ধ শেষে রামেরই জয় হলো। রাবণ হারল, রামের হাতে সে মারাও পড়ল। তারপর রাবণের চিতা প্রস্তুত করে তাতে আগুন দেওয়া হলো। এই শোকের মধ্যেও রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী ভগবান রামচন্দ্রকে দেখে তার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

www.pathagar.com

প্রণাম পেয়ে রামও ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন। তখন তিনি মন্দোদরীকে আশীর্বাদ করলেন--'চির সৌভাগ্যবতী হও'। কিন্তু তা কী করে হয়! মন্দোদরী যে সদ্য বিধবা হলেন। তার স্বামীই যে রামের কাছে পরাজিত হয়ে এখন চিতায় পুড়ছে। তখনকার প্রথা অনুযায়ী, তার যে তখন স্বামীর চিতায় ওঠার কথা। মানে, সহমরণে যাওয়ার কথা।

সবটা শুনে তখন রাম বর দিলেন, রাবণের চিতা অনির্বাণ হয়ে জ্বলতে থাকবে। জ্বলতে থাকবে অনন্তকাল। আর ভগবান রামচন্দ্রের বর, সুতরাং রাবণের চিতা জ্বলছে তো জ্বলছেই। মন্দোদরীকেও তাই সহমরণে যেতে হয়নি। তবে সহমরণে যেতে না হলেও, সারা জীবন চোখের সামনে স্বামীর চিতা জ্বলতে দেখতে হয়েছে তাকে।

অবশ্য অন্য আরেকটি পুরাণে বলা হয়েছে, রাম এই বর দিয়েছিলেন মূলত রাবণের বীরত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে।

সে যে কারণেই হোক, রাবণের চিতা অনির্বাণ। আর এই চিতা রাক্ষসকুলের জন্য অনন্তকাল শোক বহন করছে। এই চিতাই যে তাদের সেই ঐতিহাসিক পরাজয়ের স্মারক। সেই যুদ্ধেই যে তাদের সব বীর মারা পড়ল। তারা হেরে গেল। আর তাই অনন্তকালীন শোকের স্মৃতিকে বোঝাতে বলা হয়—রাবণের চিতা।

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম

অর্থ : কেউ-ই অজেয় নয়, সকলেরই দমনকর্তা আছে

সমার্থক প্রবাদ : বাবারও বাবা আছে, সব রোগেরই ওষুধ আছে

রাবণরা তিন ভাই—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। ছোটবেলাতেই তারা তিন ভাই একবার ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে। তখন ব্রহ্মা তাদের বর চাইতে বললে, রাবণ অমরত্বের বর চায়। কিন্তু সে তো আর দেয়া সম্ভব নয়। তাই রাবণ বর চায়, তাকে যেন কোনো দেব-দানব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ মারতে না পারে। আর সেই বর পাওয়ার পরই রাবণের অপকর্মের শুরু।

তখন লঙ্কায় রাজত্ব করছিলেন যক্ষদের রাজা কুবের। প্রথমেই রাবণ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কা দখল করল। সেখানে আবার রাক্ষস-রাজ্য স্থাপন করল। নিজে থাকার জন্য সেখানে বানাল সুরম্য অলকানগরী। তারপর একে-ওকে পীড়ন-অত্যাচার করতে শুরু করল। অবশ্য সবার সাথেই জিততে পারেনি সে। নর্মদার তীরের হৈহয় রাজ্য আক্রমণ করলে, সেখানকার রাজা কার্তবীর্য তাকে পরাস্ত করে। আবার বানররাজ্য আক্রমণ করলে, বানররাজ বালির হাতে পরাজিত হয় সে।

www.pathagar.com

আরেকবার রাবণের সাথে দেখা হয় শিবের দুই অনুচরের একজন, নন্দীর সঙ্গে। এই নন্দীর মুখ আবার বানরদের মতো। তাই দেখে রাবণ তো হেসেই খুন। তাতে রেগে গিয়ে নন্দী রাবণকে অভিশাপ দেন, তার মতো বানরের হাতেই রাবণের বংশলোপ হবে। আর সে অভিশাপ শুনে, ক্ষেপে গিয়ে রাবণ কৈলাস পর্বত ধরে উপরে তুলতে থাকে।

তখন সেই পর্বতে দুই অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী আর স্ত্রী গঙ্গাকে নিয়ে বাস করেন স্বয়ং শিব। শেষে তিনি এসে পায়ের এক আঙুল দিয়ে কৈলাস পর্বত চেপে ধরলেন। এবার উল্টো রাবণই বিপদে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে উঠল সে। আর তার মন্ত্রীরা সবাই বসে গেল শিবের স্তব করতে। এভাবে এক হাজার বছর রাবণ বিকট চিৎকার করতে করতে শিবের স্তব করল। তারপর শিব সন্তুষ্ট হলেন। তখন রাবণকে মুক্ত তো করে দিলেনই, সঙ্গে রাবণকে আরো দুটো বর দিলেন। প্রথম বর হিসেবে রাবণ চাইল, ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘায়ুর শেষ পর্যন্ত যেন সে উপভোগ করতে পারে। আর দ্বিতীয় বর হিসেবে চাইল একটি বিশেষ অস্ত্র। শিব তাকে চন্দ্রহাস খড়্গ দিলেন।

এবার রাবণ আরো দুর্বিনীত হয়ে উঠল। পৃথিবীর সব ক্ষত্রিয়দের সে আক্রমণ করতে শুরু করল। অনেক ক্ষত্রিয় রাজা রাবণের নাম শুনেই পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। যারা প্রতিরোধ করলেন, তারাও একে একে হারতে লাগলেন। হেরে গেলেন মরুত্ত, দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা ও অনরণ্য। তারপর রাবণ পরিকল্পনা আঁটছিল, এবার রসাতল জয় করে অমৃতমন্থন করবে।

সে সময় তার সাথে দেখা হয় নারদের। নারদ তাকে বুদ্ধি দিল, যদি হারাতেই হয়, তাহলে রাবণ যমকেই হারিয়ে দেখাক। তবেই না বোঝা যাবে, সে কত বড় বীর। রাবণও ভেবে দেখল, নারদ তো ঠিক কথাই বলেছে। হারাতেই যদি হয়, তাহলে সে যমকেই হারিয়ে দেখাবে। সে তখন যমের রাজ্য আক্রমণ করতে রওয়ানা দিল।

ওদিকে রাবণের আগেই নারদ সেখানে চলে গেল। গিয়ে যমকে সতর্ক করে দিল। তাতেও অবশ্য লাভ হলো না, যুদ্ধে যম খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত যমকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হলো।

আরেক পুরাণে অবশ্য আছে, যম পালিয়ে যাননি। ব্রহ্মা এসে তাদের মধ্যস্থতা করে দেন। সে মধ্যস্থতার পরে রাবণ নিজেই নিজেকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা করে। সেটাও যদি বিবেচনা করা হয়, তাতেও রাবণের বীরত্ব কমে না। যমের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করাটাও তো কম কৃতিত্বের নয়।

www.pathagar.com

যমের আরেক নাম শমন। রাবণ এই যম বা শমনকেও দমন করেছিল। আবার শমনকে হারানো রাবণকেই পরে রাম দমন করেন। রামের হাতে রাবণের কেবল পরাজয়ই না, মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ, কেউ-ই অজেয় নয়। সকলকেই পরাস্ত করার মতো বা দমন করার মতো কেউ না কেউ আছে। সেটা বোঝাতেই বলা হয়—শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।

সোনার লঙ্কা ছারখার (রাবণের পুরী ছারখার)
অর্থ : সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ ঐশ্বর্যবান স্থানের সহসা বিনাশ

রাবণ ছিল বিশ্রবা মুনি আর কৈকসী রাক্ষসীর বড় ছেলে। কৈকসী রাক্ষসীর বাবা সুমালী রাক্ষস ছিল রাক্ষসদের রাজা। এই সুমালীরা ছিল তিন ভাই—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। তারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়েছিল। আবার কিছু পুরাণে বলা হয়েছে, এই লঙ্কাপুরী বানিয়েছিল ময় নামের এক দানব।

অবশ্য এই লঙ্কাপুরী রাবণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়নি। তার পূর্বপুরুষ মাল্যবান-সুমালী-মালীও রাবণের মতোই অত্যাচারী ছিল। তাই বিষ্ণু এদের দমন করেন। বিষ্ণুর হাতে মালী মারা যায়। বাকি দুই ভাই মাল্যবান ও সুমালী বাকি রাক্ষসদের নিয়ে পাতালে পালিয়ে যায়। বিষ্ণু কুবেরকে লঙ্কাপুরীতে থাকতে দেন। পরে রাবণ এই কুবেরের কাছ থেকেই আবার লঙ্কাপুরী দখল করে নেয়।

রাবণের সময়ে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যের আরো খোলতাই হয়। তার সময়ে লঙ্কাপুরীর ভেতরের ঐশ্বর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অতুলনীয়। তখন লঙ্কায় সোনার কোনো অভাবই ছিল না। এমনকি সে সময় পৃথিবীতে যত রকমের মদিরা পাওয়া যেত, তার সবই ছিল রাবণের পানশালাতে। তখন এমনকি ওখানকার রাক্ষসদের সাংস্কৃতিক রুচিও ছিল অসাধারণ। রাবণের কেবল পানশালাই ছিল না, বিশাল ফুলের বাগান আর ছবির গ্যালারিও (চিত্রশালা) ছিল।

শেষ পর্যন্ত রামের হাতে রাবণের পতন ঘটে। সে যুদ্ধে কেবল রাবণেরই না, পতন ঘটে রাবণের গোটা রাজ্যেরই। বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী রাক্ষসদের ঐশ্বর্যেরও শেষ হয়। যুদ্ধে তাদের প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে বিপুল ঐশ্বর্যশালী রাবণের অনুসারীরা মাত্র একটা যুদ্ধেই তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

সে যুদ্ধে রাবণ ও তার অনুসারী রাক্ষসদের সাথে সাথে পতন ঘটে লঙ্কাপুরীরও। যুদ্ধ শুরুর আগেই, হনুমান তার লেজের আগুনে লঙ্কাপুরীর একটা অংশ পুড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সোনার লঙ্কাপুরীও ছারখার হয়ে যায়। যাওয়ার সময় অবশ্য রাম লঙ্কার রাজা করে যান ধার্মিক বিভীষণকে।

এভাবে কোনো সুখী-সমৃদ্ধ স্থান বা অঞ্চল তার সমৃদ্ধি হারালে, বা কোনো সমৃদ্ধ অঞ্চল বা শহরের পতন ঘটলে, কিংবা কোনো প্রভাবশালী বাড়ি, তথা বংশের পতন ঘটলে, তখন বলা হয়—সোনার লঙ্কা/রাবণের পুরী ছারখার হয়ে গেল।

লঙ্কায় সোনা সস্তা

অর্থ : সমৃদ্ধিশালী কিন্তু অতি দূরবর্তী নগরী বোঝাতে ব্যবহার

রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী ছিল ভয়ঙ্কর সুন্দর। চারপাশে সাগর, মাঝে ত্রিকূট পর্বতের উপরে তার অবস্থান। দৈর্ঘ্যে বিশ যোজন, প্রস্থে দশ। চারপাশে স্বর্ণপ্রাচীর। সে প্রাচীরে আরো সুরক্ষার জন্য বসানো আছে ঈষু-উপলযন্ত্রাণি ও শতঘ্নী অস্ত্র। তার পরে কুমিরে ভর্তি প্রশস্ত পরিখা। সে পরিখার উপরে যন্ত্রচালিত সেতু (সংক্রম সেতু)। সেতুর শেষ মাথায় সোনার দরজা।

শুধু শহরের মূল ফটকই সোনার ছিল, তাই না। এই লঙ্কাপুরীতে সোনার কোনো অভাবই ছিল না। অবশ্য ওখানে যাওয়াটা খুব একটা সহজ ছিল না। সাগরে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে তবেই লঙ্কাপুরীতে যাওয়া যেত। ধারণা করা হয়, এখনকার শ্রীলঙ্কা বা সিংহলেই ছিল সেই লঙ্কাপুরী। আবার ভিন্ন মতও আছে। তাদের মতে লঙ্কা ও সিংহল এক নয়। সে মতের অনুসারীদের একটা পক্ষের দাবি, লঙ্কাপুরী ছিল তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ অংশে অবস্থিত মহেন্দ্রগিরি। এই পর্বতমালার দক্ষিণ প্রান্তের একটি পর্বত হলো মলয় পর্বত। এরই দক্ষিণে ছিল লঙ্কা। আরেক পক্ষের দাবি, লঙ্কাপুরী যে ত্রিকূট পর্বতের উপরে অবস্থিত ছিল, সেটি এখন আর নেই, সাগরে ডুবে গেছে।

এই তিন অবস্থানের যেখানেই লঙ্কাপুরীর অবস্থান হোক না কেন, কোনোটাই যাওয়ার জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। আর তাই সেখানে সোনা সস্তা হলেও, আর সব অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রের দামও কম হলেও, সেখানে যাওয়া-আসা করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। ফলে

www.pathagar.com

ওখান থেকে ওসব মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করা সবার পক্ষে সম্ভব হতো না।

যদি এমন কোনো জায়গার প্রসঙ্গ আসে, যে জায়গা ভীষণ সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু জায়গাটা অনেক দূরে, সেখানে যাওয়াটা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব, তেমন অর্থ বোঝাতেই এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা
অর্থ : কৃষিকাজ করা যে ভীষণ লাভজনক, সেটা বোঝাতে ব্যবহার

লঙ্কা ছিল রাবণের রাজধানী। এই নগরীর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল কিংবদন্তিতুল্য। আর রাবণ কুবেরের কাছ থেকে লঙ্কাপুরী দখল করে নেয়ার পরে লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যের আরো খোলতাই হয়। তার সময়ে লঙ্কাপুরীর ভেতরের ঐশ্বর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অতুলনীয়। সেখানে সোনার তো কোনো অভাবই ছিল না। আর তাই আগে যারা লঙ্কায় বাণিজ্য করতে যেত, তারা প্রচুর লাভবান হতো। সোনা-রূপার প্রাচুর্যের কারণে, অল্প কিছু জিনিসের বিনিময়েই সেখানে সোনা-রূপা-হীরা মিলত। সেগুলো আবার অন্যত্র অনেক দামে বিক্রি বা বিনিময় করা যেত।

অবশ্য তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে কৃষিকাজকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। বাংলায় তো আরো বেশি। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটু বাঁকা চোখেই দেখা হতো। তাই লঙ্কার অমন লাভজনক ব্যবসার চেয়েও কৃষিকাজ করাকেই ভালো বলে মেনে নেয়া হতো। সে কথা বোঝাতেই এই প্রবাদটির উৎপত্তি—লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা। মানে, ক্ষেতের এক কোনা থেকেই লঙ্কায় বাণিজ্য করার সমান লাভ পাওয়া সম্ভব।

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা
অর্থ : মূর্খতাবশত সুযোগ কাজে না লাগানো

লঙ্কা ছিল রাবণের রাজধানী। এই নগরীর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল কিংবদন্তিতুল্য। সেখানে সোনার তো অভাবই ছিল না। এই লঙ্কা নগরী নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আগে যারা লঙ্কায় বাণিজ্য করতে যেত, তারা প্রচুর লাভবান হতো। কারণ ওখানে সোনা, হীরার মতো বহুমূল্য সব জিনিস পাওয়া যেত খুবই কম দামে। কিন্তু সেখানে যাওয়াটাই ছিল সবচেয়ে ঝামেলার আর

www.pathagar.com

খরচের ব্যাপার। সেই লঙ্কায় একবার এক দরিদ্র মহিলার যাওয়ার সুযোগ হলো। সে সেখানে গিয়ে, সোনা-হীরা সব বাদ দিয়ে, নিয়ে এল হরিদ্রা, মানে হলুদ।

এমন মূর্খের মতো কাজ করার ফলে তার ভাগ্য পরিবর্তনের অমন সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া হলো। কেবল বিচার-বুদ্ধির অভাবেই তার আর কপাল ফেরানো হলো না। সে রকম, যখন কেউ অমন সুবর্ণ সুযোগ মূর্খতাবশত হাতছাড়া করে, তখন তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা।

সাত খণ্ড (সারা রাত) রামায়ণ পড়ে, বলে সীতা কার বাপ/ভাই?

অর্থ : সমস্ত ব্যাপার জেনেও না জানার ভান করা, সমস্ত ঘটনা জেনেও বুঝতে না পারা

রামায়ণ গ্রন্থটি ৭ খণ্ডে বা কাণ্ডে বিভক্ত—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। মোট শ্লোকের সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশি। এটা মূলত অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের কাহিনি। রামের কাহিনি বলেই এর নাম রামায়ণ। সীতা তারই স্ত্রী।

রামায়ণের মূল চরিত্র রাম হলেও, সীতা একদমই কম গুরুত্বপূর্ণ নন। রামায়ণের মূল কাহিনি, মানে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছে সীতাকে নিয়েই। বোনের নাক কাটার বদলা নিতে রাবণ সীতাকে তুলে নিয়ে যায়। তখন রাম ভাই লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে নিয়ে সীতাকে উদ্ধারের অভিযানে নামেন। এই সীতাকে উদ্ধার করা নিয়েই রামায়ণের মূল ঘটনা—রাম-রাবণের যুদ্ধ। আর শেষ খণ্ডে এসে, উত্তরকাণ্ডের কাহিনিতে সীতাই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তার সতীত্বের প্রমাণ দেয়ার ঘটনাগুলোকে ঘিরেই এই খণ্ডের কাহিনি এগিয়েছে।

এখন সমস্ত রামায়ণ পড়ে, শেষে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সীতা কার বাপ/ভাই, তাহলে বুঝতে হবে, হয় সে মনোযোগ দিয়ে রামায়ণ পড়েনি, অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করছে। আর তাই কেউ যখন অন্য ব্যাপারেও এমনটা করে, কোনো ব্যাপারের বা ঘটনার সমস্তটা জেনেও না জানার ভান করে, কিংবা সমস্তটা জেনেও ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না, তখন বলা হয়, সাত খণ্ড (সারা রাত) রামায়ণ পড়ে, বলে সীতা কার বাপ/ভাই।

www.pathagar.com

অগ্নিপরীক্ষা
অর্থ : কঠিন পরীক্ষা

লঙ্কায় রাম-রাবণের সেই ভীষণ যুদ্ধে জিতলেন রাম। তারপর সীতাকে উদ্ধার করে নিজ রাজ্যে নিয়েও আসলেন। কিন্তু তখন আবার কানাঘুষা শুরু হলো, সীতা কি আর সতী আছেন? রাবণ তুলে নিয়ে গিয়ে এতদিন আটকে রাখল, সে কী এমনি এমনি?

সত্যি সত্যি কিন্তু সীতা সতীত্ব হারাননি। কিন্তু রাজার বৌ বলে কথা। তার নামে লোকনিন্দা থাকলে তো চলে না। আর তাছাড়া রামেরও কেমন সন্দেহ হতে লাগল—সত্যিই তো! সীতা কি সতী আছে?

তখন সীতা অভিমান ভরে লক্ষ্মণকে বললেন চিতা প্রস্তুত করতে। চিতা প্রস্তুত হলো। জ্বালানো হলো। চিতায় প্রবেশের আগে সীতা বললেন, তিনি যদি সত্যিই সতী হন, তিনি যদি রামের প্রতি একনিষ্ঠ হন, তাহলে স্বয়ং অগ্নিদেব তাকে রক্ষা করবেন।

তারপর সীতা আগুনে প্রবেশ করলেন। সীতার কিছুই হলো না। আগুনের যে দেবতা, অগ্নিদেব, তিনি নিজে সীতাকে নিয়ে চিতা থেকে উঠে এলেন। সীতাকে রামের হাতে তুলে দিলেন।

এমনি কঠিন আর ভয়ঙ্কর 'অগ্নিপরীক্ষা' দিয়ে সীতা তার সতীত্বের পরিচয় দেন। সেখান থেকেই, কোনো কঠিন কাজ বা পরীক্ষাকে 'অগ্নিপরীক্ষা' বলা হয়।

ধরণী দ্বিধা হও
অর্থ : অত্যন্ত হতাশ বা বিরক্ত বা লজ্জিত হওয়া

অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতা তার সতীত্বের প্রমাণ দিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদের সন্দেহ ঘুচলো না। তারা সীতাকে নিয়ে নানা কথা বলতেই থাকলো। এরই মধ্যে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। প্রজাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। রাজ্যের প্রজাদের এই গুঞ্জনের কথা রাজা রামের কানেও গেল। তিনি প্রজাদের অপবাদের হাত থেকে বাঁচতে, প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে, সীতা সতী জেনেও, তাকে ত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণকে বললেন, সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রেখে আসার জন্য। লক্ষ্মণ রাজি না থাকলেও, বড় ভাইয়ের আদেশ বলে কথা। তাকে সে আদেশ পালন করতেই হলো। তিনি অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে তমসা নদীর তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসলেন।

www.pathagar.com

বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে সীতা রামের সন্তান প্রসব করলেন। যমজ সন্তান—লব আর কুশ। ওরা স্বয়ং বাল্মীকির কাছে পড়াশুনা করতে লাগল। এরই মধ্যে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ শুরু করলেন। সেখানে বাল্মীকিরও ডাক পড়ল। তিনি লব-কুশকেও সাথে করে নিয়ে এলেন। যজ্ঞে এসে ওরাও রামায়ণ গাইল। ওদের রামায়ণ গান শুনে রাম রীতিমতো মুগ্ধ হলেন। গানের গলা, চেহারা-সুরত আকার-আকৃতি দেখে শেষে বুঝতে পারলেন, ওরা তারই সন্তান।

এবার রামই বাল্মীকির কাছে খবর পাঠালেন—সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তবে যেন তিনি বাল্মীকির অনুমতি নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন, এবং রাজসভায় এসে সকলের সামনে শপথ করেন। পরদিন রাজসভায় বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে এলেন। বাল্মীকি সবার কাছে সীতার চরিত্রের নিষ্কলুষতার কথা ঘোষণা করলেন। রামও বাল্মীকির কাছে স্বীকার করলেন, তিনি সীতার নিষ্কলুষ চরিত্রের কথা জানেন। কেবল লোকের অপবাদের ভয়েই তিনি সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। এজন্য তিনি বাল্মীকির কাছে ক্ষমাও চাইলেন।

এরপর সীতার সর্বসমক্ষে শপথের পালা। সীতা সবার সামনে এসে, মাটির দিকে তাকিয়ে মা বসুমতীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি সতী হই, এবং রাম ভিন্ন অন্য কাউকে মনে-চিন্তায় স্থান না দিয়ে থাকি, কায়মনোবাক্যে সব সময় রামকেই অর্চনা করে থাকি, তাহলে যেন ধরণী দ্বিধা হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন।

আর তারপরই ঘটল এক অসম্ভব ঘটনা। তার পায়ের নিচের মাটি দুভাগ হয়ে গেল। পাতাল থেকে উঠে এলেন মা বসুমতী, তার আশ্চর্য সুন্দর রথে চেপে। মা বসুমতীর সেই রথ সাপেরা বহন করে। সেই রথের উপরে, একটা সিংহাসনে চেপে এলেন তিনি। সেখান থেকে নেমে সীতাকে দুই হাতে ধরে তুললেন। সীতাকে সাথে নিয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। তারপর সেই আশ্চর্য সুন্দর রথে চেপে চলে গেলেন পাতালে।

এই পৌরাণিক আখ্যান থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি। পরে দীনবন্ধু মিত্র তার বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'-এ বাগধারাটি ব্যবহার করলে এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। কেউ যখন কোনো কিছু নিয়ে ভীষণ হতাশ বা বিরক্ত বা লজ্জিত হয়, তখনই বাগধারাটি ব্যবহার করে—'ধরণী তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি'।

সীতাদুঃখ
অর্থ : ভীষণ দুঃখ

সীতা ছিলেন মিথিলার রাজা জনক সীরধ্বজের মেয়ে। তিনি সীতার বিয়ে দেন রামের সঙ্গে। রাম ছিলেন রাজা দশরথের ছেলে। রাম-সীতার বিয়ের পর দশরথ

www.pathagar.com

ঠিক করেন, রামকে সিংহাসনে বসাবেন। আর তখন থেকেই সীতার জীবনে দুঃখের শুরু হয়। রামের যেদিন সিংহাসনে বসার কথা, তার আগের দিন তাকে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যেতে হয়। সঙ্গে যান সীতাও। কোথায় তার পরদিন রানি হওয়ার কথা, তা না, তিনি স্বামীর সঙ্গে বনবাসে চললেন দণ্ডকারণ্যে।

বনবাসে থাকাকালে, শূর্পণখা তার স্বামী রামকে দেখে তার প্রেমে পড়ল। রাম তো তাকে ফিরিয়ে দিলেনই, দেবর লক্ষ্মণও তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন রেগে গিয়ে শূর্পণখা তাকেই গিলে খেতে উদ্যত হলো। তখন রাম তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণকে বললেন, শূর্পণখার নাক কেটে দিতে।

সে যাত্রা শূর্পণখার খাবার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও, শূর্পণখার ভাইয়ের হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পেলেন না সীতা। নাক কাটার বদলা নিতে শূর্পণখার ভাই রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। আর তাই নিয়ে রাম-রাবণের মধ্যে লেগে গেল ভয়ানক যুদ্ধ।

শেষে অবশ্য রামই জিতলেন। তারপর সীতাকে নিয়ে ফিরে গেলেন অযোধ্যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরও সীতার দুঃখ ঘুচল না। রাজ্যের সব প্রজারা ফিসফাস শুরু করল, সীতা কি আর সতী আছেন? প্রজাদের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস দানা বাঁধল রামের মনেও। শেষে অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে সীতা প্রমাণ করলেন, তিনি সতী।

তবুও তার দুঃখের শেষ হলো না। কিছুদিন পর জানা গেল, সীতা মা হতে চলেছেন। এবার আবার প্রজারা সন্দেহের আঙুল তুলল। অপবাদের ভয়ে রামও প্রজাদের পক্ষ নিলেন। সীতাকে সতী জেনেও তাকে ত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণকে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন বাল্মীকির আশ্রমে।

পরে অবশ্য দুই সন্তান লব আর কুশকে দেখে রাম চিনতে পারলেন। তখন আবার ডেকে পাঠালেন সীতাকে। সে ডেকে পাঠানোটাও ভীষণ দুঃখের। রাম শর্ত দিয়ে দিলেন, সীতা যদি নিষ্পাপ হন, তবে যেন তিনি বাল্মীকির অনুমতি নিয়ে আত্মশুদ্ধি করেন, এবং রাজসভায় এসে সকলের সামনে শপথ করেন। এটাও অবশ্য তিনি লোকোপবাদের ভয়েই করেছিলেন। তিনি ঠিকই জানতেন, সীতার চরিত্রে কোনো দোষ নেই। তার প্রতি সীতার ভালোবাসাতেও কোনো খাদ নেই।

পরদিন সীতা রাজসভায় এলেন। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে মা বসুমতীর উদ্দেশ্যে শপথ করলেন। আর মা বসুমতীও সে শপথে সাড়া দিয়ে, মাটি ভেদ করে এসে, তাকে নিয়ে পাতালে চলে গেলেন।

এমনিভাবে সীতা জীবনে অনন্ত দুঃখ ভোগ করেছেন। সতী নারী হয়েও স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর তাই কোনো নারী যখন ভীষণ

www.pathagar.com

দুঃখ ভোগ করে, তার দুঃখের কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না, তখন তার দুঃখকে বলা হয় সীতাদুঃখ।

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ
অর্থ : অভাগী যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই দুঃখ ভোগ করে

সীতার বাবা মিথিলার রাজা জনক সীরধ্বজ তার বিয়ে দেন রামের সঙ্গে। রাম-সীতার বিয়ের পর, রামের বাবা অযোধ্যার রাজা দশরথ ঠিক করলেন, রামকে সিংহাসনে বসাবেন। রামের যেদিন সিংহাসনে বসার কথা, তার আগের দিন তাকে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে দণ্ডকারণ্যে যেতে হলো। সঙ্গে গেলেন সীতাও। কোথায় তার পরদিন রানি হওয়ার কথা, তা না, তিনি স্বামীর সঙ্গে বনবাসে চললেন।

আর তখন থেকেই সীতার জীবনে দুঃখের শুরু। সেই যে দুঃখের শুরু হলো, তার আর শেষ নেই। সীতা যতদিন বেঁচে ছিলেন, দুঃখ তাকে তাড়া করে ফিরেছে। জীবনে কখনোই তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেননি। মন ভরে স্বামীর ঘর করতে পারেননি। অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণ করেছেন। তবু তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল। তার ছেলেরা রাজপুত্র হলেও, তাদের লালন-পালন করতে হয় বাল্মীকির আশ্রমে। শেষে মা বসুমতী তাকে নিয়ে পাতালে চলে গেলে, মানে তার পৃথিবীর জীবনের শেষ হলে, তবেই তার দুঃখের শেষ হয়।

মানে, সীতা যতদিন বেঁচে ছিলেন, দুঃখ ভোগ করেছেন। অনেক মেয়েও জন্মায় তেমন কপাল নিয়ে। তাদের সারাটা জীবনই কাটে দুঃখে-কষ্টে-ক্লেশে। তাদের জন্মই যেন দুঃখ ভোগ করার জন্য। মৃত্যু ছাড়া তাদের দুঃখ ঘোচার কোনো রাস্তা নেই। অমন অভাগীদের উদ্দেশ্য করেই বলা হয়, যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

সীতা সতী
অর্থ : অত্যন্ত পতিপ্রাণা, ভীষণ সতী নারী

রামের স্ত্রী সীতা ছিলেন ভীষণ সতী। রাম তাকে অশেষ কষ্ট দিয়েছিলেন, কিন্তু সীতা কখনোই রামের প্রতি রুষ্ট হননি। এমনকি কখনো রামের প্রতি কোনো বিরক্তি বা অসন্তোষও প্রকাশ করেননি। বরং তিনি সর্বদাই ছিলেন ভীষণ পতিপ্রাণা। স্বামী রামের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অটুট।

www.pathagar.com

অন্যদিকে শিবের স্ত্রী সতীও ছিলেন তেমনি। একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে এক বিশাল যজ্ঞ। সকল দেব-দেবী সে যজ্ঞে যোগ দিতে আসলেন। আসলেন দক্ষও। এই দক্ষ ছিলেন বিখ্যাত দশ ঋষিদের একজন। এই দশ ঋষিকে বলা হয় 'প্রজাপতি'। তারা সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাদের থেকেই মানবের সৃষ্টি। ব্রহ্মার বুড়ো আঙুল থেকে জন্ম বলে, এই প্রজাপতির নাম দক্ষ। দক্ষ তার সবচেয়ে ছোট মেয়ে, সতীর বিয়ে দিয়েছিলেন মহাদেব, মানে শিবের সাথে।

তো ওই যজ্ঞে দক্ষ এলেন। তাকে আসতে দেখে সব দেবতারাই উঠে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না শিব আর ব্রহ্মা। তাতে দক্ষ ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। রেগে গিয়ে শিবকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। তারপর অভিশাপ দিলেন, ইন্দ্রসহ বিভিন্ন দেবতারা যজ্ঞের যে ফল ভোগ করে, শিব তা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর কিছুদিন পরে, কোনো এক কারণে দক্ষের উপর খুশি হয়ে ব্রহ্মা তাকে সকল প্রজাপতিদের উপর আধিপত্য করার অধিকার দেন। খুশির খবর। কাজেই দক্ষ এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞের নাম বৃহস্পতি যজ্ঞ। সে যজ্ঞে দক্ষ ত্রিলোকের সকলকে দাওয়াত দিলেন। কেবল দাওয়াত দিলেন না শিব-সতীকে।

সতী তো যজ্ঞের কথা শুনেই আসার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। দাওয়াত না করুক, বাবার আয়োজন বলে কথা। কিন্তু শিব তো দাওয়াত ছাড়া কোনোভাবেই সে যজ্ঞে যাবেন না। স্ত্রীকেও যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। শেষে সতী দশ মূর্তি ধারণ করলেন—কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী। দশ রূপে শিবকে বিভ্রান্ত করে তার অনুমতি আদায় করে নিলেন। তারপর গেলেন সে যজ্ঞে।

মেয়েকে দেখে, মেয়ের সামনেই দক্ষ তার মেয়ে-জামাইকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। হোক বাবা বলছেন, তবু স্বামীর নিন্দা বেশিক্ষণ সইতে পারলেন না সতী। স্বামীর নিন্দা শোনার চেয়ে মরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন তিনি। ওই যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করলেন সতী।

পরে অবশ্য সতীর পুনর্জন্ম হয়। তিনি হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেও তিনি তার স্বামীকে ভোলেননি। শিবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সফলকামও হন তিনি। শিবের সঙ্গে তার ঠিকই মিলন হয়।

এই সীতা ও সতী, দুজনেই ছিলেন যাকে বলে পতি-অন্তঃপ্রাণ। স্বামীর জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু স্বামীর নিন্দা-কুৎসা সহ্য করেননি। এ রকম পতিপ্রাণা নারীদের সম্পর্কেই বলা হয়—সীতা সতী।

www.pathagar.com

রামরাজত্ব

অর্থ : যা খুশি করবার একচেটিয়া অধিকার

লঙ্কাযুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত করে, বনবাসের মেয়াদ শেষ করে, অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম সেখানে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ শাসক। তার প্রজাহিতৈষণার তুলনা হয় না। প্রজাদের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গায় তার কোনো কমতি ছিল না। এমনকি প্রজা সন্তুষ্টির জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেও উৎসর্গ করেছিলেন।

রাবণের সাথে রামের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় শূর্পণখার নাক কাটার প্রতিশোধ নিতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলে। পরে যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত করে রাম-লক্ষ্মণ ঠিকই সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। কিন্তু রামের রাজা হয়ে বসার পর থেকেই অযোধ্যার প্রজারা গুঞ্জন তোলে, লঙ্কাপুরীতে গিয়ে সীতা এতদিন ছিলেন, তিনি কি আর সতী আছেন! রামও প্রজাদের সুরে সুর মেলালেন। তখন সীতা অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করলেন, তিনি সতী।

কিন্তু তারপরও প্রজাদের সন্দেহ ঘুচলো না। তারা সীতাকে নিয়ে নানা কুৎসা রটনা করতে থাকলো। এরই মধ্যে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। রাম এসব দেখেও প্রজাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। উল্টো প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে, সীতা সতী জেনেও, তাকে ত্যাগ করলেন। তার আদেশে লক্ষ্মণ অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে তমসা নদীর তীরবর্তী বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসলেন।

এভাবে, রামের রাজত্বকালে প্রজারা এতটাই স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, যেমনটা এখনকার যুগেও চিন্তা করা যায় না। সেই যুগেও অযোধ্যার প্রজারা এমনকি রাজা রামের স্ত্রী, তথা রানি সীতাকে নিয়ে কটু কথা বলেও, বিন্দুমাত্র শাস্তির মুখোমুখি হয়নি। উল্টো বরং রাজা রাম প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে, তার নিরপরাধ স্ত্রীকেই ত্যাগ করেন। আর তাই কোথাও যদি সবাই এমন যা-ইচ্ছা-তাই করার স্বাধীনতা ভোগ করে, সবার অধিকার থাকে একচেটিয়া যা খুশি করার, তখন ব্যঙ্গ করে বলা হয়—যেন 'রামরাজত্ব' চলছে।

রামরাজ্য

অর্থ : সুখী দেশ, স্বর্গরাজ্য, ন্যায়-সুখ-শান্তিপূর্ণ রাজ্য

রাম ছিলেন সূর্যবংশের রাজা। তাদের রাজ্য ছিল অযোধ্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথ তার বাবা। রাম ছিলেন দশরথের বড় ছেলে। শুধু তাই না, তার

www.pathagar.com

ছেলেদের মধ্যে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে শৌর্যে-বীর্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই দশরথ তার উত্তরাধিকারী হিসেবে রামকেই মনোনীত করেন।

কিন্তু তখনই তার রাজা হওয়া হয়নি। উল্টো রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে তাকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। অবশ্য কৈকেয়ী যে জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা পূরণ হয়নি। তার ছেলে ভরত উল্টো রামকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। কিন্তু রাম পিতৃসত্য পালনকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মেনে নেন। তখন ভরত রামের এক জোড়া পাদুকা বা জুতা সিংহাসনে রেখে, রামের প্রতিনিধি হয়ে অযোধ্যা শাসন করতে থাকেন। পরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, লঙ্কা যুদ্ধে জিতে, চোদ্দ বছর পর রাম তার ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তারপর ভরত রাজ্যভার রামের হাতে ন্যস্ত করলে, রামের রাজত্ব শুরু হয়। তিনি অযোধ্যা ও অযোধ্যার প্রজাদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

রাজা রামের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক ছিল, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। ছিলেন ভীষণ প্রজাহিতৈষী। এমনকি প্রজাদের চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হননি। প্রজাদের সন্দেহের কারণে তিনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তার সতী স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। তার নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর। সব মিলিয়ে তার ন্যায়বিচার ও প্রজাহিতৈষিতার কারণে তার শাসনামলে অযোধ্যা মর্ত্যের বুকে একখণ্ড স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল।

আর তাই কোনো সুখী-সমৃদ্ধ দেশের বর্ণনা দিতে হলে, বা আকাঙ্ক্ষিত সুখী-সমৃদ্ধ দেশের কথা বলতে গেলে, এই বাগধারাটি প্রয়োগ করা হয়।

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই

অর্থ : অতীতের সুখশান্তি লোপ পেয়েছে বোঝাতে

রাজা হিসেবে রাম ছিলেন ভীষণ সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। রাজা হিসেবে প্রজাদের ভালো-মন্দের প্রতি তার ছিল ভীষণ মনোযোগ। এমনকি প্রজাদের চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হননি। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তার নীতিজ্ঞানও ছিল প্রখর। সব মিলিয়ে তার ন্যায়বিচার ও প্রজাহিতৈষিতার ফলাফল হিসেবে, তার শাসনামলে অযোধ্যা হয়ে উঠেছিল এক আদর্শ রাজ্য।

www.pathagar.com

আর তাই কোথাও দুঃশাসন চললে, রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, কিংবা প্রজাদের ঠিকঠাক দেখভাল না করলে, আক্ষেপ করে বলা হয়, 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই'।

রাম বলেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলেন এক্ষণ/রামের ভাই লক্ষ্মণ
অর্থ : ভীষণ অনুগত ছোট ভাই/অনুজ

লক্ষ্মণ রামের ছোট ভাই। তাদের বাবা ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথ। রাজা দশরথের তিন স্ত্রীর চার ছেলে। রাম ছিলেন বড় বৌ কৌশল্যার ছেলে। আর ছোট বৌ সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে—লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন। এদের মধ্যে ছোট শত্রুঘ্ন ছিলেন ভরতের অনুরক্ত, আর লক্ষ্মণ রামের। তিনি রামের এতটাই অনুরক্ত ছিলেন, সকল কাজেই রামের সাথে সাথে যেতেন। সব সময় রামের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। রামের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এমনকি রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে গেলে, তিনিও সঙ্গে যান।

রাম-রাবণের যুদ্ধ হলে, সে যুদ্ধেও ভাইয়ের সঙ্গী ছিলেন লক্ষ্মণ। ভাইয়ের জন্য তিনি এমনকি অন্যায় কাজও করেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করতে থাকা অবস্থায় ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করেন তিনি। কারণ, সে যজ্ঞ শেষ করে ফেললে, ইন্দ্রজিৎকে আর কেউ যুদ্ধে হারাতে পারত না।

সীতা তার সতীত্বের শেষ পরীক্ষায়, মা বসুমতীর কাছে প্রার্থনা করেন, আমি যদি সতী হই, এবং রাম ভিন্ন অন্য কাউকে মনে-চিন্তায় স্থান না দিয়ে থাকি, কায়মনোবাক্যে সব সময় রামকেই অর্চনা করে থাকি, তাহলে যেন ধরণী দ্বিধা হয়ে আমাকে আশ্রয় দেন। আর মা বসুমতীও মাটি ফুঁড়ে এসে তাকে নিয়ে যান।

এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে রামের কাজ ফুরাল। তখন কালপুরুষ, মানে যমদূত এলেন তার কাছে। তবে ছদ্মবেশে। তিনি রামের সাথে কথা শুরুর আগে শর্ত জুড়ে দিলেন, তার কথা গোপনে শুনতে হবে। অন্য কেউ যদি তাদের কথা শোনে, বা এমনকি তাদেরকে একসাথে দেখেও, তাহলে রামের কর্তব্য হবে, তাকে হত্যা করা। তখন রাম লক্ষ্মণকে দায়িত্ব দিলেন, রাজদরবারের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে, যেন কেউ ঘরে ঢুকতে না পারে।

এরই মধ্যে চলে এলেন দুর্বাসা মুনি। তিনি রামের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু সেটা তো এখন সম্ভব নয়। কাজেই লক্ষ্মণ তাকে ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে, রাজদরবারের বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখলেন। দুর্বাসা মুনি ছিলেন

www.pathagar.com

আবার ভীষণ রগচটা। তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না দেখে তিনি রেগে গিয়ে সবাইকে-ই অভিশাপ দিতে শুরু করলেন।

অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়াল। তখন লক্ষ্মণ ভাবলেন, দুর্বাসা মুনির অভিশাপে সবার বিনাশের দরকার নেই। তারচেয়ে কেবল তারই বিনাশ হোক। এই ভেবে, তিনি ভেতরে গিয়ে রামকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। রামও দুর্বাসা মুনির সঙ্গে দেখা করলেন। দুর্বাসা মুনিও শান্ত হলেন।

এবার রাম নিজেই পড়লেন বিপদে। কালপুরুষ, মানে যমদূতকে দেয়া কথা রাখতে হলে, লক্ষ্মণকে হত্যা করতে হবে। আবার ভাইকে বাঁচিয়ে রাখলে কথার বরখেলাপ করা হয়।

লক্ষ্মণ কিন্তু ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা পালনের উপরই বেশি জোর দিলেন। নিজেই এসে বললেন, আপনি আপনার পূর্ব-প্রতিজ্ঞা পালন করুন। এ নিয়ে আপনার সন্তপ্ত হওয়ার বা অনুশোচনা করার কিছু নেই। কিন্তু রাম কি তার প্রিয় ছোট ভাইকে হত্যা করতে পারেন! জীবনের এতটা পথ যে লক্ষ্মণ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে আসছেন, তাকে তিনি কীভাবে নিজ হাতে হত্যা করবেন!

শেষে বশিষ্ঠ মুনিরা এসে রামকে উপদেশ দিলেন, এই ক্ষেত্রে বর্জন আর মৃত্যুদণ্ড সমান গণ্য হবে। তখন রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। লক্ষ্মণও অযোধ্যা ত্যাগ করে, সরযূ নদীর তীরে এসে, আত্মবিসর্জন দেয়ার চেষ্টায় যোগমগ্ন হলেন। পরে স্বয়ং ইন্দ্র এসে তাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান।

প্রিয় ভাইকে বর্জনের দুঃখ রামও বেশিদিন সইতে পারেননি। শেষে তিনি তার দুই ছেলেকে রাজত্ব ভাগ করে দিলেন। অযোধ্যাকে দুই ভাগ করে কুশকে করলেন কোশলের রাজা, আর লবকে উত্তর কোশলের রাজা। তারপর তিনিও সরযূ নদীর তীরে এসে যোগমগ্ন হলেন। সেখানেই যোগমগ্ন অবস্থাতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছোট ভাই লক্ষ্মণ বড় ভাই রামের অনুসারী ও অনুগামী ছিলেন। ছিলেন একান্ত অনুগত। রাম যখন যা নির্দেশ দিয়েছেন, লক্ষ্মণ নিজের সর্বস্ব দিয়ে হলেও তা পালন করেছেন। এমনকি রামের কথা রাখতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাই কারও অনুগত বা অনুজ যদি এমন হয়, কোনো আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে, তখন তাদের দুজনের সম্পর্ক বোঝাতে বলা হয়—রাম বলেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলেন এক্ষণ।

www.pathagar.com

আর যদি কারও ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের এমন অনুগত হয়, বড় ভাই যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে পালন করে, তখন তাকে বলা হয়—রামের ভাই লক্ষ্মণ। অবশ্য এই বাগধারাটি মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করেও ব্যবহার করা হয়। ছোট ভাই যদি বড় ভাইয়ের বিরোধী হয়, বড় ভাইয়ের সঙ্গে তার শত্রুতার সম্পর্ক হয়, তখন সেই ছোট ভাইকে ব্যঙ্গ করে বলা হয়—রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

www.pathagar.com

মহাভারত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে/ভূ-ভারতে (ভারত ছাড়া কথা নাই)
অর্থ : মহাভারতে দুনিয়ার সকল বিষয়ের তত্ত্বকথা আছে

ভারতীয় পুরাণের অন্যতম আকর গ্রন্থ মহাভারত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাকাব্য এটি। মহাভারতের মোট শ্লোকের সংখ্যা কম-বেশি এক লাখ। এই এক লাখ শ্লোকে প্রধানত কুরুবংশের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনায় মূলত উঠে এসেছে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কাহিনি। এই মহাভারতের রচনাকাল নিয়ে অবশ্য খানিকটা মতভেদ আছে। আগে বলা হতো, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার অব্দের কিছুটা আগে। তবে মহাভারতের সবচেয়ে পুরনো যে পুঁথি পাওয়া গেছে, ধারণা করা হয়, সেটা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। সেখান থেকে অনেকের ধারণা, মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী সময়ের রচনা। অনেকে আবার এই সময়কালটাকে আরেকটু পিছিয়ে নিয়ে বলে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-নবম শতকের রচনা।

এই মহাকাব্যটি মোট ১৮টি পর্বে বিভক্ত—আদিপর্ব, সভাপর্ব, জনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদযোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, স্ত্রীপর্ব, শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব, অশ্বমেধিকপর্ব, আশ্রমবাসিকপর্ব, মৌষলপর্ব, মহাপ্রস্থানপর্ব এবং স্বর্গারোহণপর্ব। এই পর্বগুলোর আবার মোট একশটি পর্বাধ্যায় আছে।

মহাভারত রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তার বাবা পরাশর মুনি। আর মা মৎস্যগন্ধা। পরে অবশ্য মৎস্যগন্ধার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। প্রথমে জেলেরা তাকে দাসরাজা বসুর হাতে তুলে দেয়। বসু তাকে পালক মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেন। তার নতুন নাম হয় সত্যবতী। পরে, রাজা শান্তনু তাকে বিয়ে করেন। তারই দুই ছেলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। এই বিচিত্রবীর্যের দুই ক্ষেত্রজ সন্তান ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। তাদের মা বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী

www.pathagar.com

অম্বিকা (ধৃতরাষ্ট্র) ও অম্বালিকা (পাণ্ডু) হলেও, বাবা আবার এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

ব্যাসের জন্মের সময় অবশ্য মৎস্যগন্ধা খেয়ানৌকা পারাপারের কাজ করতেন। একদিন তার নৌকায় উঠলেন পরাশর মুনি। মুনি হলে কী হবে, মৎস্যগন্ধাকে দেখে কিন্তু তার মনে কামবাসনা জেগে উঠল। তিনি মৎস্যগন্ধাকে মিলনের প্রস্তাব দিলেন। মৎস্যগন্ধাও অমন একজন মুনির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না। কিন্তু অমন নদীর মাঝে খোলা নৌকায় তো তা সম্ভব নয়। তখন পরাশর মুনি মায়াবলে নৌকার চারপাশে কুজঝটিকা সৃষ্টি করলেন। সেটার আড়ালে, নদীর বুকে খোলা নৌকায় মিলিত হলেন পরাশর মুনি ও মৎস্যগন্ধা। আর সে মিলনেরই ফলে জন্ম হলো ব্যাসের। যমুনার এক দ্বীপে তার জন্ম দিলেন মা মৎস্যগন্ধা। দ্বীপে জন্ম বলে, তার নাম হলো দ্বৈপায়ন। আর তার গায়ের রং ছিল ঘোরতর কালো। এই গায়ের রঙের জন্য তার নাম হলো কৃষ্ণ। দুইয়ে মিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

পরে এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মা সত্যবতীর আদেশে তপস্যায় বসলেন। তখনো পর্যন্ত বেদের মন্ত্রগুলো মুখে মুখে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। তিনি সেগুলোকে একত্রিত করে, চার ভাগে বিভক্ত করলেন। বেদকে বিভক্ত বা 'ব্যাস' করেছেন বলে, তার আরেক নাম হলো বেদব্যাস।

পরে এই বেদব্যাসের সাথে ব্রহ্মার আলাপ হয়। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন, তিনি এমন এক পবিত্র গ্রন্থ লিখবেন, যাতে পৃথিবীর সকল শাস্ত্র ও জ্ঞান থাকবে। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত পরম ব্রহ্মের কথাই বলা হবে। পরম ব্রহ্মই হবে বইটির মূল প্রতিপাদ্য। তার রচিত সেই গ্রন্থটিই মহাভারত।

এই মহাভারতে যা যা থাকবে বলে তিনি ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন, সেগুলো হলো—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ; বেদের নিগুঢ় তত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা; তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য; ইতিহাস, পুরাণ; বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের নিরূপণ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয়; আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়-শিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্র; পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও যুগপ্রমাণ; বিভিন্ন ধর্ম ও আশ্রমের লক্ষণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের পুরাণোক্ত আচারবিধি; দানধর্ম ও পাশুপতধর্ম; যারা দিব্য জন্মলাভ করেছেন এবং যারা মানবযোনিতে জন্মলাভ করেছেন, তাদের বিবরণ; পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী; দুর্গ নির্মাণ, সেনাব্যূহ-রচনা ইত্যাদির কৌশল প্রভৃতি।

অর্থাৎ, সে সময়ে যত ধরনের তত্ত্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানের চর্চা ছিল, তার সবগুলোকেই এই গ্রন্থে জায়গা করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। আর সে

www.pathagar.com

জন্যই বলা হয়, যা নেই ভারতে (মহাভারতে), তা নেই ভারতে (ভূ-ভারতে, মানে পৃথিবীতে)। এই একই অর্থে বলা হয়, ভারত ছাড়া কথা নাই।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

অর্থ : অবিচল প্রতিজ্ঞা, অটল প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

বসু দেবতারা আট ভাই। তারা আটজন অষ্টবসু নামে খ্যাত। এই আট বসুদেবতারা হলেন—ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস ও দ্যু। এরা মূলত ইন্দ্রের অনুচর। একবার এই আট বসু ঠিক করলেন, বশিষ্ঠ মুনির গরু চুরি করবেন। গরুটা আবার ছিল মুনির কামধেনু। নাম নন্দিনী। বুদ্ধিটা ছিল মূলত ছোট ভাই দ্যুর স্ত্রীর। তার প্ররোচনায় দ্যু-ই এই ফন্দি আঁটলেন। তারপর বাকি ভাইদেরও রাজি করালেন। চুরিটাও মূলত তিনিই করলেন।

বশিষ্ঠ মুনি যখন ব্যাপারটা টের পেলেন, ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। অভিশাপ দিলেন, যারা তার গরু চুরি করেছেন, শাস্তি হিসেবে তারা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মাবেন। এবার বসুরা পরলেন বিপদে। বশিষ্ঠ মুনি না জানুক, তাদেরকে তো এখন ঠিকই মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে। তখন তারা মুনির কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় শুরু করলেন। তাদের কাকুতি-মিনতি দেখে বশিষ্ঠ মুনিরও মায়া হলো। তিনি অভিশাপটা একটু সহজ করে দিলেন। জানালেন, তারা মানবজন্মের প্রথম বছরের মধ্যেই মুক্তি পাবেন। কিন্তু যে চুরিটা করেছে, তাকে দীর্ঘদিন মানবজীবন কাটিয়ে আসতে হবে।

এবার অষ্টবসু গঙ্গার শরণাপন্ন হলেন। তাকে অনুরোধ করলেন, তাদের উদ্ধার করতে। তাদের মানবজন্ম ও মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে। গঙ্গাও রাজি হলেন।

রাজা শান্তনু ছিলেন কুরুবংশের রাজা। গঙ্গা অষ্টবসুর মুক্তির জন্য এক অপূর্ব নারীমূর্তি ধারণ করলেন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন ওই কুরুরাজ শান্তনুর সামনে। গঙ্গাকে দেখে রাজা শান্তনুর ভীষণ ভালো লেগে গেল। তিনি গঙ্গাকে বিয়ে করতে চাইলেন। গঙ্গাও রাজি হলেন। শর্ত কেবল একটি—গঙ্গার কোনো কাজে শান্তনু বাধা দিতে পারবেন না। শান্তনুরও তাতেই সই। সে শর্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে, তিনি গঙ্গাকে বিয়ে করলেন।

এক-এক করে শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার সাতটি ছেলে হলো। প্রত্যেকবারই গঙ্গা জন্মের পরই তার ছেলেদের ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গার বুকে। শর্তে বাঁধা, তাই রাজা শান্তনুও কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু আট বারের বার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি। গঙ্গার কাছে অনুরোধ করলেন, এই ছেলেটা অন্তত বেঁচে থাক।

www.pathagar.com

গঙ্গা ছেলেটাকে মারলেন না। মারতেনও না। অষ্টবসুর সবচেয়ে ছোট দ্যু-ই আসলে এই ছেলে। বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে তাকে দীর্ঘদিন মানবজীবন কাটাতে হবে। তবে রাজা শান্তনু তার শর্ত ভঙ্গ করেছেন। কাজেই গঙ্গা ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেলেন। ছেলেটার নাম রাখা হলো দেবব্রত। যাওয়ার আগে অবশ্য শান্তনুর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে গেলেন গঙ্গা।

গঙ্গা দেবব্রতকে নিজের কাছে রেখেই বড় করতে লাগলেন। বশিষ্ঠ মুনিকে দিয়ে তাকে শেখালেন বিভিন্ন শাস্ত্র। অস্ত্রশিক্ষা করালেন পরশুরামের কাছ থেকে। এমনিভাবে কেটে গেল বত্রিশটা বছর।

বত্রিশ বছর পরে, একদিন রাজা শান্তনু শিকার করতে করতে গঙ্গাতীরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক ছেলে তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করছে। তার শিকার করার ভঙ্গি দেখেই রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যাকে বলে একেবারে রাজকীয় ভঙ্গি। দেখেশুনে তিনি অনুমান করলেন, এ নির্ঘাত তার সেই ছেলে, দেবব্রত। মনে মনে তিনি গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাও এসে হাজির হলেন। সেই অপরূপ সুন্দর মোহনীয় মূর্তিতে। ছেলেকে তুলে দিলেন শান্তনুর হাতে। ছেলেকে পেয়ে শান্তনুও ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন। পুত্র দেবব্রতকে নিজের রাজ্য হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়ে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করলেন।

চার বছর পরের কথা। রাজা শান্তনু একদিন যমুনার তীরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তার চোখ পরল দাসরাজার কন্যা সত্যবতীর প্রতি। দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজা শান্তনু। দাসরাজার কাছে বার্তা পাঠালেন, তার মেয়েকে বিয়ে করতে চান তিনি। দাসরাজাও অমত করলেন না। তবে শর্ত জুড়ে দিলেন। সত্যবতীকে বিয়ে করতে হলে, সত্যবতীর ছেলেকে রাজা বানাতে হবে।

রাজা শান্তনুর পক্ষে তো সে শর্ত মানা সম্ভব নয়। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী তার বড় ছেলে দেবব্রতই হবে তার রাজ্যের পরবর্তী রাজা। তার উপর তাকে তিনি যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্তও করেছেন। মুখ বেজার করে তিনি রাজ্যে ফেরত আসলেন।

বাবার বেজার মুখ দেখে দেবব্রত বুড়ো অমাত্যকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? তার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনে সোজা চলে গেলেন দাসরাজার কাছে। গিয়ে যখন শুনলেন, তার জন্যই পিতার বিয়ে আটকে আছে, দাসরাজার সামনেই তিনি করে বসলেন এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা—তিনি রাজা হবেন না।

তাতেও অবশ্য গোল মিটল না। দাসরাজা তখন আরো আপত্তি জুড়ে দিলেন; দেবব্রত না হয় রাজত্ব ছেড়ে দিলেন, কিন্তু তার ছেলেরা? তার ছেলেরা সিংহাসনের দাবি করলে, তখন গোল মেটাবে কে? দেবব্রত এবার আরো ভীষণ

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—তিনি কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মচারীরূপে সারা জীবন অপুত্রক থাকবেন, কোনো সন্তান-সন্ততি নেবেন না।

এবার আর দাসরাজার কন্যাদানে কোনো আপত্তি রইল না। দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে দেবতারা আর অপ্সরারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। দেবব্রতের নতুন নাম হলো ভীষ্ম। পরে ভীষ্মের বাবা রাজা শান্তনু যখন এসব ঘটনা শুনলেন, তিনি ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। আর রাজা শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হলো দাসরাজার মেয়ে সত্যবতীর।

সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই ছেলে হয়—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। পরে রাজা শান্তনু মারা গেলে, ভীষ্ম নিজে চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসালেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ বেশিদিন বাঁচল না। তার শেষকৃত্য করলেন ভীষ্ম নিজেই। তারপর সত্যবতীর আরেক ছেলে বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন।

বিচিত্রবীর্য অবশ্য তখনো অনেক ছোট। তখন সত্যবতীর পরামর্শ নিয়ে কার্যত ভীষ্মই রাজ্য চালাতেন। পরে বিচিত্রবীর্যের বয়স হলে, ভীষ্ম তার বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন। তাকে বিয়ে দিলেন কাশীরাজের মেয়েদের সাথে। কাশীরাজ তার তিন মেয়ে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিলেন। ভীষ্ম সেখানে উপস্থিত হয়ে, তার ভাইয়ের জন্য তিন বোনকে তুলে নিয়ে এলেন। তারপর বিচিত্রবীর্যের সাথে তাদের বিয়ের আয়োজন শুরু করলেন।

বিয়ের আয়োজন শুরু করতেই, বড় বোন অম্বা ভীষ্মকে জানালেন, তিনি ও শাল্বরাজ গোপনে দুজন দুজনকে বরণ করেছেন। ভীষ্ম ব্যাপারটা ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ, ভীষ্ম যে অম্বাকে অপহরণ করেছিলেন। এবার অম্বা তো আরো বিপদে পরে গেলেন। তার মনে হলো, তার এই বিপদের জন্য দায়ী একমাত্র ভীষ্ম। ভীষ্ম তাকে স্বয়ংবর সভা থেকে তুলে এনেছিলেন বলেই তো সব গোলমাল লেগে গেল। এখন সে জন্য ভীষ্মের শাস্তি হওয়া দরকার। সেই শাস্তি বিধানের জন্য তিনি গেলেন ভীষ্মের অস্ত্রবিদ্যার গুরু পরশুরামের কাছে।

পরশুরাম সব শুনে ভীষ্মকে খবর পাঠালেন—অম্বাকে বিয়ে করতে হবে। কারণ, তার জন্যই অম্বাকে এই দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। ওদিকে ভীষ্মও তার প্রতিজ্ঞায় অটল। তিনি জীবনে কখনোই বিয়ে করবেন না। তাই শুনে পরশুরামও ক্ষেপে উঠলেন। ভীষ্ম শিষ্য হয়ে তার কথার অবাধ্য হচ্ছে! কিন্তু গুরু বললে কী হবে, ভীষ্ম তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও নড়বেন না। এই নিয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। টানা তেইশ দিন যুদ্ধ চলল।

www.pathagar.com

কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। শেষে ভীষ্ম প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হলেন। সে অস্ত্র প্রয়োগ করলে, আর কিছু না হলেও পরশুরাম অজ্ঞান হতেন নিশ্চিত। তার আগেই নারদ আর পরশুরামের বাবা চলে আসলেন। তারা দুজনকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করলেন। তখন যুদ্ধ থামল।

ওদিকে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বার দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকার বিয়ে হলো। কিন্তু কোনো ছেলেমেয়ে হওয়ার আগেই বিচিত্রবীর্য মারা গেলেন। তখন তো তাদের বংশ লোপ পাওয়ার উপক্রম। বংশরক্ষার আর কোনো উপায় নেই দেখে, শান্তনুর দ্বিতীয় স্ত্রী, চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্যের মা সত্যবতী ভীষ্মকে বংশরক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। তাকে বললেন, ভাইয়ের স্ত্রীদের গর্ভবতী করতে। কিন্তু ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সারা জীবন কুমার থাকবেন। বংশ রক্ষার খাতিরেও তিনি প্রতিজ্ঞা ভাঙতে রাজি হলেন না।

তখন সত্যবতী তার কানীন পুত্র, মানে বিয়ের আগের সন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে ডেকে বংশরক্ষার অনুরোধ জানালেন। এই ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের বড় বৌ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, আর ছোট বৌ অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়।

এভাবে সারা জীবনই ভীষ্ম তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে গেছেন। কোনো বিপদ কিংবা কোনো প্রলোভনের সামনেই তিনি তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও নড়েননি। সেখান থেকেই, কেউ যখন তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকে, এক চুলও নড়ে না, তখন তার সেই প্রতিজ্ঞাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার সাথে তুলনা করা হয়।

পঞ্চপাণ্ডব

অর্থ : পাঁচ ভাই, পাঁচ বন্ধু, একই চিন্তাধারার পাঁচজন

বিশেষ অর্থ : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার 'আধুনিক' ধারার (মডার্নিস্ট) পাঁচ কবি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে

ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের বড় বৌ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, আর ছোট বৌ অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। এই পাণ্ডুর স্ত্রী ছিলেন দুইজন। তাদের মধ্যে প্রথম জন কুন্তী। এই কুন্তী ছিলেন কুন্তিভোজের পালক মেয়ে। কুন্তীর বিয়ের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হলে, সে সভায় পাণ্ডু কুন্তীকে বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত হন। আর তার দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী ছিল মদ্রের রাজা শল্যের বোন। ভীষ্ম নিজে উদ্যোগী হয়ে মাদ্রীর সাথে পাণ্ডুর বিয়ে দেন।

www.pathagar.com

দুই স্ত্রী থাকলেও, পাণ্ডুর সন্তান হওয়ার কোনো যো ছিল না। কারণ, কিমিন্দম মুনির অভিশাপ। এই কিমিন্দম মুনি একবার ভাবলেন, তার ছেলে হওয়া দরকার। কিন্তু যদি মানুষ দেখে ফেলে, সেই ভয়ে তিনি হরিণের রূপ ধারণ করলেন। তারপর যখন হরিণের রূপে মিলিত হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাণ্ডু সেই বনে মৃগয়ায়, মানে শিকারে গিয়েছিলেন। তিনি বেছে বেছে হরিণ-রূপী কিমিন্দম মুনিকেই পাঁচটি বাণ মেরে হত্যা করলেন। মৃত্যুর আগে কিমিন্দম মুনি তাকে অভিশাপ দিয়ে গেলেন, তিনি যেমন অতৃপ্ত অবস্থায় মারা যাচ্ছেন, পাণ্ডুও তেমনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে করতে, অতৃপ্ত অবস্থাতেই মারা যাবেন। অর্থাৎ, তার ছেলে হওয়ার কোনো উপায়-ই রইল না। মনের দুঃখে পাণ্ডু তার দুই স্ত্রীকে নিয়ে প্রব্রজ্যা ব্রত গ্রহণ করে বনবাসী হলেন।

এই পাণ্ডুর প্রথম স্ত্রী কুন্তী একবার সেবা-যত্নে দুর্বাসা মুনিকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তখনো অবশ্য তার বিয়ে হয়নি। তখন দুর্বাসা মুনি তাকে এক অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে মন্ত্র দিয়ে কুন্তী যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। শুধু তাই না, সেসব দেবতাদের ঔরসে তার ছেলেও হবে। কোনোভাবেই যখন তার স্বামী পাণ্ডু কিমিন্দম মুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না, তখন কুন্তী স্বামীকে সেই মন্ত্রের কথা বললেন। পাণ্ডুর কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন, ক্ষেত্রজ সন্তান নেয়ার ব্যাপারে। পাণ্ডু অনুমতি দিলে, কুন্তী ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। তাদের ঔরসে তার তিন ছেলে হলো– ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম আর ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন।

পরে পাণ্ডুর অনুমতি নিয়ে কুন্তী এই মন্ত্র তার সতীন মাদ্রীকেও শিখিয়ে দিলেন। তখন মাদ্রী সূর্যের দুই ছেলে অশ্বিনী ও রেবন্তকে আহ্বান করলেন। তাতে মাদ্রীরও দুই ছেলে হলো—অশ্বিনীর ঔরসে নকুল আর রেবন্তের ঔরসে সহদেব।

ওদিকে পাণ্ডুর বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল গান্ধারীর। তার বাবা ছিলেন গান্ধারের রাজা সুবল। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে, স্ত্রী গান্ধারীও সব সময় চোখে কাপড় বেঁধে রাখতেন। বেদব্যাস এই গান্ধারীকে বর দিয়েছিলেন, তার একশ ছেলে হবে। এরপর গান্ধারী গর্ভবতীও হলেন। কিন্তু দুই বছর পেরিয়ে গেলেও, তার আর সন্তান হচ্ছিল না।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের ছোট ভাই পাণ্ডুর বড় ছেলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়ে গেছে। তখন গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্রকে না জানিয়েই, বেদব্যাসের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, গর্ভপাত করলেন। তার পেট থেকে বেরিয়ে এল একটা মাংসপিণ্ড, লোহার

www.pathagar.com

মতো শক্ত। বেদব্যাসের পরামর্শ মেনে, গান্ধারী সেই মাংসপিণ্ড ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সেখান থেকে একশ একটা ভ্রূণ আলাদা হলো। তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা কলসিতে ঘিয়ে ভিজিয়ে রাখলেন। সেই কলসিগুলো থেকেই একে একে দুর্যোধন-দুঃশাসন-বিকর্ণ-চিত্রসেনসহ তাদের মোট ১০০ ছেলের জন্ম হলো। সাথে তাদের এক মেয়েও হয়েছিল—দুঃশলা।

পরে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দখল নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের এই একশ ছেলের সঙ্গে বিরোধ লাগে পাণ্ডুর পাঁচ ছেলের। সেই বিরোধ থেকেই কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে যায়। তাতে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর মোট ১০৫ ছেলে তো বটেই, কুরুবংশের সকলেই যোগ দেন। যোগ দেন আশেপাশের সকল রাজ্যের রাজারাও। কুরুক্ষেত্রে আঠার দিনব্যাপী এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে প্রতিদিনই দুপক্ষের হাজার হাজার লাখ লাখ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধশেষে দুই পক্ষ মিলিয়ে বেঁচে ছিল মাত্র দশজন।

কুরুক্ষেত্রের এই যুদ্ধে জয়ী হন পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই। তারা হারিয়ে দেন কৌরবদের একশ ভাইকে। শুধু যুদ্ধেই না, ধর্মে-কর্মে, আচারে-নিষ্ঠায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, অস্ত্রে-শস্ত্রেও তারা পাঁচ ভাই ছিলেন অতুলনীয়। আর তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যও ছিল ভীষণ।

পাঁচ ভাই বা বন্ধুর মধ্যে যদি এমন মিল পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভীষণ ভালো, বা তারা সবাই-ই বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, বা সাহসে সমান, বা সবাই সমান ডানপিটে-দুরন্ত, তখন পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের বলা হয় পঞ্চপাণ্ডব।

আবার বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ের পাঁচ কবিকেও পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। বাংলা কবিতার ধারায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন কবি। বাংলা কবিতায় তার পরবর্তী প্রায় সব কবিই তার কবিতার প্রভাব থেকে বের হতে পারছিলেন না। একক কবি হিসেবে নজরুল অবশ্য তার ধারা থেকে বের হতে পেরেছিলেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেই সময়ে পাঁচজন কবি পশ্চিমা কবিতার আধুনিকতার ধারাকে বাংলা কবিতায় নিয়ে এসে, সেই রবীন্দ্র-বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসেন। বাংলা কবিতার আধুনিক ধারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিও এই পাঁচজনই—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে। বাংলা সাহিত্যে এদেরকে একত্রে বলা হয় পঞ্চপাণ্ডব।

www.pathagar.com

পাণ্ডববর্জিত দেশ

অর্থ : নিতান্ত অজপাড়াগাঁ/ সভ্যতার সংস্পর্শহীন অঞ্চল

পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এই পাঁচজন পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত। বনবাস, রাজ্যজয়, রাজসূয় যজ্ঞ ইত্যাদি কাজে এই পঞ্চপাণ্ডব যাকে বলে তাবৎ পৃথিবীই ঘুরে ফেলেছিলেন। যেসব জায়গায় মানুষ থাকে বা থাকতে পারে, এমন কোনো জায়গাই তারা বাদ রাখেননি। এমনকি তারা বার বছর বনবাসেও ছিলেন। অর্থাৎ যেসব জায়গা নিতান্তই মানুষের বসবাসের অনুপযোগী, গহীন বন, আর যেসব জায়গায় মানুষের পক্ষেই যাওয়াই সম্ভব না—এই সব জায়গা বাদ দিয়ে আর সব জায়গাতেই কোনো না কোনো কারণে পাণ্ডবদের পা পড়েছিল।

কাজেই, যেসব অঞ্চল জনপদ থেকে অনেক দূরে, যেখানে সভ্যতার হাওয়া-বাতাস লাগেনি, এখনও যেখানকার মানুষ আদিম উপায়ে জীবনযাপন করে, সেসব অঞ্চলের বর্ণনা দিতেই বলা হয়—পাণ্ডববর্জিত দেশ। যে অঞ্চলকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে বোঝানো হয়, সেসব অঞ্চল এতটাই দুর্গম বা গহীনে অবস্থিত যে, পাণ্ডবরা সেসব অঞ্চলে যেতেই পারেননি; কিংবা সেসব অঞ্চলের সঙ্গে আশেপাশের জনপদের যোগাযোগ এতটাই কম যে, পাণ্ডবরা সেসব অঞ্চলের খোঁজই পায়নি। আর তাই সেখানে পাণ্ডবদের পাও পড়েনি।

শকুনি মামা

অর্থ : কুটিল ব্যক্তি

যুধিষ্ঠিরের বাবা পাণ্ডু ছোট ভাই হলেও, যুধিষ্ঠির নিজে ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলে দুর্যোধনেরও বড় ছিলেন। মানে, দুর্যোধনের আগেই যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিল। তার উপর ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলে, রাজা ছিলেন তার বাবা পাণ্ডু। স্বাভাবিকভাবেই, পাণ্ডুর পরে কুরুবংশের রাজা হওয়ার কথা এই যুধিষ্ঠিরেরই। এমনকি দুর্যোধনদের বাবা ধৃতরাষ্ট্র নিজেই তাকে যুবরাজ হিসেবে বরণ করেছিলেন। কিন্তু সেটা মানতে পারেনি ধৃতরাষ্ট্রের বড় ছেলে দুর্যোধন। এর আগেও সে পাণ্ডুর ছেলেদের মারার নানা চেষ্টা করেছিল। আর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করার পর, সে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। ধৃতরাষ্ট্রকেও সে খানিকটা উস্কিয়ে, খানিকটা জোর করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসলো। তারপর পাণ্ডবদের মহাসমারোহে জতুগৃহে থাকতে দিয়ে, সেই জতুগৃহ পুড়িয়ে দিয়ে তাদের হত্যার এক সুনিপুণ পরিকল্পনা আঁটল।

www.pathagar.com

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর দুঃসম্পর্কের ভাই বিদুর সে পরিকল্পনার কথা যুধিষ্ঠিরের কাছে ফাঁস করে দিলেন। ফলে বেঁচে গেলেন পঞ্চপাণ্ডব আর তাদের মা কুন্তী। জতুগৃহে তারা প্রায় বছর খানেক বাস করেছিলেন। তারপর যে রাতে জতুগৃহে আগুন দেয়া হলো, বিদুর সে রাতেই তাদের পালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। তার দেয়া নৌকায় চেপেই তারা গঙ্গা পাড়ি দিয়ে পালালেন।

এরপর তারা বেশ কিছুদিন বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সে সময়েই তারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার খবর পেলেন। সবাই মিলে সেই সভায় যোগ দিলেন। অর্জুন স্বয়ংবর সভার শর্তও পূরণ করলেন। তাই দ্রৌপদীকে তারই বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের মা কুন্তীর ছোট্ট একটা ভুলে, অসাবধানে বলে ফেলা একটা কথা রাখার জন্য, তারা পাঁচ ভাই-ই দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন।

ওদিকে তখন ধৃতরাষ্ট্ররা জানতে পারলেন, পাণ্ডবরা মারা যাননি, বেঁচে আছেন। শুনে অবশ্য ধৃতরাষ্ট্র খুশিই হলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে ডেকে আনলেন। তাদেরকে রাজ্যের অর্ধেকটা ভাগও দিলেন। তবে হস্তিনাপুর দুর্যোধনেরই থাকল। পাণ্ডবদের থাকার জন্য তিনি খাণ্ডবপ্রস্থ নামের একটা জায়গা ঠিক করে দিলেন। পাণ্ডবরা সেখানে গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের পত্তন করলেন। তারপর সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

তারপর এক-এক করে পাণ্ডবরা বহু দেশ জয় করলেন। সেসব দেশ থেকে বহু ধনরত্নও নিয়ে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। তাদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল। তখন নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ শুরু করলেন। সে যজ্ঞে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে এল দুর্যোধনও। দুর্যোধন এসে, পাণ্ডবদের অমন ঐশ্বর্য দেখে, হিংসায় জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল। ওদের অমন সুখ-সমৃদ্ধি, শান-শওকত তার একদমই সহ্য হচ্ছিল না। তার মাথায় আবার শয়তানি বুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। সে চিন্তা করতে শুরু করল, কী করে যুধিষ্ঠিরদের সর্বনাশ করা যায়। তাই নিয়ে সে পরামর্শ করতে বসল শকুনির সাথে।

এই শকুনি ছিল দুর্যোধনদের মামা। দুর্যোধন নিজেই খুব একটা সুবিধার লোক ছিল না। আর তার এই মামাও ছিল তার মতোই। ভীষণ শয়তান আর মহা ধুরন্ধর। দুর্যোধনের শয়তানি মতলব-ফন্দি-ফিকির আর পরিকল্পনাগুলোর অন্যতম কূট-উপদেষ্টা ছিল এই শকুনি। অন্যের অনিষ্ট করার মতলব আঁটতে তার কোনো জুড়ি ছিল না। এর আগে জতুগৃহ পোড়ানোর পরিকল্পনার সময়ও, এই শকুনিই ছিল দুর্যোধনের অন্যতম পরামর্শদাতা। শকুনির পরামর্শেই দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলার (জুয়াখেলা) আমন্ত্রণ পাঠাল।

www.pathagar.com

এমনিতেই যুধিষ্ঠির ছিলেন ভীষণ ধর্মপ্রাণ। আর ক্ষাত্রধর্ম অনুযায়ী, অন্য রাজার এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা অধর্ম। কিন্তু দুর্যোধন পাশাখেলার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, সঙ্গে আবার শকুনিও আছে, দেখেই যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন, নির্ঘাত কোনো বদ মতলব আছে। তবু যুধিষ্ঠিরকে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হলো। নইলে যে ক্ষাত্রধর্ম ভঙ্গ হয়। যুধিষ্ঠির আবার স্বয়ং ধর্মের ছেলে। ধর্মে যা বলা আছে, তার একটুও অন্যথা করা তার স্বভাবে নেই। কাজেই, তিনি খেলায় সায় দিলেন। তখন শকুনি আর যুধিষ্ঠিরের মধ্যে খেলা শুরু হলো।

শকুনি এই দ্যূতক্রীড়া, মানে পাশাখেলা বা জুয়াখেলায় ছিল সিদ্ধহস্ত। আর খেলার মধ্যে দুই নম্বুরিও করতে পারত ভালোই। তাই এ খেলায় তাকে হারানো ছিল খুবই কঠিন। সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরও তা পারলেন না। প্রতিবারই হারতে লাগলেন। এই খেলায় আবার একটা কিছু পণ বা বাজি রেখে খেলতে হয়। আর রাজা-রাজড়াদের পণ, সেটা অল্পস্বল্প কিছুও হতে পারে না। প্রতিবার খেলায় যুধিষ্ঠির নতুন নতুন পণ রাখেন, আর প্রতিবারই শকুনির কাছে হেরে যান। এভাবে দুর্যোধনের হয়ে শকুনি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তার রাজ্য, চার ভাইয়ের উপর অধিকার, যুধিষ্ঠিরের নিজের উপর অধিকার, এমনকি তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীর উপর অধিকারও নিয়ে নিল। যুধিষ্ঠির সব হারিয়ে কৌরবদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

এভাবে শকুনির পরামর্শে ও সাহায্যে পাশা খেলেই দুর্যোধন পঞ্চপাণ্ডবদের হারিয়ে তাদের রাজ্য ও তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীকে জয় করে নিলেন। শুধু তাই না, ভরা মজলিসে দ্রৌপদীকে রীতিমতো অপমানই করল দুর্যোধন। পরে অবশ্য তাদের চাচা ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীসহ তাদের পাঁচ ভাইকেই মুক্ত করে দেন।

কিন্তু পরে এই ধৃতরাষ্ট্রই আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় রাজি করতে বাধ্য হলেন। ওই দুর্যোধনের চাপে পরে। এবারও জিতে গেল শকুনি। সে বার খেলার শর্ত ছিল, হেরে গেলে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। সেই বারো বছরের বনবাস শেষ হলে, এক বছরের অজ্ঞাতবাস। আর সেই অজ্ঞাতবাসের মধ্যে কেউ যদি চিনে ফেলে, তাহলে আবার বারো বছরের বনবাস। পাণ্ডবদের সেটাও মেনে নিতে হলো। আর এই কুটিল বুদ্ধিটাও ছিল দুর্যোধনের মামা শকুনির।

শকুনি অবশ্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা যায়। সেই যুদ্ধে অর্জুন তার দুই ভাইকে মেরে ফেললে, শকুনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে নামে। অর্জুন শকুনিকেও হারিয়ে দেন। তখন সে পালিয়ে যায়। দুর্যোধনরা আবার ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কুরুক্ষেত্রে নিয়ে আসে। এবার শকুনি ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নামে এবং যথারীতি

www.pathagar.com

আবারও হারে। আবার পালিয়ে যায়। পরে আবার যুদ্ধ করতে এলে, সহদেবের হাতে ছেলেসহ মারা যায় শকুনি।

কুরুক্ষেত্রে মারা গেলেও, তার আগেই শকুনি তার কুটিলতার অজস্র স্বাক্ষর রেখে গেছে। বিশেষ করে পাশাখেলার মাধ্যমে, মানে জুয়া খেলে কারও সব সম্পত্তি আর প্রিয় মানুষদের ছিনিয়ে নেয়ার মতো কুটিল বুদ্ধি যার মাথা থেকে বের হতে পারে, তার চেয়ে কুটিল মানুষ আসলেই খুব কম আছে। যার মাথায় অমন ভয়ঙ্কর কুটিল বুদ্ধি, তেমন লোকদের কথা বলতে গেলে, দুর্যোধনের এই মামার প্রসঙ্গ টেনে তাদের বলা হয় শকুনি মামা।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

অর্থ : প্রকাশ্যে কোনো নারীকে লাঞ্ছিত করা

দ্রৌপদী ছিলেন পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের মেয়ে। দ্রোণ এই পাঞ্চাল রাজ্যের অর্ধেক দখল করে নিয়েছিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ দ্রোণকে বধ করার জন্য একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সে যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে তার এক ছেলে ও এক মেয়ে হয়—ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী।

বিয়ের বয়স হলে, রাজা দ্রুপদ দ্রৌপদীর বিয়ের আয়োজন শুরু করলেন। সেজন্য দেশে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হলো। সেই স্বয়ংবর সভার খবর পেলেন পঞ্চপাণ্ডবও। খবর পেয়ে তারা পাঁচ ভাই গেলেন পাঞ্চাল দেশে। সেখানে গিয়ে অবশ্য তারা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখলেন। তারা যে রাজা, মানে ক্ষত্রিয়, সেটা চেপে গেলেন। সবাইকে জানালেন, তারা ব্রাহ্মণ। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবর সভার শর্ত ঘোষণা করলেন। ওখানে পাঁচটি বাণ আর একটা ধনুক রাখা ছিল। ধনুকে জ্যা পরিয়ে, বাণগুলো একটা ছিদ্র দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে লাগাতে হবে।

অবশ্য স্বয়ংবর সভায় আসা বেশিরভাগ রাজা ধনুকে জ্যা-ই পরাতে পারছিলেন না। তবে একজন ধনুকে জ্যা পরিয়ে ফেললেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি লক্ষ্যভেদও করতে পারবেন। ইনি ছিলেন মহাবীর কর্ণ। কিন্তু তিনি বাণ ছোড়ার আগেই দ্রৌপদী তাকে থামিয়ে দিলেন। এই কর্ণ কুন্তীর ছেলে হলেও, তাকে বড় করেছিল এক সূতবংশের দম্পতি। তাই সবাই জানত, তিনি সূতবংশের সন্তান। মানে, ছুতারের ছেলে। তাকে থামিয়ে দেয়ার কারণও সেটাই। কারণ, রাজার মেয়ে দ্রৌপদী তো আর নিচু জাতের কাউকে বিয়ে করতে পারেন না।

www.pathagar.com

এরপরে দৃশ্যপটে আসলেন পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই। তবে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে। দ্রৌপদীকে দেখে পাঁচ ভাইয়েরই পছন্দ হলো। কিন্তু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন কেবল অর্জুন। কারণ—তাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রচালনায় তিনিই ছিলেন সেরা। আর সেই কঠিন পরীক্ষায় তিনি সফলও হলেন। উপযুক্ত জামাই পাওয়ার খুশিতে সিংহাসন থেকে উঠে এলেন স্বয়ং রাজা দ্রুপদ। অর্জুনকে মালা পরিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীও। অর্জুনও ক্ষত্রিয় রীতি অনুসারে দ্রৌপদীকে তুলে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন।

কিন্তু এই ঘটনা দেখে সভায় আসা অন্য রাজারা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। কারণ, দ্রুপদ রাজা হয়েও তার মেয়েকে আরেকজন রাজার সাথে বিয়ে না দিয়ে, বিয়ে দিলেন এক ব্রাহ্মণের সাথে। তখন তারা সবাই মিলে একসাথে হয়ে জোট বাঁধলেন। জোট বেঁধে রাজা দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শুরু হয়ে গেল রাজা দ্রুপদের সঙ্গে অন্য রাজাদের ঘোরতর যুদ্ধ। সে যুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডবরাও যোগ দিলেন, রাজা দ্রুপদের পক্ষে। তাদের বীরত্বে, রাজা দ্রুপদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা ওই সমবেত বাহিনীও হেরে গেল।

রাজারা এবার সভায় বসলেন। তারা এই ব্রাহ্মণদের পরিচয় জানতে চান। তাদের সন্দেহ হতে লাগল, এরা কি আসলেই ব্রাহ্মণ? সেই রাজাদের মধ্যে কৃষ্ণও ছিলেন। তিনি অবশ্য এরই মধ্যে পাণ্ডবদের আসল পরিচয় জেনে গিয়েছিলেন। তবে তিনি অন্য রাজাদের সরাসরি কিছু বললেন না। তবে অন্য কৌশলে তাদের শান্ত করলেন। সবাইকে বোঝালেন, এরা স্বয়ংবর সভার শর্ত পূরণ করেছে। কাজেই এদের সাথে যুদ্ধ করাটা অন্যায় হচ্ছে।

যুদ্ধ থামলে, পঞ্চপাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তীর কাছে ফিরে গেলেন। ছেলেদের দেরি দেখে ওদিকে মা কুন্তী তো চিন্তায়-চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছেন। এমন সময় পাঁচ ভাই ফিরে এলেন। মাকে ডাক দিলেন। বললেন, ভিক্ষা এনেছি। কুন্তী তো ছেলেদের ফিরে আসাতেই খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। ঘর থেকে বের হতে হতে, কী এনেছে না দেখেই, তিনি জবাব দিয়ে দিলেন, তোরা পাঁচ ভাইয়ে মিলে ভাগ করে নে।

তারপর বের হয়ে এসে, দ্রৌপদীকে দেখে তিনি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তখন অবশ্য বড় ভাই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, দ্রৌপদীকে বিয়ে করতে। অর্জুন কিন্তু মায়ের আদেশ অমান্য করতে রাজি হলেন না। তার কথা, মা যখন বলেছেন, তখন তারা পাঁচ ভাই-ই ভাগ করে নেবেন। মানে তারা সবাই দ্রৌপদীকে বিয়ে করবেন। কিন্তু তাই-বা কী করে হয়! তাই নিয়ে কতক্ষণ বেশ চাপান-উতোর চলল। শেষে তারা ঠিক করলেন, মায়ের কথাই সই। মা যখন বলেছেন, তখন তারা পাঁচ ভাই মিলেই দ্রৌপদীকে বিয়ে

www.pathagar.com

করবেন। তারপর এ সিদ্ধান্ত জানালেন রাজা দ্রুপদকে। শুনে তিনিও প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে পরলেন। তখন প্রথমে যুধিষ্ঠির, পরে ব্যাস নিজেও তাকে অনেক বোঝালেন। শেষে অবশ্য দ্রুপদ রাজিই হলেন। তখন একে একে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের সাথেই দ্রৌপদীর বিয়ে হলো।

পরে নারদ নিয়ম করে দিলেন, দ্রৌপদী একেক বছরে পাণ্ডবদের একেক ভাইয়ের সাথে থাকবেন। এক ভাইয়ের সাথে থাকার সময় যদি অন্য কোনো ভাই তাদের একসাথে দেখে ফেলেন, তাহলে তাকে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে। সে ঘটনাও ঘটেছিল, আর সেটাও ওই অর্জুনের সাথেই। দ্রৌপদী তখন যুধিষ্ঠিরের সাথে ছিলেন। কী এক জরুরি প্রয়োজনে অর্জুনকে তাদের সামনে যেতেই হয়েছিল। পরে যুধিষ্ঠির মানা করলেও, সত্য রক্ষার্থে অর্জুন বনবাসে চলে যান।

এই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনা ঘটে দুর্যোধনের রাজসভায়। পাণ্ডবদের দাওয়াত পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে, তাদের সমৃদ্ধি দেখে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে দুর্যোধন। তখন শকুনিকে সঙ্গে নিয়ে মতলব ভাঁজতে বসে, কীভাবে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করা যায়। পরিকল্পনা মোতাবেক, সে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলার আমন্ত্রণ জানায়। ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা করতে, যুধিষ্ঠিরকেও সেই খেলায় অংশ নিতে হয়। আর পাশাখেলায় ধুরন্ধর শকুনি দুর্যোধনের হয়ে একে একে তার কাছ থেকে তার রাজ্য, চার ভাইয়ের উপর অধিকার, যুধিষ্ঠিরের নিজের উপর অধিকার, এমনকি তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীর উপর অধিকারও নিয়ে নিল। যুধিষ্ঠির সব হারিয়ে কৌরবদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

পাশাখেলায় তো দুর্যোধন দ্রৌপদীর উপর অধিকার পেয়ে গেল। তারপর আদেশ দিল, দ্রৌপদীকে সভায় আনার জন্য। প্রথমে বলল বিদুরকে। কিন্তু বিদুর যেতে রাজি হলেন না। তখন পাঠাল প্রাতিকামীকে। কিন্তু দ্রৌপদী আসলেন না। তারপর গেল দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন। সে গিয়ে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল রাজসভায়। সভায় আনার পর, দুঃশাসন সবার সামনে দ্রৌপদীর কাপড় খুলতে শুরু করল। মানে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লাগল।

পাণ্ডবরা দ্রৌপদীর এই বস্ত্রহরণের কোনো প্রতিবাদই করতে পারলেন না। কারণ, যুধিষ্ঠির তাদের পণ ধরে হেরে গেছেন। তারা সবাই এখন দুর্যোধনদের দাস। এমনকি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকেও পণ ধরে ছিলেন। সেই খেলাতেও তিনি হেরে গেছেন। কাজেই, তাদের কারোর কিচ্ছু বলার উপায় নেই। অসহায় দ্রৌপদী তখন এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে শুরু করলেন। কৃষ্ণও এর একটা বিহিত করে দিলেন। দ্রৌপদীর গায়ে একের পর এক জামা পরিয়ে দিতে লাগলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর শরীর থেকে একটার পর একটা জামা খুলতে

www.pathagar.com

লাগল। কিন্তু জামা আর শেষ হয় না। কয়েক শ জামা খোলার পর দুঃশাসন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পরল।

তখন দুর্যোধনরা সবাই-ই ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। কর্ণ দ্রৌপদীকে প্রাসাদের দাসী হিসেবে পাঠিয়ে দিতে বললেন। শুনে দুঃশাসনও তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আর দুর্যোধন উরুর কাপড় তুলে, বাজে ইঙ্গিত করে দ্রৌপদীকে দেখালেন। তাই দেখে ভীম অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, দুর্যোধনের উরু ভেঙেই তাকে হত্যা করবেন।

শেষ পর্যন্ত তাদের পিতৃব্য, মানে চাচা ধৃতরাষ্ট্রের করুণা হলো। তিনি তখন দ্রৌপদীকে মুক্তি দিলেন। সাথে দ্রৌপদীকে তিনটি বরও দিলেন। দ্রৌপদী প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরকে, দ্বিতীয় বরে বাকি চার পাণ্ডবদের মুক্ত করলেন। তৃতীয় বরে নিশ্চিত করলেন, তার ছেলে প্রতিবিন্ধ্যকে যেন কেউ দাসীর ছেলে বলে না জানে।

এতে আবার দুর্যোধন তার বাবার উপর ক্ষেপে গেল। তার হম্বিতম্বি দেখে ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারলেন, এভাবে চলতে থাকলে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ লাগবেই। যুদ্ধ এড়াতে তিনি আবার পাশাখেলার আয়োজন করলেন। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম মেনে এবারও রাজি হলেন যুধিষ্ঠির। এবারের শর্ত, যারা হারবে, তারা বারো বছরের বনবাস ও এক বছরের অজ্ঞাতবাসে যাবে। এবারও হারলেন যুধিষ্ঠির। ফলে পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হলো। তারপর এক বছরের অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের এক বছরের মধ্যে কেউ যদি তাদের চিনে ফেলে, তাহলে আবার বারো বছরের বনবাস। পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে গেলেন দ্রৌপদী নিজেও।

দুর্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো, দুঃশাসনের মতো কোনো মন্দ লোক যদি সবার সামনে কোনো নারীকে লাঞ্ছিত করতে থাকে, আর আশেপাশের লোকেরা দুঃশাসনের ভাই দুর্যোধন-বিকর্ণ-চিত্রসেনের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা উপভোগ করতে থাকে, কিছু লোকের খারাপ লাগলেও তারা যদি পাণ্ডবদের মতো আচরণ করে, মানে দুর্যোধনদের দাস হয়ে নিশ্চুপ থাকে, তখন সেই ঘটনাকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়।

কীচক বধ

অর্থ : ভয়ঙ্কর প্রহার করা, মেরে অঙ্গবিকৃতি ঘটানো

দুর্যোধন-শকুনির ষড়যন্ত্রে, পাশাখেলায় হেরে পাঁচ ভাই পাণ্ডবকে যেতে হলো বনবাসে। সঙ্গে গেলেন দ্রৌপদী। তারা প্রথমে গেলেন কাম্যক বনে। সেখান

www.pathagar.com

থেকে তারা বেশকিছু তীর্থেও ভ্রমণ করলেন। শেষ দিকে বাস করেছিলেন বিশাখযূপ বনে। সেখানে একবার ধর্ম তাদের পরীক্ষাও নিয়েছিলেন। সে পরীক্ষায় পাণ্ডবদের চার ভাই ব্যর্থ হলেও, যুধিষ্ঠির ঠিকই উৎরে গেলেন। তখন ধর্ম খুশি হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বর চাইতে। যুধিষ্ঠির বর চাইলেন, যাতে অজ্ঞাতবাসে থাকাকালে কেউ তাদের চিনতে না পারে। ধর্ম সে বর পূরণ করলেন। সঙ্গে এটাও বলে দিলেন, তারা যেন অজ্ঞাতবাসের সময়টায় বিরাট রাজ্যে গিয়ে বাস করেন।

বারো বছরের বনবাস শেষ হলে, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শুরু হলো। ধর্মের উপদেশ অনুযায়ী, তারা বিরাট রাজ্যে গিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। অবশ্য তারা সবাই-ই ছিলেন গোপন পরিচয়ে, ছদ্মবেশে। যুধিষ্ঠির নিজের পরিচয় দিলেন যুধিষ্ঠিরের প্রিয় বন্ধু হিসেবে। নাম নিলেন 'কঙ্ক'। এই কঙ্ক শব্দের মানে 'ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ'। অর্থাৎ পরিচয় গোপন করলেও, যুধিষ্ঠির কোনো মিথ্যা কথা বলেননি। যুধিষ্ঠিরের মতো তার বাকি চার ভাই, এবং তাদের স্ত্রী দ্রৌপদীও পরিচয় গোপন করে ছদ্ম-পরিচয় গ্রহণ করলেন। ভীম নাম নিলেন বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক আর সহদেব নিলেন তন্ত্রিপাল নাম। আর দ্রৌপদী ছদ্মনাম নিলেন সৈরিন্ধ্রী। এভাবে পরিচয় গোপন করে তারা বিরাট রাজার প্রাসাদে পরিচয় গোপন করে বাস করতে শুরু করলেন।

এই বিরাট রাজা পরে মৎস্যরাজ নামেও পরিচিতি পেয়েছিলেন। কীচক ছিল তার শ্যালক। মানে, বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার ভাই। সে ছিল বিরাটের প্রধান সেনাপতি। তো পাণ্ডবরা যখন বিরাট রাজার প্রাসাদে ছদ্মবেশে বাস করছিল, সেই সময়ে সৈরিন্ধ্রী রূপী দ্রৌপদীকে দেখে কীচক তার প্রেমে পড়ে গেল। সে দ্রৌপদীকে একেবারে বিয়ে করারই প্রস্তাব দিল। কিন্তু দ্রৌপদী তো আর সে প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন না।

সোজা আঙুলে কাজ না হওয়ায়, কীচক এবার বাঁকা পথ ধরল। তার বোন সুদেষ্ণাকে বলে-কয়ে রাজি করাল, সৈরিন্ধ্রীকে তার ঘরে পাঠাতে। সুদেষ্ণাও একদিন মদ আনার কথা বলে, দ্রৌপদীকে কীচকের ঘরে পাঠিয়ে দিল। আর কীচক তো সেই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করতে পারল না। দ্রৌপদী অবস্থা বুঝে, কোনো মতে কীচককে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, এক দৌড়ে রাজসভায় চলে এলেন। ভাবলেন, সবার সামনে তো আর কীচক কোনো সমস্যা করতে পারবে না।

কিন্তু ঘটল ঠিক তার উল্টো। কীচক ক্ষেপে গিয়ে, রাজসভায় এসে, দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে, তাকে লাথি মারতে লাগল। যাকে বলে রীতিমতো

www.pathagar.com

অপমান। সবার সামনে। তখন রাজসভায় পাণ্ডবদের অনেকেই ছিলেন। কিন্তু পরিচয় গোপন রাখতে গিয়ে তারাও এর প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

রাতে দ্রৌপদী এলেন ভীমের কাছে। তাকে সব কথা সবিস্তারে খুলে বললেন। ভীম বিরাট রাজপ্রাসাদে পাচকের, মানে রাঁধুনির কাজ নিয়েছিলেন। আর ভাইদের মধ্যে তিনি আবার একটু বেশিই রগচটা আর অহংকারী ছিলেন। তিনি তখনই দ্রৌপদীর সাথে পরিকল্পনা করলেন, কীভাবে এর শোধ নেয়া যায়।

পরিকল্পনা মতো, পরদিন দ্রৌপদী কীচককে বলে রাখলেন, সন্ধ্যায় নাচঘরে তার সাথে দেখা করতে। কীচকও খুশিতে নাচতে নাচতে সময়মতো নাচঘরে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু সেখানে দ্রৌপদী এলেন না। তার বদলে এলেন ভীম। ভীমের শরীরে ছিল দশ হাজার হাতির শক্তি। ভীমের সৎ-ভাইদের মধ্যে, মানে কৌরবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল দুর্যোধন। এই দুর্যোধন ছোটবেলাতে একবার ভীমকে হত্যার আয়োজন করেছিল। সে জন্য দুর্যোধন গঙ্গার তীরে প্রমাণকোটী নামের এক জায়গায় একটা খেলার আয়োজন করে। তাতে সব ভাইদের ডাকে। সেখানে সে ভীমকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। দুর্যোধন ভীমকে বিষ মাখানো মিষ্টি খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর তাকে লতা দিয়ে ভালোমতো বেঁধে, পানিতে ফেলে দেয়।

কিন্তু সে ঘটনায় উল্টো ভীমের আরো উপকার হয়ে যায়। জলের তলে সাপের কামড়ে ভীমের শরীরের বিষ কেটে যায়। জ্ঞান ফিরলে চারপাশে সাপ দেখে, ভীম সাপ ধরে ধরে মারতে থাকে। এর মধ্যে চলে আসেন সাপদের রাজা বাসুকি। এই বাসুকির নাতি ছিল কুন্তীভোজ। আর ভীম এই কুন্তীভোজেরই নাতি। বাসুকি ভীমকে চিনতে পেরে, তাকে জড়িয়ে ধরেন। তার বেশ খাতির-যত্নের ব্যবস্থাও করেন। তারপর তাকে রসায়ন পান করতে দেন। ভীম খেতে খেতে আটটা রসায়ন-কুণ্ড নিঃশেষ করে ফেলেন। খেয়েদেয়ে টানা আট দিন ঘুমান। যখন ঘুম থেকে উঠলেন, ততক্ষণে সেই আট কুণ্ড রসায়ন তিনি হজম করে ফেলেছেন। আর এর ফলেই তার শরীরে অযুত হাতির শক্তি হয়।

এই দশ হাজার হাতির শক্তি যে ভীমের গায়ে, কীচককে হত্যা করতে তার মোটেই সময় লাগল না। শুধু কীচককে মেরেই শান্ত হলেন না ভীম। কীচকের হাত-পাগুলো তার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, কীচককে রীতিমতো একটা মাংসের বল বানিয়ে ফেললেন তিনি।

www.pathagar.com

যদি কাউকে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে মারা হয়, যে তার হাত-পা ভেঙে যায়, মানে বিকৃত হয়ে যায়, কিংবা মারের চোটে তার চেহারাই বদলে যায়, তাকে আর চেনা যায় না, তখন বলা হয় তাকে কীচক বধ করা হয়েছে।

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার
অর্থ : কারো পরাজয় অসম্ভব, এমনটা বোঝাতে

পাণ্ডবরা তাদের অজ্ঞাতবাসের সময়টায় থেকেছিলেন বিরাট রাজ্যে, রাজপ্রাসাদে। তবে অবশ্যই গোপন পরিচয়ে, ছদ্মবেশে। সেখানে যুধিষ্ঠির নিজের নাম বলেছিলেন 'কঙ্ক'। ভীম নাম নিয়েছিলেন বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক আর সহদেব নিয়েছিলেন তন্ত্রিপাল নাম। আর দ্রৌপদীর নাম হলো সৈরিন্ধ্রী। এভাবে পরিচয় গোপন করে তারা বিরাট রাজার প্রাসাদে বাস করতে শুরু করলেন।

এদের মধ্যে কঙ্ক, মানে যুধিষ্ঠির দ্রুতই বিরাট রাজার বেশ কাছের লোক হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের প্রিয় বন্ধু বলে, রাজা তাকে বেশ সমাদরই করতেন। আবার বনবাসের সময় অর্জুন বাবা ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি চিত্রসেনের কাছে বছর খানেক থেকে নাচগানে দীক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। সে সময়ে উর্বশী তাকে প্রেমের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু অর্জুন সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। রেগে গিয়ে উর্বশী তাকে অভিশাপ দিয়ে বসেন। সেই অভিশাপে অজ্ঞাতবাসের এক বছরের জন্য অর্জুন নপুংসক হয়ে গিয়েছিলেন। এসব মিলিয়ে তাকে বিরাট রাজা তার মেয়ে উত্তরার নাচ-গান শেখানোর দায়িত্ব দেন।

এরই মধ্যে বিরাট রাজার সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীকে রাজসভায় সবার সামনে লাঞ্ছিত করেছিলেন। তার শোধ নিতে পাচক, মানে রাঁধুনী বল্লভের ছদ্মবেশে থাকা ভীম রাতের বেলা কীচককে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই খবর ছড়াতে ছড়াতে দুর্যোধনদের কানেও পৌঁছে যায়। তারা জানতে পারেন, বিরাট রাজ্যের সেনাপতি মারা গেছেন। সে খবর শুনে তারা ভাবলেন, এখন তাহলে নিশ্চয়ই বিরাট রাজার অবস্থা ভীষণ নাজুক। রাজার সেনাপতিই তো মারা গেছে। মানে, বিরাটের রাজাকে অপদস্থ করার এটাই মোক্ষম সময়। তখন তারা গিয়ে বিরাট রাজার সব গরু দখল করে নিল।

এবার দৃশ্যপটে আসলেন বৃহন্নলা, মানে অর্জুন। বিরাট রাজা তার গরুগুলোকে উদ্ধারের জন্য পাঠালেন তার ছেলে উত্তরকে। বৃহন্নলা সঙ্গে গেলেন তার সারথি হয়ে। কিন্তু বিরাট রাজা তো আর বৃহন্নলার আসল পরিচয়

www.pathagar.com

জানেন না। ছেলে উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে গেছেন গরু উদ্ধারে, এদিকে বিরাট রাজা চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছেন। তখন কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির তাকে বললেন—"বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার"।

সত্যি সত্যিই তেমনটাই ঘটল। বৃহন্নলারূপী অর্জুন সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করে কৌরবদের সবাইকে অজ্ঞান করে ফেললেন। তারপর শুধু গরুই নয়, তার শিষ্যা উত্তরার জন্য কাপড়-চোপড় আর অলঙ্কারও নিয়ে ফেরত আসলেন। আর তাদের এই অভিযান শেষ হতে-হতে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের মেয়াদও শেষ হয়ে গেল। তখন পাণ্ডবরা বিরাট রাজার কাছে তাদের আসল পরিচয় দিলেন। শুনে বিরাট রাজা তো ভীষণ খুশি। তিনি বীর অর্জুনের সাথে তার মেয়ে উত্তরার বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু অর্জুন তার নিজের শিষ্যকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না। তিনি বরং তার ছেলে অভিমন্যুর সাথে উত্তরার বিয়ে দিলেন।

কঙ্কর ছদ্মবেশে থাকা যুধিষ্ঠির বিরাট রাজাকে প্রবাদের এই বাক্যটা বলেছিলেন, কারণ বৃহন্নলা সাথে থাকায় তার ছেলের পরাজয় এক রকম অসম্ভব। এরকম অর্থ বোঝাতে, অর্থাৎ কারো সাথে যদি এমন কেউ সঙ্গী হিসেবে থাকে, যার কারণে প্রথম ব্যক্তির হেরে যাওয়া বা ব্যর্থ হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তখন এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

বিদুরের খুদ

অর্থ : দীনজনের ভক্তির দান

বিদুর ছিলেন যুধিষ্ঠিরদের, মানে পাণ্ডবদের চাচা। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভাই। তবে বেশ দুঃসম্পর্কের ভাই। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকার দুই ছেলে। কিন্তু তাদের বাবা বিচিত্রবীর্য নন। তাদের জন্মের আগেই তিনি মারা যান। তখন কুরুবংশই লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। শেষে বিচিত্রবীর্যের মা সত্যবতী তার কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে ডেকে বংশরক্ষার অনুরোধ জানান।

এই ব্যাস দেখতে ছিলেন ভীষণ কালো। সঙ্গে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, আর জটাবাঁধা চুলে হলদেটে আভা। সব মিলিয়ে তাকে দেখে ভীষণ ভয়ই লাগত। আর তাই বিচিত্রবীর্যের বড় বৌ অম্বিকার সাথে মিলনের সময়, অম্বিকা ভয়ে চোখ বন্ধ করে রাখলেন। ফলে অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে জন্মালেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলে, আবার ব্যাসের ডাক পরল। কারণ অন্ধ ছেলে তো আর রাজা হতে পারবেন না। আর বংশের উত্তরসূরি যদি রাজাই হতে না

www.pathagar.com

পারেন, তাহলে আর কুরুবংশ রক্ষা করে কী লাভ! তাই এবার অম্বালিকাকেও পাঠানো হলো ব্যাসের কাছে। অম্বালিকা চোখ খোলা রাখলেন বটে, কিন্তু ব্যাসকে দেখে ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে-পাণ্ডুর হয়ে গেল। তাই তার ছেলেও হলো অমন ফ্যাকাশে চেহারার। তাই তার নাম রাখা হলো পাণ্ডু।

তাই দেখে সত্যবতী আবার অম্বিকাকে ব্যাসের কাছে পাঠালেন। কিন্তু এবার আর অম্বিকা নিজে গেলেন না। বদলে পাঠালেন তার সুন্দরী দাসীকে। এই দাসী ছিল অপ্সরার মতো সুন্দরী, কিন্তু জাতিতে শূদ্র। সেই দাসীর গর্ভে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে, স্বয়ং ধর্ম বিদুরের রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ধর্ম বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন মাণ্ডব্য নামের এক তপস্বীর অভিশাপে। এই মাণ্ডব্য একবার মৌনব্রতের তপস্যা করছিলেন। সে সময় তাকে এক দল দস্যুর সঙ্গে, দস্যু সন্দেহে আটক করা হয়। বিচারের সময়, মাণ্ডব্য যেহেতু মৌনব্রত পালন করছিলেন, কিছুই বললেন না। তাই দেখে রাজা তাকেও দস্যুদলের সদস্য বলে ধরে নিলেন। বাকি দস্যুদের সাথে তাকেও শূলে চড়ানো হলো। কিন্তু শূলে চড়ানোর পরও, তপস্যার গুণে মাণ্ডব্য বেঁচে রইলেন। রাজা তখন তার ভুল বুঝতে পারলেন। মাণ্ডব্যকে শূল থেকে নামানো হলো। কিন্তু শূলের মাথার খানিকটা অংশ ভেঙে মাণ্ডব্যের শরীরে থেকে গেল। মাণ্ডব্যকে বাকি জীবন পশ্চাদ্দেশে ওই শূলের ভাঙা অগ্রভাগ বা 'অণী' নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তাই পরে তার নাম হয় অণীমাণ্ডব্য।

পরে একবার ধর্মের সাথে মাণ্ডব্যের দেখা হলো। মাণ্ডব্য তখন তার এই শাস্তির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ধর্ম জানালেন, মাণ্ডব্য ছোটবেলায় একবার খেলতে খেলতে একটা পতঙ্গের পশ্চাদ্দেশে ঘাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্যই মাণ্ডব্যের এই শাস্তি। শুনে মাণ্ডব্য ভীষণ রেগে গেলেন। এই লঘু পাপের জন্য এমন গুরু দণ্ড! রেগে গিয়ে তিনি ধর্মকে অভিশাপ দিলেন, ধর্ম পৃথিবীতে এক শূদ্র নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। সে অভিশাপেই ধর্ম বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

পরে কুরুবংশের সিংহাসন নিয়ে কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হলে, বিদুর কৌরবদের পক্ষে ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে ভালো ভালো উপদেশ-পরামর্শও দিতেন। ধৃতরাষ্ট্রও সব সময় বিদুরের সাথে শলা-পরামর্শ করতেন। কিন্তু কখনোই বিদুরের পরামর্শ মতো কাজ করতেন না। দুর্যোধনের জন্মের সময় নানা খারাপ লক্ষণ দেখা দিলে, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দুর্যোধনকে ত্যাগ করার। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে কথা শোনেননি। পরে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনরা জতুগৃহ পোড়ানোর ষড়যন্ত্র করার সময়, বিদুর তাদের নিষেধ করেন। সে কথাও তারা শোনেননি। পরে যখন

www.pathagar.com

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে, ততদিনে বিদুর দুর্যোধনদের উপর একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই সে যুদ্ধে বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেন।

বিদুরের খুদ খাওয়ার ঘটনাটা অবশ্য এই যুদ্ধেরও আগের ঘটনা। এই যুদ্ধে কৃষ্ণ নিজে যোগ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের পক্ষে। আর তার দশ কোটি নারায়ণী সৈন্যবাহিনী দিয়েছিলেন কৌরবদের। তবে যুদ্ধ শুরুর আগে তিনি একবার দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি কৌরবদের আবাস হস্তিনাপুরে আসেন। সেখানে দুর্যোধন তাকে আতিথ্য দিতে চাইলেও, তার সে চাওয়ায় কৃষ্ণের প্রতি বিশেষ একটা শ্রদ্ধা ছিল না। তার উপর এমনিতেই দুর্যোধন সুবিধার লোক ছিল না। অন্যদিকে বিদুর স্বয়ং ধর্ম। তাই দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা বেশি থাকার পরও, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে বিদুরের আতিথ্যই গ্রহণ করেছিলেন। দুর্যোধনের প্রাসাদে না উঠে, উঠেছিলেন গিয়ে বিদুরের কুটিরে। আর বিদুরও পরম ভক্তিতে কৃষ্ণকে আপ্যায়ন করেছিলেন।

এই ঘটনা থেকেই, গরিব বা দীনজনের ভক্তির দানকে বলা হয় 'বিদুরের খুদ'।

দাতা কর্ণ

অর্থ : ভীষণ দানশীল (কখনো কখনো ব্যঙ্গার্থে)

পাণ্ডবরা ছিলেন পাঁচ ভাই—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। এই পঞ্চপাণ্ডবের মায়ের নাম কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডবের আগে কুন্তীর আরেক সন্তান হয়েছিল—কর্ণ। সেটা অবশ্য কুন্তীর বিয়েরও আগের ঘটনা। একবার দুর্বাসা মুনি এসেছিলেন কুন্তীদের বাসায়। আর মুনিকে পেয়ে কুন্তীও সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। সন্তুষ্ট হয়ে মুনি তাকে এক অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। সে মন্ত্র দিয়ে কুন্তী যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারবেন। শুধু তাই না, সেসব দেবতাদের ঔরসে তার ছেলেও হবে। মন্ত্রের গুণের কথা শুনে কুন্তীর ভীষণ কৌতূহল হলো। তিনি সূর্যকে আহ্বান করলেন। তখন মুনি যেমনটা বলেছিলেন, তেমনটাই ঘটল। সূর্যের ঔরসে কুন্তীর কোল আলো করে এক ছেলের জন্ম হলো। কর্ণ হলেন সূর্য-কুন্তীর সেই ছেলে। সূর্যের সন্তান হওয়ায়, জন্ম থেকেই কর্ণের কানে-গলায় ছিল কবজ-কুণ্ডল।

কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী কর্ণকে একটা পাত্রে করে জলে ভাসিয়ে দিলেন। অধিরথ ও রাধা নামের সূতবংশের এক দম্পতি, মানে এক ছুতার দম্পতি

www.pathagar.com

তাকে কুড়িয়ে পেলেন। তারাই তাকে লালন-পালন করে বড় করলেন। এভাবে অভিজাত বংশের সন্তান হয়েও, কর্ণকে নিচু বংশের পরিচয়ে পরিচিত হতে হলো। অবশ্য কর্ণ নিজ গুণে দ্রুত নানা সমরবিদ্যায় শিক্ষিত হলেন। তারপর এক সময়ে দুর্যোধনের খুবই কাছের লোকে পরিণত হলেন। দুর্যোধনের সাথে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে পাণ্ডবদের পোড়ানোর চেষ্টা, তাদের সাথে পাশাখেলার বন্দোবস্ত করার মতো কূটবুদ্ধি পাকানোর মতো উদ্যোগগুলোতে তিনি সামনের সারিতেই ছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হলে, কর্ণ কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধে নামলেন। যুদ্ধের আগে তিনি প্রথমে বৈষ্ণবযজ্ঞ ও পরে আসুরব্রত পালন করলেন। বৈষ্ণবযজ্ঞ পালনের সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, অর্জুনকে না মেরে তিনি পা ধোবেন না এবং পানি খাবেন না। আর আসুরব্রত পালনের সময় প্রতিজ্ঞা করলেন, অর্জুন মরার আগ পর্যন্ত তিনি যতদিন এই ব্রত পালন করবেন, সেই সময়ে তার সাথে দেখা করে যে যা চাইবে, তাই তিনি দিয়ে দিবেন।

কর্ণের দানশীলতার পরীক্ষা নিতে প্রথমে এলেন কৃষ্ণ। তিনি এসেছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। এসে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস খেতে চাইলেন। কর্ণ অম্লান বদনে নিজেই ছেলেকে মারলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে তার মাংস খেতে দিলেন। তখন কৃষ্ণ আবার বৃষকেতুকে নবজীবন দান করলেন।

পরে তার দানশীলতা পরখ করতে ইন্দ্রও আসলেন। তিনিও ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসলেন। তিনি এসে কর্ণের গলার আর কানের কবজ-কুণ্ডল চেয়ে বসলেন। কর্ণও দ্বিধাহীনচিত্তে তার শরীরের এই দুইটি অংশ কেটে দিয়ে দিলেন। সেদিন সকালেই অবশ্য সূর্য এর জন্য তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার দানশীলতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই স্থির করেছিলেন। কবজ ও কুণ্ডল কেটে দান করায় তার নাম হলো 'বৈকর্তন' ও 'কর্ণ'। আর তার এই দানশীলতায় ইন্দ্র খুশি হয়ে তাকে একটা বর চাইতে বললেন। তখন কর্ণ তার কাছ থেকে অর্জুন-বধের জন্য একাগ্নী শক্তি চেয়ে নিলেন।

দানশীলতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য কর্ণ এমনকি নিজের ক্ষতি করেও দান করেছিলেন। নিজের শরীরের অঙ্গ কেটে তো দান করেছিলেনই, এমনকি নিজের পুত্রকেও নিজ হাতে মেরেছিলেন দান করবেন বলে। সেজন্য অতি দানশীল ব্যক্তিদের বলা হয় দাতা কর্ণ। আবার তাই কেউ যখন নিজের ক্ষতি করেও দান-খয়রাত ও অন্যকে সাহায্য করা অব্যাহত রাখে, তখন তাকে ব্যঙ্গ করেও 'দাতা কর্ণ' বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কুরুক্ষেত্র

অর্থ : তুমুল কলহ

কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পরে চন্দ্র বংশের রাজা কুরু-র নামে এই জায়গার নাম হয় কুরুক্ষেত্র। তিনি নাকি এক সময় দিনরাত এখানে হালচাষ করতেন। সব সময়। তাই দেখে ইন্দ্র একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে সারা দিন ওখানেই থাকে কেন? উত্তরে কুরু বললেন, ওই ক্ষেত্রে, মানে কুরুক্ষেত্রের মাঠে যে মারা যায়, সেই নাকি সরাসরি স্বর্গে যায়। খবর শুনে দেবতাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। স্বর্গে যাওয়া যদি এতই সোজা হয়ে যায়, তাহলে তো আর তারা যজ্ঞও পাবেন না, পূজা-অর্চনাও পাবেন না। তখন তারা সবাই মিলে ইন্দ্রকে গিয়ে ধরলেন, একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

ইন্দ্র অনেক ভেবেচিন্তে শেষে কুরুকে গিয়ে বললেন, তোমার আর এভাবে হালচাষ করার দরকার নেই। তারচেয়ে বরং আমি তোমাকে এক বর দিচ্ছি। যে লোক এই ক্ষেত্রে উপবাস করে মরবে, কিংবা যুদ্ধে মারা যাবে, সে সরাসরি স্বর্গে যাবে। ইন্দ্র বলেছে বলে কথা! রাজা কুরু-ও রাজি হয়ে গেলেন।

তবে এই কুরুক্ষেত্র বিখ্যাত মূলত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধটি হয়েছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে। এই রাজা কুরুর বংশধরদেরই মূলত কৌরব বলা হতো। সে বংশের দুই সৎ ভাই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা হয় এই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বংশধরদের মধ্যে। ফলে কুরুবংশও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে। ধৃতরাষ্ট্রের বংশধররা তখনো কৌরব নামেই পরিচিত হতেন। আর পাণ্ডুর বংশধরদের থেকে শুরু হলো পাণ্ডব বংশ। ওই যুদ্ধের সময় অবশ্য পাণ্ডু বেঁচে ছিলেন না। তবে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বেঁচে ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের উপস্থিতিতেই তার ছেলেরা পাণ্ডুর ছেলেদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে শুরু করেছিল। ধৃতরাষ্ট্র সেসব সমর্থন করতেন না বটে, কিন্তু সেসব থামাতেও পারেননি। শেষে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দখল নিয়ে তাদের এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। এই কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবরা এক ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তাতে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর মোট ১০৫ ছেলে তো বটেই, কুরুবংশের সকলেই যোগ দিলেন। যোগ দিলেন আশেপাশের সকল রাজ্যের রাজারাও। কুরুক্ষেত্রে ১৮ দিনব্যাপী এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। সেই যুদ্ধে প্রতিদিনই দুপক্ষের হাজার হাজার লাখ লাখ সৈন্য মারা যেতে লাগল। যুদ্ধশেষে দুই পক্ষ মিলিয়ে বেঁচে ছিল মাত্র দশজন। পাণ্ডবদের সাতজন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি। আর কৌরবদের মাত্র তিনজন—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা।

www.pathagar.com

কুরুক্ষেত্রের সেই যুদ্ধ থেকেই তুমুল কলহ, মানে ভীষণ ঝগড়া লাগলেই বলা হয়, ওদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে।

শিখণ্ডী খাড়া করা

অর্থ : কারো আড়ালে থেকে অন্যায় কাজ করা

শিখণ্ডীর আসল নাম অম্বা। অম্বা ছিলেন দ্রুপদরাজের বড় মেয়ে। দ্রুপদরাজের তিন মেয়ে ছিল—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য দ্রুপদরাজ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিলেন। ভীষ্ম সেই সভা থেকেই দ্রুপদরাজের তিন মেয়েকে তুলে নিয়ে আসেন।

কিন্তু ভীষ্ম নিজে তাদের বিয়ে করেননি। কারণ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, চিরকুমার থাকবেন। তিনি দ্রুপদরাজের মেয়েদের অপহরণ করেছিলেন তার ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য। অপহরণ করে তিনি তার সঙ্গেই তিন বোনের বিয়ের আয়োজন করলেন। বেঁকে বসলেন বড় বোন অম্বা। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল শাল্বরাজের। তিনি আগেই মনে মনে শাল্বরাজকে তার স্বামী হিসেবে বরণ করেছিলেন। সে কথা শুনে, ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিয়ে দিলেন। আর অম্বাকে পাঠিয়ে দিলেন শাল্বরাজের কাছে।

কিন্তু শাল্বরাজ এবার আর অম্বাকে গ্রহণ করলেন না। কারণ, ভীষ্ম তাকে অপহরণ করেছিলেন। রাগে-দুঃখে শাল্বরাজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পরলেন অম্বা। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হলো, তার এই দুর্গতির জন্য ভীষ্মই দায়ী। ভীষ্ম যদি তাকে তাদের তিন বোনের স্বয়ংবর সভা থেকে অপহরণ না করতেন, তাহলে তো আর তার এই দুর্গতি হয় না। তখন তিনি সোজা গেলেন ভীষ্মের অস্ত্রগুরু পরশুরামের কাছে, তার এই দুর্গতির প্রতিকারের জন্য। পরশুরামও সব শুনে ভীষ্মকে আদেশ করলেন, অম্বাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু ভীষ্ম আবার অনেক আগেই কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন। গুরুর আদেশেও তিনি তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে রাজি হলেন না। মানে, তিনি গুরুর আদেশ অমান্য করলেন। তাতে গুরু পরশুরামও ক্ষেপে উঠলেন। তাই নিয়ে লেগে গেল গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ। ভীষণ সে যুদ্ধ চলল টানা তেইশ দিন। তবু কেউ কাউকে হারাতে পারলেন না। শেষে নারদ আর পরশুরামের বাবা এসে তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করলেন।

কিন্তু অম্বা তো কোনো প্রতিকার পেলেন না। তখন তিনি নিজেই যুদ্ধে ভীষ্মকে মারার প্রতিজ্ঞা করলেন। সেজন্য শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে ঘুরে তপস্যা করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন চলে

www.pathagar.com

এলেন গঙ্গাতীরে। গঙ্গায় স্নান করলেন। তখন গঙ্গাদেবী তার তপস্যার কারণ জানতে চাইলেন। অম্বা গঙ্গাদেবীকে তার অভাব-অভিযোগের কথা খুলে বললেন। গঙ্গাও সব বুঝলেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ভীষ্ম এই গঙ্গারই ছেলে। তিনি অম্বার অভিযোগের কোনো সুরাহা তো করলেনই না, উল্টো অম্বাকে বেশ খানিক্ষণ তিরস্কার করলেন। মানে বকাঝকা করলেন আরকি। তাকে তার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করারও পরামর্শ দিলেন।

গঙ্গার কাছে বিফল হয়ে অম্বা এবার শিবের তপস্যা শুরু করলেন। এক সময় শিব সন্তুষ্টও হলেন। তাকে বর চাইতে বললেন। অম্বা ভীষ্মকে হত্যার সঙ্কল্পের কথা জানালেন। শিব তখন তাকে ভীষ্মহত্যার বর দিলেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, পরজন্মে অম্বা নারী হিসেবে জন্মাবে ঠিকই। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি পুরুষে রূপান্তরিত হবেন। সেই পুরুষ রূপে তিনি যোদ্ধা হিসেবে ভীষ্মকে হত্যা করবেন।

ওদিকে আবার দ্রুপদরাজের তখন কোনো সন্তান হচ্ছিলো না। তিনিও তখন সন্তান-কামনায় শিবের তপস্যা করছিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাকে সন্তান দিলেন। তবে বলে দিলেন, দ্রুপদরাজের মেয়ে হবে। সেই মেয়েই পরে পুরুষে রূপান্তরিত হবে। সেই বরে দ্রুপদরাজের এক মেয়ে হলো। শিবের কথা মেনে, তিনি সেই মেয়েকে ছেলের মতো করে মানুষ করতে লাগলেন। ছেলে সন্তানের জন্য যেসব রীতি, সেগুলো পালন করতে লাগলেন। ছেলে হিসেবেই তার নাম রাখা হলো—শিখণ্ডী। এমনকি তাকে দশার্ণের রাজা হিরণ্যবর্মার মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দেয়া হলো।

কিছুদিনের মধ্যেই শিখণ্ডীর স্ত্রী টের পেয়ে গেলেন, তার স্বামী আসলে ছেলে নয়। তাই নিয়ে বেধে গেল তুমুল হৈচৈ। হিরণ্যবর্মা এর শোধ নিতে দ্রুপদরাজের সাথে যুদ্ধে নামলেন। দুঃখে-অপমানে শিখণ্ডী রাজ্য ছেড়ে বনে চলে গেলেন।

শিখণ্ডী যে বনে গেলেন, তাতে বাস করতো এক যক্ষ। নাম স্থূণাকর্ণ। সে ছিল কুবেরের অনুচর। সে শিখণ্ডীর সব শুনে, কিছুদিনের জন্য শিখণ্ডীর সঙ্গে নারীত্ব-পুরুষত্ব অদলবদল করতে রাজি হলো। মানে কিছুদিনের জন্য পুরুষ স্থূণাকর্ণ নারী বনে গেলেন, আর নারী শিখণ্ডী হয়ে গেলেন পুরুষ। পুরুষত্ব পেয়ে শিখণ্ডীও বাবার রাজ্যে ফিরে এলেন, বাবাকে যুদ্ধে সহায়তা করতে। এরই মধ্যে কুবের এসে স্থূণাকর্ণের স্ত্রী রূপ দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। শিখণ্ডীর কাহিনি শুনেও শান্ত হলেন না। উল্টো স্থূণাকর্ণকে অভিশাপ দিলেন, স্থূণাকর্ণ আজীবন স্ত্রী হয়েই থাকবে, আর শিখণ্ডী থাকবেন আজীবন পুরুষ হয়ে।

www.pathagar.com

স্থায়ীভাবে পুরুষত্ব পেয়ে শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যা শিখলেন। রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি। পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী যুদ্ধ করলেন পাণ্ডবদের হয়ে। আর ভীষ্ম কৌরবদের হয়ে। সে যুদ্ধে ভীষ্ম ভীষণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধে নামার আগেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, প্রতিদিন যুদ্ধে পাণ্ডবদের দশ হাজার সৈন্য (পদাতিক) ও এক হাজার রথীদের (রথে চড়া সৈন্য) মারবেন।

টানা নয়দিন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন ভীষ্ম। কোনোভাবেই তাকে থামাতে না পেরে, শেষে তার কাছেই গোপনে শলা-পরামর্শ করতে আসেন পাণ্ডবরা। ততদিনে ভীষ্ম শিখণ্ডীরূপী অম্বার কথা জেনে গেছেন। যৌবনে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কোনো নারী, ক্লীব বা নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া কারো সাথে যুদ্ধ করবেন না তিনি। প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ভীষ্ম আবার ভীষণই কঠোর ছিলেন। পাণ্ডবরা তার কাছে পরামর্শের জন্য এলে, তিনি তাদেরকে যৌবনের সেই প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে দিলেন।

পরের দিন, মানে যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেই কুরুক্ষেত্রে আসলেন। ভীষ্ম তার বাবার কাছ থেকে ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। সেদিন তিনি সে বর প্রয়োগ করলেন। তারপর শুরু করলেন ভীষণ যুদ্ধ। সেদিনের যুদ্ধে এক ভীষ্মের হাতেই একে একে বধ হয়েছিল– শতানীক, ৭ জন মহারথ, ৫ হাজার রথী আর ১৪ হাজার সৈন্য।

পরে অর্জুন এলেন ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ করতে। তবে সরাসরি যুদ্ধ না করে, শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্ম তার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ছিলেন ভীষণ কঠোর। আর শিখণ্ডী মেয়ে থেকে ছেলে হয়েছেন। কাজেই ভীষ্ম তার সাথে যুদ্ধ করতে অপারগ। সেই সুযোগে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন তাকে একের পর এক বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। থেমে থাকেননি শিখণ্ডীও। তিনিও তাকে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ মারেন।

শেষ পর্যন্ত পতন ঘটে মহাবীর ভীষ্মের। আর শিবের বরে অম্বার প্রতিশোধও সম্পূর্ণ হয়। অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভীষ্মকে হত্যা করেন।

ভীষ্মকে হত্যা করার জন্য অর্জুন তথা পাণ্ডবরা শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেখান থেকেই 'শিখণ্ডী খাড়া করানো' বাগধারাটির উৎপত্তি। কারো আড়ালে থেকে, বা কাউকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে কৌশলে কোনো অপকর্ম সাধন করা হলে, তার বর্ণনায় এই বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

শরশয্যা (ভীষ্মের শরশয্যা)
অর্থ : মৃত্যুশয্যা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে টানা নয়দিন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন ভীষ্ম। কোনোভাবেই তাকে থামাতে না পেরে, শেষে তার কাছ থেকেই তাকে বধ করার কৌশল শিখে আসেন পাণ্ডবরা। তারপর সেই কৌশলের অংশ হিসেবে, শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভীষ্ম আবার মেয়ে, ক্লীব বা মেয়ে থেকে ছেলে হওয়া কারো সাথে যুদ্ধ করতেন না। আর শিখণ্ডী মেয়ে থেকে ছেলে হয়েছিলেন। সেই সুযোগটাই নিলেন পাণ্ডবরা। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে, অর্জুন তাকে একের পর এক বাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন। থেমে থাকেননি শিখণ্ডীও। তিনিও তার প্রতিশোধ নিতে, ভীষ্মকে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ মারেন। শেষে এমন অবস্থা হলো, ভীষ্মের শরীরের এমন এক আঙুল পরিমাণ জায়গাও রইল না, যেখানে অর্জুন বাণ মারেননি।

সূর্যাস্তের কিছু আগে, সারা গায়ে শরবিদ্ধ অবস্থায় ভীষ্ম মাটিতে পরলেন। কিন্তু তার শরীর ভূমি স্পর্শ করল না। কারণ, তার সারা গায়ে বিঁধে থাকা সেই শরগুলো। কেবল তার মাথাটা ঝুলে রইল। তখন তিনি মহাবীর অর্জুনকে বললেন, এর একটা বিহিত করতে। প্রথমে অন্যরা তাকে একটা বালিশ এনে দিল। তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। কোনো মহাবীর নিশ্চয়ই যুদ্ধের ময়দানে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে পারেন না। তখন অর্জুন এসে, ওখানে তিনটা বাণ মেরে তার জন্য শরের বালিশ বানিয়ে দিলেন। ভীষ্ম তাতে মাথা রেখে এই শরশয্যায় শুয়ে রইলেন।

কিন্তু তখনই মারা গেলেন না ভীষ্ম। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সেই শরশয্যায় শুয়ে রইলেন টানা আটান্ন দিন। কারণ, তিনি তার ইচ্ছামৃত্যু বর প্রয়োগ করে ঠিক করেছিলেন, সূর্যের উত্তরায়ণের সময় হলে তিনি মারা যাবেন। কিন্তু তখন চলছিল সূর্যের দক্ষিণায়ণ।

ভীষ্ম মৃত্যুর অপেক্ষায় সেই শরশয্যায় শুয়ে রইলেন। আর দলে দলে লোক তাকে দেখতে আসতে লাগল। এল সমাজের সকল স্তরের মানুষ। এমনকি গণিকা, নট-নটীরাও এল তাকে শেষ বারের মতো দেখতে। এক ফাঁকে কর্ণও এসে তার আগের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে, তার পায়ের ধুলা নিয়ে গেলেন।

এরই মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়লাভ করলেন। পরে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে ভীষ্মের সাথে দেখা করতে এলেন। এসে অনুরোধ করলেন, রাজ্য চালনার বিষয়ে পাণ্ডবদের কিছু পরামর্শ দিতে। কিন্তু

www.pathagar.com

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভীষ্ম ঠিকমতো কথাই বলতে পারছিলেন না। তখন কৃষ্ণ বর দিলেন। তাতে ভীষ্মের সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। আর ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডবকে কাহিনির পর কাহিনি বলে মোক্ষ, রাজ্য, ধর্ম ও তীর্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। উপদেশ দিলেন টানা কয়েকদিন ধরে। ভীষ্মের এই সব উপদেশমূলক কাহিনি নিয়েই মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব।

এরপরে পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। তার কিছুদিন পরে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হলো। ভীষ্মের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে দেখে, তারা আবার ভীষ্মের শরশয্যার কাছে ফিরে এলেন। ব্যাস, নারদ, অসিতদেবলসহ অনেকে তখনো সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানেই অবস্থান করছিলেন অসংখ্য রাজারাজড়ারাও। তাদের সবার উপস্থিতিতে, টানা আটান্ন দিন শরশয্যায় কাটিয়ে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেহত্যাগ করলেন ভীষ্ম।

ভীষ্মের এই শরশয্যার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার মতো যখন কারো অবস্থা হয়, রোগে-অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কেউ যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, তখন বলা হয়, সে শরশয্যায় (ভীষ্মের শরশয্যায়) শুয়ে আছে।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ (অশ্বত্থামা হত)
অর্থ : সত্য গোপন করে কাজ উদ্ধার

দ্রোণ ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের ছেলে। পরে অগ্নির ছেলে অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে তিনি অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অগ্নিবেশ্য মুনির কাছ থেকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রও পান। পরে মহর্ষি শরদ্বানের মেয়ে কৃপীকে বিয়ে করেন দ্রোণ। তাদের এক ছেলেও হয়। সেই ছেলে জন্মের পরপরই ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবার মতো চেঁচিয়ে ওঠে। তাই তার নাম দেয়া হয় অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামার জন্মের পর দ্রোণ মহেন্দ্রপর্বতে পরশুরামের কাছে গিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে ধনরত্ন আর অস্ত্রশস্ত্র চাইতে। কিন্তু পরশুরাম তার আগেই তার সব ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের আর কশ্যপকে দিয়ে দিয়েছিলেন। ধনরত্ন না পেয়ে, দ্রোণ পরশুরামের সকল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলেন।

দ্রোণের বাবা ভরদ্বাজের বন্ধু ছিলেন পাঞ্চালের রাজা পৃষত। তাই পৃষতের ছেলে দ্রুপদের সাথে ছেলেবেলায় দ্রোণের বেশ ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে সময় দ্রুপদ একবার দ্রোণকে বলেছিলেন, রাজা হওয়ার পর, তার অর্ধেক রাজত্ব তিনি দ্রোণকে দিয়ে দিবেন।

www.pathagar.com

পরে তারা দুজনেই বড় হলেন। পৃষতের পর দ্রুপদ হলেন পাঞ্চালের রাজা। আর গরিব ভরদ্বাজের ছেলে দ্রোণ গরিবই রইলেন। একবার এই দ্রোণ দারিদ্র্যের গঞ্জনা সইতে না পেরে, চলে গেলেন দ্রুপদের কাছে। তাকে তার ছোটবেলার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। কিসের কী! দ্রুপদ উল্টো তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন।

পরে ভীষ্ম দ্রোণের কথা জানতে পারলেন। তাকে কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষার আচার্য হিসেবে নিয়োগ করলেন। দ্রোণের নাম হলো দ্রোণাচার্য। কুরু-পাণ্ডব মিলিয়ে তার ১০৫ শিষ্যদের মধ্যে তার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন অর্জুন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য তিনি, এমনকি গুরুদক্ষিণার নাম করে একলব্যের বুড়ো আঙুলই কেটে নিয়েছিলেন। আর বাকি শিষ্যদের কাছে গুরুদক্ষিণা হিসেবে চেয়েছিলেন, দ্রুপদের রাজ্য। তখন তার শিষ্যরাও পাঞ্চাল রাজ্য দখল করে তাকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে দিলেন। তখন দ্রোণ অবশ্য দ্রুপদকে তার রাজ্যের অর্ধেকটা ফিরিয়ে দিলেন। আর নিজে অর্ধেকটা রাজ্য রেখে, দ্রুপদের সমান হয়ে, তার সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

তবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ তার প্রিয় শিষ্যদের পক্ষে যোগ দিতে পারলেন না। তিনি তখন কৌরবদের ঘরে থাকেন, কৌরবদেরই খান। কাজেই তাকে কৌরবদের পক্ষেই যোগ দিতে হলো। যুদ্ধে দ্রোণ ব্যাপক বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। যুদ্ধের সপ্তম দিনে তার হাতে শঙ্খের মৃত্যু হলো। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম মারা গেলে, এগার দিনের দিন কৌরবদের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। তারপর আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলেন। তের-তম দিনে চক্রব্যূহ তৈরি করে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুকে হত্যা করলেন। চোদ্দ দিনের দিন তার হাতে মারা গেলেন রাজা বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু ও ক্ষত্রধর্মা। পনের দিনের দিন তার হাতে মারা গেলেন দ্রুপদ ও বিরাট। অর্জুনের সাথেও তার ভীষণ যুদ্ধ হলো। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হলেন তাকে হারাতে।

কারণও অবশ্য ছিল। অস্ত্র হাতে দ্রোণ ছিলেন অজেয়। দ্রোণ অস্ত্র হাতে নিলে, কোনো দেবতাও তাকে হারাতে পারতেন না। স্বয়ং ইন্দ্রও পারতেন না। কাজেই পাণ্ডবরা তাকে হারানোর উপায় বের করতে পরামর্শ সভায় বসলেন। কৃষ্ণ বুদ্ধি দিলেন, দ্রোণকে মারতে হলে, আগে তার হাত থেকে অস্ত্র সরাতে হবে। তার জন্য বুদ্ধিও বাতলে দিলেন তিনি। দ্রোণকে তার ছেলে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

পাণ্ডবরা না হয় সেটা বলল। কিন্তু তিনি সে কথা বিশ্বাস করবেন কেন! তারও অবশ্য একটা উপায় বের হলো। মিথ্যাটা বলতে হবে যুধিষ্ঠিরকে। কারণ, যুধিষ্ঠির ছিলেন ভীষণ সত্যবাদী। তিনি কখনোই মিথ্যা কথা বলতেন

www.pathagar.com

না। আর তাই তার কথা অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, যুধিষ্ঠির তো মিথ্যা বলেন না। তখন তার জন্যও একটা বুদ্ধি বের করা হলো। মালবের রাজা ইন্দ্রবর্মার একটা হাতি ছিল, নাম অশ্বত্থামা। সময় মতো সেই হাতিটাকে মারা হবে। তাহলে যুধিষ্ঠিরকেও আর মিথ্যা বলতে হবে না। কেবল খানিকটা সত্য গোপন করলেই চলবে।

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও, যুধিষ্ঠির রাজি হলেন। পরদিন, মানে যুদ্ধের পনের দিনের দিন ভীম গদার আঘাতে অশ্বত্থামা নামের হাতিটাকে হত্যা করলেন। তারপর সেই খবর দিলেন দ্রোণকে। দ্রোণ ভীমের কথা বিশ্বাস করলেন না। ঠিকই গিয়ে আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন। যুধিষ্ঠির অবশ্য পুরোপুরি সত্য গোপন করতে পারলেন না। তবে সত্যটা খানিকটা কৌশলে এমনভাবে বললেন, তাতে সত্য গোপনের কাজই হলো। মানে, এক রকম ওই মিথ্যা বলাই হলো, কিন্তু মিথ্যা বলার দোষ হলো না। দ্রোণ অশ্বত্থামার মৃত্যুর খবর জিজ্ঞেস করলে প্রথমে জোরে জোরে বললেন, "অশ্বত্থামা হতঃ", মানে—অশ্বত্থামা মারা গেছে। পরে অস্ফুটস্বরে বললেন, "ইতি গজঃ", মানে—কিন্তু সে অশ্বত্থামা আসলে হাতি। (অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ—অশ্বত্থামা নিহত, অবশ্য হাতি।)

কিন্তু যুদ্ধের রণ-ঝনঝনানির মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পরের কথাগুলো দ্রোণ আর শুনতে পেলেন না। তিনি জানলেন, তার ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে। শোকে-দুঃখে তিনি অস্ত্র ছেড়ে, রথের উপরেই যোগাসনে বসে পরলেন। বিষ্ণুর ধ্যান শুরু করলেন। পাণ্ডবরাও সেই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। কাছেই ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। তিনি এসে, দ্রোণের রথে উঠে, চুলের মুঠি ধরে, খড়্গের এক ঘায়ে ধড় থেকে দ্রোণের মাথা আলাদা করে দিলেন। ছুঁড়ে দিলেন কৌরব সৈন্যদের সামনে।

এভাবে সত্য গোপন করে কাজ উদ্ধার করা হলে, দ্রোণের মৃত্যুর প্রসঙ্গটা টেনে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করা হয়।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল, শল্য হলো রথী

অর্থ : ভীষণ যোগ্য বা অনেক ক্ষমতাবান লোকজন যে কাজে ব্যর্থ হয়, কম যোগ্য বা কম ক্ষমতাবান কোনো লোকের সে কাজে উদ্যত হওয়া

সমার্থক প্রবাদ : চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি জ্বালে বাতি; হাতি-ঘোড়া গেল তল, পিঁপড়া বলে কত জল

সুমালী রাক্ষসের স্ত্রী কেতুমতী। তাদের দশ ছেলে। তাদেরই একজন সংহ্লাদ। এই সংহ্লাদ পরে শল্য হয়ে জন্ম নিয়ে মদ্র দেশের রাজা হন। ভীষ্ম এই শল্যের

www.pathagar.com

বোন মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে দেন। এভাবেই কুরুবংশের সঙ্গে শল্যের আত্মীয়তা সৃষ্টি হয়।

পরে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছেলেদের মধ্যে, মানে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে বিরোধ থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হলে, শল্য প্রথমে ঠিক করেছিলেন, এই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার সেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। যুদ্ধের আগে দুর্যোধন তাকে ডেকে নিয়ে, এমন আদর-আপ্যায়ন করে যে, শল্য তাকে কথা দিয়ে বসেন, তিনি কৌরবদের পক্ষেই যুদ্ধ করবেন। অবশ্য যুদ্ধের আগে শল্য পাণ্ডবদের সাথেও দেখা করেছিলেন। তাদের আশীর্বাদও করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে এমনকি যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদও করেছিলেন। সাথে তাকে আরো কথা দিয়েছিলেন, কর্ণের সারথী হলে, তিনি যুধিষ্ঠিরদের সহায়তা করবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষেই ভয়ানক সব বীর যোদ্ধারা যোগ দিয়েছিলেন। দুই পক্ষেরই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন একেক জন মহাবীর। যুদ্ধের শুরুতে কৌরবদের বিশাল বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মহাবীর ভীষ্ম। তিনি প্রথম দশ দিন সে দায়িত্ব পালন করলেন। যুদ্ধের দশম দিনে অর্জুনের হাতে মারা গেলেন ভীষ্ম। অবশ্য সে জন্য অর্জুনকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। তিনি যুদ্ধে শিখণ্ডীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করে ভীষ্মকে পরাস্ত করলেন। পরদিন, মানে এগার দিনের দিন কৌরবদের সেনাপতি পদে বরণ করা হলো মহাবীর দ্রোণকে। এই দ্রোণও ছিলেন মহাবীর। তিনি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামলে, তাকে এমনকি ইন্দ্রও পরাস্ত করতে পারতেন না। তাকে মারতেও পাণ্ডবরা কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেন। তার ছেলের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ শুনিয়ে, তাকে হত্যা করলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর, যুদ্ধের ষোল দিনের দিন, কৌরবদের সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন কর্ণ। এই কর্ণও মহাবীর ছিলেন। সেনাপতি হওয়ার আগেই, অর্জুন ছাড়া বাকি চার পাণ্ডবকেই তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু কর্ণ আবার তার মা কুন্তীকে কথা দিয়েছিলেন, অর্জুন ছাড়া কোনো পাণ্ডবকেই তিনি হত্যা করবেন না। শেষে, যুদ্ধের আঠার দিনের দিন অর্জুনের সাথে কর্ণের ঠোকাঠুকি হয়। এবার অবশ্য কর্ণ পরাস্ত হলেন। কর্ণের পরাজয়েরও একটা অন্য কারণ ছিল। কর্ণ অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন পরশুরামের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি প্রথমে অস্ত্রশিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন দ্রোণের কাছে। তিনি নিচুজাতের সূতপুত্র, মানে ছুতারের ছেলে বলে, দ্রোণ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে কর্ণ পরশুরামের কাছে গিয়ে নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে, অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা নিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

তো একদিন, গুরু পরশুরাম শিষ্য কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরেছিলেন। তখন ইন্দ্র চিন্তা করলেন, কর্ণের পরিচয়ের ফাঁকিটা পরশুরামের কাছে ধরিয়ে দিবেন। তাই তিনি একটা পোকার রূপ ধরে, কর্ণের উরু ফুটো করতে শুরু করলেন। সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণাও কর্ণ দাঁতে দাঁত চেপে সইতে লাগলেন, কিন্তু একটুও নড়লেন না। কোনোভাবেই পরশুরামের ঘুমে একটুও ব্যাঘাত ঘটতে দিলেন না। ঘুম থেকে উঠে, কর্ণের সহ্যশক্তি দেখে পরশুরাম রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। তখনই তার সন্দেহ হলো। কারণ, কোনো ব্রাহ্মণের ছেলের সহ্যশক্তি এত বেশি হতে পারে না। তখন কর্ণও স্বীকার করলেন, তিনি গুরুর কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। তাই শুনে পরশুরাম ক্ষেপে গিয়ে, কর্ণকে অভিশাপ দিলেন, কপট উপায়ে তার কাছ থেকে কর্ণ যে অস্ত্রশিক্ষা নিয়েছেন, মোক্ষম সময়ে তার সবই ভুলে যাবেন। সে অভিশাপই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের কাল হয়ে দাঁড়াল। আঠার দিনের দিন, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ অস্ত্রশিক্ষার সবই ভুলে গেলেন। তখন অর্জুন অঞ্জলিক বাণ ছুঁড়ে কর্ণের মাথা কেটে নিলেন।

এভাবে কৌরবদের তৃতীয় সেনাপতি মহাবীর কর্ণও মারা গেলেন। সেদিনই কৌরবদের নতুন সেনাপতি করা হয় কর্ণের সারথী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শল্যকে।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণদের মতো মহাবীরদের তুলনায় শল্য বীরের কাতারেই পরেন না। কার্যতও তাই ঘটে। তিনি পুরো একটা দিনও সেনাপতিত্ব করতে পারলেন না। সেদিনই তিনি মারা গেলেন। তার সেনাপতিত্বের মেয়াদ হলো মাত্র আধা দিন। সেদিনের যুদ্ধে এমনকি কর্ণের যে কয়জন ছেলে বেঁচে ছিলেন, তাদের সবাই, এমনকি শল্যের নিজের ছেলেরাও মারা যান। অবশ্য শল্যের হিসেবে সেদিনের যুদ্ধে শল্য ভালোই বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেছিলেন। বার কয়েক নকুল ও সহদেবকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণদের বীরত্বের তুলনায় সেসব নিতান্তই তুচ্ছ কাহিনি।

এভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মতো মহাবীররা ব্যর্থ হওয়ার পর, কৌরবদের সেনাপতি হয়ে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে আসেন শল্য। ওই হাতি-ঘোড়া তলিয়ে যাওয়ার পর, পিঁপড়ার এসে 'জল কতটুকু?' জিজ্ঞেস করার মতো ব্যাপার আরকি। সে রকম, ভীষণ যোগ্য বা অনেক ক্ষমতাবান লোকজন কোনো কাজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার পর, কম যোগ্য বা কম ক্ষমতাবান কোনো লোক সেই কাজ করতে উদ্যত হলে, শল্যের সেনাপতি হওয়ার সেই ঘটনাকে স্মরণ করে বলা হয়—ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল, শল্য হলো রথী।

www.pathagar.com

সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ?
অর্থ : মহা শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির সঙ্গে আরেক মহা শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির বন্ধুত্ব বা জোট পাকানো

পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অর্জুন ছিলেন তৃতীয়। তবে পাণ্ডবদের মধ্যে ধনুর্বিদ্যায়-অস্ত্রচালনায় তিনিই ছিলেন সেরা। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় একাগ্রতাতেও তিনি সকলের সেরা হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঁচটি বাণ একই লক্ষ্যে ছোঁড়ার শর্ত তিনিই পূরণ করেছিলেন। পরে অবশ্য মা কুন্তীর অসাবধানে বলে ফেলা কথা রাখতে গিয়ে, তারা পাঁচ ভাই-ই দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন।

দ্রৌপদীর গর্ভে অর্জুনের এক ছেলে হয়—শ্রুতকর্মা। পরে অর্জুন নাগকন্যা উলূপী ও মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেন। আবার দ্বারকা গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় রূপ দিতে অর্জুন কৃষ্ণের বোন সুভদ্রাকে বিয়ে করেন। উলূপীর গর্ভে ইরাবান, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন এবং সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। পরের এই বিয়েগুলোর জন্য দ্রৌপদী অবশ্য খানিকটা অভিমানও করেছিলেন। তাদের পাঁচ ভাইকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেও, অর্জুনের প্রতি তার ভালোবাসা একটু বেশিই ছিল। কারণ, স্বয়ংবর সভায় বীরত্ব দেখিয়ে অর্জুনই তাকে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আর সেই বীরত্ব দেখে দ্রৌপদীর মধ্যে সত্যিকার অর্থেই অর্জুনের প্রতি মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল।

অর্জুনের প্রতি মুগ্ধতা কেবল দ্রৌপদীরই নয়, দেবতাদের মধ্যেও ছিল। তার উপর দেবতাদের আশীর্বাদও ছিল প্রচুর। এমনকি তাকে দেবতারা অস্ত্রশস্ত্রও নিতান্ত কম দেননি। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আবার তিনি যুদ্ধে জিতেও পেয়েছিলেন। পাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যার গুরু দ্রোণাচার্য তাকে ব্রহ্মশির নামে এক অমোঘ অস্ত্র দিয়েছিলেন। গন্ধর্বের রাজা অঙ্গারপর্ণকে হারিয়ে তিনি পেয়েছিলেন চাক্ষুষীবিদ্যা। এই বিদ্যা থাকলে যে কোনো বস্তুই দেখা যায়।

আবার দুর্যোধন-শকুনির ষড়যন্ত্রে পাশাখেলায় হেরে পাণ্ডবরা যখন বনবাসে গেলেন, তখন অর্জুন সেখান থেকে হিমালয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। পথে এক কিরাতের সাথে তার ভীষণ লড়াই হলো। পরে তিনি জানতে পারলেন, সেই কিরাত আসলে স্বয়ং শিব। তখন তিনি লড়াই বাদ দিয়ে শিবের তপস্যায় বসে গেলেন। শেষে শিব তার উপর সন্তুষ্ট হলেন। তাকে পাশুপত অস্ত্রও দিলেন। পরে সে যাত্রায় তার সাথে দেখা হলো ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যমের সাথে। তারাও সবাই তাকে তাদের সেরা অস্ত্র দান করলেন।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন স্বয়ং অর্জুনের বাবা। পাণ্ডবদের মা কুন্তীকে দুর্বাসা মুনি এক অমোঘ মন্ত্র দিয়েছিলেন। সে মন্ত্রের জোরে তিনি যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন। সেই বরে, কুন্তী ইন্দ্রকে আহ্বান করলে, তাদের সন্তান হিসেবে অর্জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছেলেকে কাছে পেয়ে ইন্দ্র তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি গন্ধর্বের রাজা চিত্রসেনের কাছে কয়েক বছর থেকে, নাচগানে দীক্ষা নিলেন। সে সময় উর্বশী তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলেও, তিনি উর্বশীকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন উর্বশী তাকে অভিশাপ দিলেন, এক বছরের জন্য অর্জুন নপুংসক হয়ে জীবনযাপন করবেন। এই অভিশাপেই অর্জুন অজ্ঞাতবাসের এক বছর নপুংসক ছিলেন।

স্বর্গে থাকার এই সময়ে অর্জুন ইন্দ্রের কাছেও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করলেন। পরে ইন্দ্রের গুরুদক্ষিণা হিসেবে তিনি নিবাতকবচদের ধ্বংস করলেন। এই নিবাতকবচরা ছিল সংখ্যায় তিন কোটি। ব্রহ্মার উপাসনা করে এরা সাগরের তলদেশে বাস করার অধিকার পেয়েছিল। সঙ্গে বর পেয়েছিল, দেবতারাও তাদের মারতে পারবে না। তখন অর্জুন গিয়ে একাই এই তিন কোটি দানবদের ধ্বংস করলেন। সঙ্গে তাদের আস্তানাও একেবারে গুঁড়িয়ে দিলেন। পরে কালকেয় দানব আর পৌলোম রাক্ষসদেরও মারলেন অর্জুন। এরা দুই দলই ছিল সংখ্যায় ষাট হাজার করে। কালকেয় দানবরা ছিল মূলত কালকার সন্তান। আর পৌলোম রাক্ষসরা পুলোমার। এই কালকা ও পুলোমা ছিল দুই বোন। বৈশ্বানর তার এই দুই মেয়ের মধ্যে কালকার বিয়ে দেন কশ্যপের সাথে, পুলোমার বিয়ে দেন মারীচের সাথে। এই কশ্যপ-কালকার ষাট হাজার সন্তান কালকেয় দানব এবং মারীচ-পুলোমার ষাট হাজার সন্তান পৌলোম রাক্ষস নামে পরিচিত।

এসব কাজের পুরস্কার হিসেবে ইন্দ্র অর্জুনকে অভেদ্যবিদ্যকবচ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং দিব্যবস্ত্র-আভরণ দিলেন। সব মিলিয়ে অর্জুন এমনিতেই পাণ্ডবদের মধ্যে অস্ত্রচালনায় ছিলেন সবার সেরা। তার উপর দেবতাদের কাছ থেকে এসব অস্ত্র আর বিদ্যা পেয়ে, তিনি হয়ে ওঠেন যুদ্ধে অজেয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তিনি ছিলেন অন্যতম সেরা বীর। তার উপর সে যুদ্ধে তার সঙ্গে আরো যুক্ত হলেন স্বয়ং কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ সম্পর্কে পাণ্ডবদের মামা হতেন। পরে অবশ্য অর্জুনের সাথে তিনি তার বোনের বিয়ে দিয়ে নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতালেন। এই কৃষ্ণ ছিলেন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। অত্যাচারী রাজা কংসকে দমন করার জন্য বিষ্ণু তার অষ্টম অবতার হিসেবে কৃষ্ণের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন। কাজেই তিনি যে

www.pathagar.com

মহাবীর ছিলেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার সেই বীরত্বের প্রমাণ মিলতে শুরু করে তার ছোটবেলা থেকেই। তিনি ছোট থাকতেই পুতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেন। পরে কংসকে বধ করার আগে একে একে কালীয় নাগকে দমন করেন, এমনকি মল্লযুদ্ধে একটা আস্ত হাতিকেও হারিয়ে দেন। পরে তার কাছে পরাস্ত হন সাগরের দৈত্য পঞ্চজন। এমনকি স্বর্গে ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্রের সাথেও তার ঠোকাঠুকি লেগে যায়। তখন যুদ্ধে এমনকি ইন্দ্রকেও হারিয়ে দেন তিনি।

যে কৃষ্ণ এমন বীর, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাকে নিয়ে যে টানাটানি পরে যাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ঘটলও তাই। কৌরব-পাণ্ডব দুই পক্ষই তাকে দলে নিতে চাইলেন। সেজন্য কৌরবদের সবার বড় দুর্যোধন চলে গেলেন কৃষ্ণের বাসায়। তার পরপরই গেলেন পাণ্ডবদের অর্জুন। কিন্তু কৃষ্ণ তখনো ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, তার পায়ের কাছে অর্জুন, আর মাথার কাছে দুর্যোধন বসে আছেন। কাজেই, ঘুম থেকে উঠে তিনি অর্জুনকেই আগে দেখতে পেলেন। আবার তিনি এটাও জানতে পারলেন, তার কাছে আসলে দুর্যোধনই আগে এসেছে।

তখন তিনি দুই পক্ষকেই সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক পক্ষের হয়ে লড়বে তার দশ কোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনারা। আরেক পক্ষের হয়ে থাকবেন তিনি। তবে আগেই বলে দিলেন, এই যুদ্ধে তিনি অস্ত্র হাতে লড়বেন না। তিনি নিজে এই যুদ্ধ সমর্থন করেন না। তাই এই যুদ্ধে তিনি অস্ত্র হাতে নেবেন না। তবে তাকে যারা নেবে, তিনি তাদের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন। আর আরেক পক্ষ পাবে তার দশ কোটি দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা। তাদের যুদ্ধ করতে কোনো বাধা নেই। অর্জুন আর দুর্যোধনকে এই দুইটি থেকে একটি বেছে নিতে হবে।

আগে অর্জুনকে দেখেছেন বলে কৃষ্ণ তাকেই আগে বেছে নেয়ার সুযোগ দিলেন। অর্জুন নিরস্ত্র কৃষ্ণকেই বেছে নিলেন। দুর্যোধন ভাগে পেল দশ কোটি নারায়ণী সৈন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র হাতে না নিলেও, কৃষ্ণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি যুদ্ধে মূলত অর্জুনের সারথী হয়েছিলেন, মানে অর্জুনের রথ চালানোর কাজ নিয়েছিলেন। তবে নামে সারথী হলেও, তিনি আসলে পুরো যুদ্ধেই অর্জুনের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর আগে অর্জুন এই যুদ্ধ নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পরেছিলেন। স্বজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। তখন কৃষ্ণ তাকে দীর্ঘ সময় ধরে উপদেশ-পরামর্শ দেন। সেগুলোই 'শ্রীভগবদগীতা' নামে সংকলিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে দুই মহাবীর একত্রে জোট বাঁধেন—অর্জুন আর কৃষ্ণ। তাদের এই যুগলবন্দির সামনে দাঁড়াতে পারেননি কৌরবদের কোনো মহাবীরই। তাদের হাতে একে একে কৌরবদের সব মহাবীরদের পতন ঘটতে থাকে। যুদ্ধের দশম দিনে পরাজিত হন মহাবীর ভীষ্ম, তিনি শরশয্যা গ্রহণ করেন। বারো দিনের দিন ভগদত্ত, চোদ্দ দিনের দিন জয়দ্রথ, পনের দিনের দিন আরেক মহাবীর দ্রোণ, ষোল দিনের দিন দণ্ডধর এবং সতের দিনের দিন কৌরবদের শেষ মহাবীর কর্ণকে বধ করেন এই যুগলবন্দি। এদের মধ্যে জয়দ্রথ সে যুদ্ধে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুকে হত্যা করেছিল।

এভাবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের বিজয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন অর্জুন-কৃষ্ণ। শেষ হয় ১৮ দিনব্যাপী এক ভয়াবহ যুদ্ধের। যে যুদ্ধে দুই পক্ষে শত শত রাজা অংশ নিয়েছিলেন, লড়েছিলেন লাখ লাখ সৈন্য আর রথী। কিন্তু সে যুদ্ধ এমনই ভয়াবহ ছিল, যে যুদ্ধ শেষে দুই পক্ষ মিলিয়ে বেঁচে ছিলেন মাত্র দশ জন। পাণ্ডবদের সাতজন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি। আর কৌরবদের মাত্র তিনজন—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা।

কৃষ্ণ তার সারথী হিসেবে না থাকলে, অর্জুনের একার পক্ষে কৌরবদের এতজন মহাবীরদের হারানোটা হয়তো সম্ভব হতো না। কৃষ্ণের উপদেশ-পরামর্শ ছাড়া জয়দ্রথ, দ্রোণ ও কর্ণকে মারা তো সম্ভবই হতো না। তাদের হারানোর ঘটনায় কৃষ্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দুজনেই ছিলেন মহাবীর, কিন্তু দুজনের যুগলবন্দি হয়েছিল বলেই, তারা হয়ে উঠেছিলেন অজেয়। এরকম, কোনো মহাশক্তিশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির সঙ্গে যদি আরেক মহাশক্তিশালী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি যুক্ত হয়, যদি একত্রে জোট বাঁধে, তখন তাদের হারানো বা তাদের সাথে পাল্লা দেয়াটা এক রকম অসম্ভবই হয়ে পরে। সে ধরনের ঘটনা ঘটলে, সে প্রসঙ্গে বলা হয়—সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ?

ভুশণ্ডির কাক (কাক ভূষণ্ডি, ভুষণ্ডি কাক, ভুশণ্ডি কাক)
অর্থ : দীর্ঘজীবী বা অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি

ভুশণ্ডির কাক বলতে আসলে 'ভুশণ্ডি'কেই বোঝায়। ভুশণ্ডি নিজেই কাক; সেখান থেকেই ভুশণ্ডির কাক। কিন্তু প্রশ্ন হল, দীর্ঘজীবী ব্যক্তিকে কেন কাক বলা হবে? কারণ, পৌরাণিক এই কাকটির বিশেষত্ব হল, সে আবহমানকাল

www.pathagar.com

জুড়ে বেঁচে আছে। আর সেই আদ্যিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে বলে সে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই জানে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হলে, এই ভুশণ্ডি কাকের সঙ্গে আলাপ হয় অর্জুনের। সে যুদ্ধে অর্জুন বেশ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। তাই নিয়ে তার অহংকারও কম ছিল না। যুদ্ধশেষে গর্বে-অহংকারে বুক ফুলিয়ে কুরুক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় তার সাথে ভুশণ্ডির কাকের দেখা হয়।

অর্জুন অবশ্য ভুশণ্ডিকে চিনতেন না। এত বড় একটা পাখিকে যুদ্ধের ময়দানে ওভাবে বসে থাকতে দেখে তার কৌতূহল হলো। তিনি গিয়ে ভুশণ্ডির নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তখন ভুশণ্ডি নিজেই তার নাম-পরিচয় বললেন। জানালেন, তিনি সেই সত্যযুগ থেকে এই পৃথিবীতে আছেন। সত্যযুগ থেকে শুরু করে সব কালের সব ঘটনারই স্বাক্ষী তিনি।

এমনিতেই অহংকারে অর্জুনের পা মাটিতে পরছিল না। তিনি আর সেই সুযোগটা ছাড়লেন না। গর্বে বুক ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো সেই সত্যযুগ থেকেই পৃথিবীতে আছেন। কুরুক্ষেত্রের মতো এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কি এর আগে কখনো হয়েছে?

শুনে ভুশণ্ডি উল্টো হায় হায় করে উঠলেন। সত্যযুগে শুম্ভ-নিশুম্ভের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে নাকি মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হয়েছিল। রক্ত খাওয়ার জন্য ভুশণ্ডিকে একটুও নড়াচড়া করতে হয়নি। তিনি স্রেফ উপরের দিকে মুখ করে হা করে বসে ছিলেন। তাতেই পেট পুরে রক্ত খেয়ে একদম টইটম্বুর হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর হলো রাম-রাবণের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে অবশ্য অমন রক্তের প্রবল বৃষ্টি হয়নি। তবে রক্তের নদী বয়ে গিয়েছিল। আগের বারের মতো আরাম করে না হলেও, ভুশণ্ডি বেশ পেট ভরে রক্ত খেতে পেরেছিলেন। আগের বার তো স্রেফ মাথা উঁচু করে হাঁ করেই রক্ত খেতে পেরে ছিলেন। এবার তাকে একটু কষ্ট করে ঘাড়টা নিচু করতে হয়েছিল, এই আরকি।

শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে ভুশণ্ডির মেজাজই খারাপ হয়ে গেল। এখানে কী লক্ষ্মীছাড়া একটা যুদ্ধ হলো, তাকে রক্ত খেতে হচ্ছে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে। ওভাবে রক্ত খেতে খেতে তার ঠোঁটই ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু তার পেট ভরল কই!

ভুশণ্ডির এসব কথা শুনে অর্জুনের গর্ব দূর হলো।

সাধারণত অতিবৃদ্ধদের বোঝাতে, যাদের মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে, এখন কেবল পড়ে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, তার কাছের লোকেরাও তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, অমন অতিবৃদ্ধদের বোঝাতে 'ভুশণ্ডির কাক' বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির
অর্থ : (ব্যঙ্গার্থে) ভীষণ সত্যবাদী

যুধিষ্ঠির ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে সবার বড়। মানে পাণ্ডুর বড় ছেলে। পাণ্ডু-কুন্তীর ছেলে হলেও, যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয় ধর্মের ঔরসে। তার জন্মের সময় দৈববাণী হয়—এই ছেলে ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। সে হবে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী। সে সব সময় সত্য কথা বলবে। আর এক সময় সারা পৃথিবীর রাজা হবে সে। সত্যি সত্যিই যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এই সবগুলো গুণই ছিল। আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে, তিনি সারা পৃথিবীর রাজা হন।

ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেও, যুধিষ্ঠির বড় বীর ছিলেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার বীরত্ব বলতে কৌরবদের শেষ সেনাপতিকে শল্যকে পরাজিত করা। তবে যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির সত্যিই মানবশ্রেষ্ঠর পরিচয় দিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে কৌরবদের মা গান্ধারী কুরুক্ষেত্রে এলে, যুধিষ্ঠির তাকে শান্ত করতে সত্যি সত্যিই তার পা ধরে বসে পড়লেন। তখন আবার গান্ধারী তার কাপড়ের ফাঁক দিয়ে যুধিষ্ঠিরের নখগুলো দেখে ফেলেছিলেন। ফলে যুধিষ্ঠিরের নখগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে দুই পক্ষের যোদ্ধাদের মৃতদেহের সৎকারের কাজ শুরু হলো। সে সময় কর্ণের মৃতদেহ দেখে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের সত্যিকারের পরিচয় জানালেন। তখনো পর্যন্ত পাণ্ডবরা জানতেন, কর্ণ নিচুজাতের সূতপুত্র, মানে ছুতারের ছেলে। কর্ণ যে আসলে তাদেরই ভাই, স্রেফ লোকলজ্জার ভয়ে তাদের মা এতদিন সে কথা চেপে রেখেছিলেন, তা শুনে যুধিষ্ঠির রীতিমতো রেগে গেলেন। রাগে-দুঃখে তিনি পুরো নারীজাতিকেই অভিশাপ দিয়ে বসলেন যে, এখন থেকে মেয়েরা আর কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না।

এরপর পাণ্ডবদের রাজত্ব গ্রহণের পালা। বড় ছেলে হিসেবে রাজা হওয়ার কথা যুধিষ্ঠিরের। কিন্তু যুধিষ্ঠির রাজা হতে অস্বীকার করলেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-পরিজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের হত্যা করে মেরে-কেটে, তারপর সিংহাসনে বসতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। তখন কৃষ্ণ-ব্যাসসহ গুরুজনরা তাকে অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে সিংহাসনে বসতে রাজি করালেন।

রাজা হয়েই আগে তিনি সবাইকে নিয়ে গেলেন কুরুক্ষেত্রে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও, সেখানে তখনো ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে ছিলেন। সেখানে গিয়ে, কৃষ্ণ ভীষ্মকে অনুরোধ করলেন, রাজ্য চালনার বিষয়ে পাণ্ডবদের কিছু পরামর্শ দিতে। কিন্তু প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভীষ্ম ঠিকমতো কথাই বলতে পারছিলেন না। তখন কৃষ্ণ তাকে বর দিলেন। সে বরে ভীষ্মের সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। আর

www.pathagar.com

ভীষ্মও যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডবকে কাহিনির পর কাহিনি বলে মোক্ষ, রাজ্য, ধর্ম ও তীর্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। উপদেশ দিলেন টানা কয়েকদিন ধরে। ভীষ্মের এই সব উপদেশমূলক কাহিনি নিয়েই মহাভারতের শান্তি ও অনুশাসন পর্ব।

সে অনুযায়ী রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য চালাতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার ভেতর আবারও সেই পুরনো অনুশোচনা ফিরে এল—যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-পরিজনদের হত্যার জন্য অনুশোচনা। তখন ব্যাসদেবের পরামর্শে, এই পাপক্ষয়ের জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে, যুধিষ্ঠির ছত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই পুরোটা সময় তিনি বিশেষ খেয়াল রাখতেন কৌরবদের বাবা-মা ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর প্রতি, যাতে তাদের সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি না হয়, যাতে তারা কোনো কষ্ট না পান।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যখন ছত্রিশ বছর চলছিল, তখন খবর আসে, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। তখন পঞ্চপাণ্ডবও বুঝতে পারলেন, তাদের কাজ শেষ হয়েছে। এবার তাদের যাওয়ার পালা। যুধিষ্ঠির রাজ্যভার বুঝিয়ে দিলেন যুযুৎসুকে। এই যুযুৎসু ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে। বয়সের হিসেবে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ছেলে হলেও, তার জন্ম হয়েছিল এক দাসীর গর্ভে। তবে কৌরবদের একশ ভাইয়ের মতো তিনি অধার্মিক ছিলেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তিনি পাণ্ডবদের পক্ষেই লড়েছিলেন। যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র সন্তান হিসেবে তিনিই বেঁচে ছিলেন। আর সিংহাসনে অভিষিক্ত করে যান পরীক্ষিৎকে। পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন ছিলেন তৃতীয়। অভিমন্যু ছিলেন অর্জুনের ছেলে, আর এই পরীক্ষিৎ অভিমন্যুর ছেলে।

তারপর পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলেন স্বর্গের পানে। উদ্দেশ্য—সশরীরের স্বর্গে যাবেন। কিন্তু পথে একে একে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই ও দ্রৌপদী, সবারই পতন ঘটল। সশরীরের স্বর্গে গেলেন কেবল একজন—একা যুধিষ্ঠির। শুধু তাই নয়, পরে ভীম এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি প্রত্যেকের পতনের কারণও বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি একদম একা সশরীরে স্বর্গে পৌঁছাননি। পথে এক কুকুর তাদের সঙ্গী হয়েছিল। সেই কুকুরও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের দ্বার অব্দি পৌঁছেছিল। কিন্তু কুকুরদের তো স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি নেই। তখন ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ওই কুকুরকে রেখেই তাকে স্বর্গে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু সেই কুকুরকে রেখে যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। প্রকৃতপক্ষে ওই কুকুরটি ছিল ছদ্মবেশধারী ধর্ম।

www.pathagar.com

স্বর্গে প্রবেশের পর যুধিষ্ঠিরকে নরক দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, তার ভাইরা সবাই নরকের আগুনে পুড়ছেন। তাই দেখে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও নরকেই থাকবেন, স্বর্গে ফিরে যাবেন না। আসলে সেটাও ছিল আরেকটা পরীক্ষা। তার সব ভাই-ই তখন স্বর্গে।

সর্বোপরি যুধিষ্ঠির ছিলেন এক সত্যিকারের অহিংস, দয়ালু, সত্যবাদী চরিত্র। কখনোই কোনো অবস্থাতেই তিনি কোনো মিথ্যা কথা বলেননি, কোনো অধর্মের কাজ করেননি। দ্রোণকে হত্যার জন্য যখন পাণ্ডবরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের কাঁধে দায়িত্ব আসে, দ্রোণকে তার ছেলের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দেয়ার। সে খবরও তিনি এমনভাবে দিয়েছিলেন, যাতে মিথ্যা বলা না হয়। তার আগে, অজ্ঞাতবাসের সময়ও তিনি নিজের পরিচয় এমনভাবে দিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি আসলে মিথ্যা বলেননি। কেবল কথাগুলো তিনি এমনভাবে বলেছিলেন, যাতে কেউ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারে। আর এসব কারণেই কেউ যখন বেশি ভালোমানুষি দেখায়, তখন তাকে বিদ্রূপ করে বলা হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

www.pathagar.com

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যদুবংশ

অর্থ : বিশাল বংশ, বহু পরিজনবিশিষ্ট বংশ, বহু বিস্তৃত পরিবার

যদু নিজে ছিলেন চন্দ্র বংশের রাজা। তার বাবা যযাতি, মা দেবযানী। যদু ছিলেন যযাতির বড় ছেলে। তবে বড় ছেলে হলেও, যদুকে যযাতি উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচিত করেননি।

রাজা যযাতির ছিল দুই স্ত্রী—দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ভে তার দুই ছেলে হয়—যদু ও তুর্বসু। আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন ছেলে—দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। দেবযানীর বাবা ছিলেন শুক্রাচার্য। একবার শর্মিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে যযাতির সাথে দেবযানীর মনোমালিন্য হলো। তখন দেবযানী স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসলেন। এসে বাবা শুক্রাচার্যের কাছে যযাতির নামে অভিযোগ করলেন। শুক্রাচার্যও রেগে গিয়ে যযাতিকে অভিশাপ দিলেন। সেই অভিশাপের ফলে যযাতি নারীসম্ভোগে অসমর্থ হয়ে পড়লেন।

তখন যযাতি শুক্রাচার্যের কাছে এসে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। শেষে শুক্রাচার্য তাকে এই অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণের একটা পথ বাতলে দিলেন। যযাতি চাইলে এই অসুখ তার কোনো ছেলেকে দিয়ে দিতে পারবেন। যযাতি এবার তার বড় ছেলে যদুর কাছে এলেন। যদুকে তার এই অসুখ নিতে বললেন। কিন্তু যদু রাজি হলেন না। তখন রেগে গিয়ে যদুকে অভিশাপ দিলেন, যদুর বংশের কাউকেই তিনি তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী করবেন না।

অবশ্য যদুর চার ছোট ভাইয়ের তিনজনই বাবার অসুখ নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। শেষ পর্যন্ত যযাতির সবচেয়ে ছোট ছেলে পুরু বাবার অসুখ নিতে রাজি হলেন। পুরুকে সে রোগ দিয়ে, যযাতি এক হাজার বছর যৌবন উপভোগ করলেন। হাজার বছর নারীসম্ভোগের পর, যযাতির উপলব্ধি হলো, ধনসম্পদ বা নারীসম্ভোগে আসলে পরিতৃপ্তি নেই। পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং সকল

www.pathagar.com

নারীকে ভোগ করলেও তৃপ্তি আসে না। তখন যযাতি পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে, তাকে রাজত্ব দিয়ে, নিজে বাণপ্রস্থ তপস্যা করতে শুরু করলেন।

ওদিকে যদুকে তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী না করলেও, তাকে রাজ্যের দক্ষিণাংশ দান করেছিলেন যযাতি। সেই রাজ্য ঘিরে যদুর থেকে এক নতুন রাজবংশের সূচনা হলো। সেই বংশেরই নাম যদুবংশ। এই যদুবংশ ছিল অনেক বড়। তাদের সময়কালও অনেক দীর্ঘ। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ-ও ছিলেন এই যদুবংশেরই সন্তান। যাকে দমন করতে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই কংস-ও ছিলেন যদুবংশের উত্তরসূরি। অবশ্য কৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই, ঋষিদের অভিশাপে, যদুবংশ ধ্বংস হয়।

একদিন যদু তার স্ত্রীদের নিয়ে জলকেলি করছিলেন। সে সময় ধূম্রবর্ণ সাপ এসে তাকে পাতালে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে গিয়ে, তিনি যদুর সঙ্গে তার পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিলেন। সঙ্গে বর দিলেন, তার বংশের সাতটি শাখা অত্যন্ত বিখ্যাত হবে। এই সাতটি শাখা হলো—ভৈম, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, যাদব, দশার্হ ও বৃষ্ণি। এই সাতটি শাখা ছাড়াও যদুবংশের আরো অনেকগুলো শাখা ছিল। সেগুলোর মধ্যে মাধব, হেহয় বা হৈহয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বংশ পরিচয়ে যদুবংশ এবং এর বিভিন্ন শাখাগুলোর দীর্ঘ বংশলতিকা পাওয়া যায়। সেখানকার তালিকা অনুযায়ী, যদুবংশের মূল বংশলতিকার ক্রমধারা হলো—যদু < বৃজিনীবান < স্বাহি < রুষদ্র < চিত্ররথ < শশবিন্দু < পৃথুযশা < পৃথুশ্রবা < তমঃ < উশনা < শিতেষু < রুক্মকবচ < পরাবৃৎ < রুক্মেষু < জ্যামঘ < বিদর্ভ < ক্রথ < কুন্তি < বৃষ্ণি < নির্বৃতি < দশার্হ < ব্যোমা < জীমূত < বংশকৃতি < ভীমরথ < নবরথ < দশরথ < শকুনি < করম্ভি < দেবরাত < দেবক্ষত্র < মধু < অনবরথ < কুরুবৎস < অনুরথ < পুরুহোত্র < অংশ < সত্বত < বৃষ্ণি < যুধাজিৎ < শিনি < সত্যক < সাত্যকি (যুযুধান) < জয়কুণি < অনমিত্র < পৃষ্ণি < চিত্ররথ < বিদুরথ < শূর < শিনি < ভোজ < হৃদিক < শূর < বসুদেব < কৃষ্ণ।

এই ক্রমধারার বাইরেও যদুবংশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরসূরি আছেন। যেমন, যদুর আরেক ছেলে ছিল সহস্রজিৎ। তার ছেলে সত্যজিৎ। সত্যজিতের তিন ছেলে—মহাহয়, বেণুহয় ও হেহয়। হেহয়ের উত্তরসূরিরাই যদুবংশের বিখ্যাত হেহয় শাখা। কার্তবীর্যার্জুন এই হেহয় শাখারই উত্তরসূরি। এই শাখা থেকেই পরে বৃষ্ণি, মাধব, ভোজ শাখাগুলো আলাদা হয়। আবার চিত্ররথের আরেক ছেলে ছিল কুকুর। তার থেকে যদুবংশের কুকুর শাখার আরম্ভ। রাজা কংস এই কুকুর শাখার উত্তরসূরি।

www.pathagar.com

এভাবে বাড়তে বাড়তে যদুবংশ একসময় বিশাল বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বলা হয়, এই বংশে নাকি একসময় মোট ছাপ্পান্ন কোটি পরিবার ছিল। আর তাই, কোনো বংশ বা পরিবার যখন অনেক বড় হয়ে যায়, তার জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, বাড়তে বাড়তে বহু পরিজনবিশিষ্ট পরিবার হয়ে ওঠে, তখন তাদের বলা হয়—যদুবংশ।

যশোদা কী ভাগ্যবতী, পরের পুতে পুত্রবতী
অর্থ : পরের ধনে ধনী

রাজা কংসের অত্যাচারে পৃথিবীর সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, দেবতাদেরকেও ব্যাপারটা ভাবিয়ে তোলে। তখন তারা সবাই মিলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানালেন। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে গেলেন নারায়ণের কাছে। তখন নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে, রাজা কংসকে দমন করতে রাজি হলেন।

কংস মগধের রাজা জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিয়ে করে। তাদের সহায়তায় সে তার নিজের বাবা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে মথুরার সিংহাসনে বসে। উগ্রসেনের ভাইয়ের নাম দেবক। দেবকের চার ছেলে, সাত মেয়ে। সাত মেয়েরই বিয়ে হয় বসুদেবের সাথে। এই সাত মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবকী। কংস উগ্রসেনকে সরিয়ে নিজে মথুরার সিংহাসনে বসার কিছুকালের মধ্যেই, দেবকীর সাথে বসুদেবের বিয়ে হয়।

সেই বিয়েতে কংস নিজেও গিয়েছিল। সেখানেই সে দৈববাণী শোনে যে, দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। সেই দৈববাণী শোনার পরপরই কংস তার বোন দেবকী ও বোন-জামাই বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করার আদেশ দেয়। কারাগারেই দেবকী-বসুদেবের একে একে ছয়টি সন্তান হয়। ছয়জনকেই কংসের আদেশে হত্যা করা হয়।

সপ্তম সন্তান গর্ভে এলে, বিষ্ণুর মায়ায় সে সন্তান বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে চলে গেল। জন্মের পর তার নাম রাখা হলো বলরাম। ওদিকে কংসকে জানানো হলো, দেবকীর গর্ভপাত ঘটেছে। কিছুদিন পরে আবারো গর্ভধারণ করলেন দেবকী। এবার কারাগারে নিরাপত্তা আরো বাড়িয়ে দিল কংস। যাতে কোনোভাবেই সেই সন্তান বাঁচতে না পারে। কিন্তু তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং মহামায়া। তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জননী। মধ্যরাত্রে তার মায়াতে মথুরার সবাই অচেতন হয়ে পড়ল। তখন বসুদেব তার ছেলেকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন গোপালক নন্দের বাড়ির উদ্দেশ্যে। শেষনাগ তাকে পথ

www.pathagar.com

দেখিয়ে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে, ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী, তার অষ্টম সন্তানকে গোপালক নন্দের স্ত্রী যশোদাকে দিয়ে, যশোদার মেয়েকে দেবকীর কাছে নিয়ে এলেন বসুদেব।

তার এই অষ্টম সন্তান আসলে কৃষ্ণ। কংসকে বধ করতেই তার আবির্ভাব। আর যশোদার গর্ভে যে মেয়ে হয়েছিল, সে আসলে ছিল যোগমায়া। পরদিন কংস যখন সেই মেয়েটিকে পাথরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে গেল, তখন সেই মেয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হওয়ার আগে সে কংসকে বলে গেল, তাকে যে হত্যা করবে সে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

তখন বসুদেব বলরামকেও গোপনে নন্দের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। পরে ছেলেদের বিপদের আশঙ্কায়, বসুদেবের পরামর্শে, নন্দ দুই ভাই বলরাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরা ছেড়ে গোকুলে গিয়ে বাস করতে শুরু করল। সেখানে কৃষ্ণ গোয়ালা দম্পতি নন্দ-যশোদার ছেলে হিসেবেই বড় হতে থাকে।

এভাবে কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্ম নিলেও, নিজের মা হিসেবে তিনি চিনতেন যশোদাকেই। কারণ যশোদাই তাকে আদরে-যত্নে-স্নেহে-সোহাগে-ভালোবাসায় বড় করেছিলেন। অথচ যশোদার নিজের ছেলে তো কৃষ্ণ নয়ই, যশোদার নিজের ছেলেই হয়নি। যশোদার হয়েছিল মেয়ে। সেই মেয়েও বাঁচেনি। সেই মেয়ে আসলে ছিল যোগমায়া। কৃষ্ণের জন্মের পরদিন কংস যখন সেই মেয়েটিকে দেবকীর সন্তান মনে করে পাথরে ছুঁড়ে হত্যা করতে যায়, তখন সেই মেয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্য হওয়ার আগে সে অবশ্য কংসকে বলে যায়, তাকে যে হত্যা করবে সে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

অর্থাৎ যশোদার নিজের হয়েছিল মেয়ে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি বনে গেলেন ছেলের মা। সেই ছেলে আবার যেনতেন কেউ নয়, স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার—কৃষ্ণ। এভাবে নিজের ছেলে না হয়েও, যশোদা এক যশস্বী ছেলের মা বনে যান। কেউ যখন এ রকম অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করে, এবং সেই ছেলে জীবনে সফল হয়ে তার মুখ উজ্জ্বল করে, তখন বলা হয়—যশোদা কী ভাগ্যবতী, পরের পুতে পুত্রবতী। আবার কেউ যদি পরের ধনসম্পদ পেয়ে ধনী হয়, তেমন লোকদের সম্পর্কেও এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

না বিয়ায়ে কানায়ের মা

অর্থ : পরের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসা

কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্ম নিলেও, নিজের মা হিসেবে তিনি চিনতেন যশোদাকেই। যশোদাও তাকে আদরে-যত্নে-স্নেহে-সোহাগে-ভালোবাসায় বড়

www.pathagar.com

করেছিলেন। কৃষ্ণ বড় হয়েও নিজের মা হিসেবে দেবকীকে নয়, যশোদাকেই জানতেন। যশোদাও কৃষ্ণকে নিজের ছেলের মতোই আদরে-যত্নে-সোহাগে-ভালোবাসায় বড় করতে থাকেন। তার নিজের মেয়ে যে জন্মের পরপরই মরে গেছে, তাই নিয়ে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হতাশা ছিল না। বরং পরের ছেলে কৃষ্ণের প্রতিই তার সকল ভালোবাসা, দায়-দায়িত্ব।

কেউ যদি অন্যের ছেলেকে এ রকম নিজের ছেলের মতো ভালোবাসে, সেই ছেলের প্রতি সে নারীর ভালোবাসাকে ইঙ্গিত করে বলা হয়—না বিয়ায়ে কানায়ের মা।

কুঁতিয়ে ম'ল দেবকী, নাম পাড়ান যশোদারানী

অর্থ : মায়ের চেয়ে মাসির গর্ব বেশি

দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হলেও, তার মা হিসেবে পরিচিতি পান যশোদা। এমনকি কৃষ্ণ নিজেও তার মা হিসেবে দেবকীকে নয়, চিনতেন যশোদাকেই। তিনিই কৃষ্ণকে লালনপালন করেন। তাকে বড় করেন। স্নেহ-ভালোবাসার বাঁধনে জড়িয়ে রাখেন।

হয়তো সে জন্যই, কৃষ্ণকে নিয়ে গর্বটাও তারই বেশি। রাধা যখন যশোদার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের নামে বিচার দিয়েছিলেন, প্রথমে তিনি কৃষ্ণকে বকাঝকা করতে শুরু করলেও, পরে তিনি উল্টো রাধাকেই গালমন্দ করেন। যশোদা যখন কৃষ্ণকে বকাঝকা শুরু করেন, তখন কৃষ্ণ উল্টো রাধার নামেই বানিয়ে বানিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলে। তখন যশোদাও কৃষ্ণের সকল মিথ্যা কথাই বিশ্বাস করেন। পরে নারায়ণের অবতার কৃষ্ণ যখন রাজা কংসকে বধ করেন, তখনও দেবকীর চেয়ে তিনিই যেন বেশি গৌরব বোধ করেছিলেন।

এ রকম কোনো ছেলের সাফল্যে যদি তার আসল মায়ের চেয়ে মাতৃস্থানীয় অন্যরা বেশি গরবিনী হয়ে ওঠে, যাকে বলে মায়ের চেয়ে মাসির গর্ব বেশি হয়, তখন ব্যঙ্গ করে বলা হয়—কুঁতিয়ে ম'ল দেবকী, নাম পাড়ান যশোদারানী।

গোকুলের ষাঁড় (ধর্মের ষাঁড়)

অর্থ : স্বেচ্ছাচারী, যে অপরাধ করলেও শাস্তি হয় না

কৃষ্ণ পৃথিবীতে জন্ম নেন বসুদেব-দেবকীর সন্তান হিসেবে। তবে কংস রাজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় গোয়ালা দম্পতি

www.pathagar.com

নন্দ-যশোদার ঘরে। কৃষ্ণ এই নন্দ-যশোদার সন্তান হিসেবেই বড় হতে থাকেন। পরে কৃষ্ণকে বাঁচাতে বসুদেব নন্দকে পরামর্শ দেন, মথুরা থেকে দূরে গিয়ে থাকতে। তখন থেকেই নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে বাসা বাঁধেন।

এই গোকুল মথুরা থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, যমুনার বাম তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণের শৈশব কাটে এখানেই। এখানেই তিনি পুতনা রাক্ষসী আর শকট অসুরকে মারেন। পরে কংসের অত্যাচারে নন্দ কৃষ্ণকে নিয়ে এখান থেকে বৃন্দাবনে চলে যান।

এই গোকুলের প্রায় সবাই-ই ছিল গোয়ালা। তারা গরু পালত। গরুর দুধ আর সে দুধ থেকে বানানো দই মথুরার হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। কৃষ্ণের পালক বাবা-মাও এই পেশায় ছিলেন। মানে গোয়ালা ছিলেন—নন্দ গোয়ালা আর যশোদা গোয়ালিনী। ছোটবেলায় কৃষ্ণের কাজই ছিল তার পালক বাবা-মার গরু চরানো।

গোকুলের লোকেরা মূলত গোয়ালা ছিল বলেই সম্ভবত, এই গোকুলে গরুদের বিশেষ সম্মান করা হতো। বিশেষ করে ষাঁড়দের সম্মান ছিল অনেক বেশি। ওখানে ষাঁড় যত যাই করুক, তাদের কিছুই বলা হতো না। কারো ক্ষেত-খামার নষ্ট করলেও কেউ মারতে যেত না, তাড়াও করত না। আর তাই গোকুলের ষাঁড়েরাও নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াত। যখন যেখানে খুশি চরে বেড়াত, যেটাতে খুশি মুখ দিত।

সাধারণত অনেক বড়লোকের ছেলেমেয়ে, বা অনেক ক্ষমতাবানদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়। তারা এরকম নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াতে পারে, যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি করতে পারে, তাতে অন্যের ক্ষতি হলেও তাদের কিছু যায় আসে না, অপরাধ করলেও শাস্তি পেতে হয় না। এমন লোকদের বলা হয় গোকুলের ষাঁড় (বা ধর্মের ষাঁড়)।

পুতনা রাক্ষসী

অর্থ : যে নারীর মুখে মধু অন্তরে বিষ

পুতনা রাক্ষসী ছিল বকাসুরের বোন। তাদের বাবা বালী। এই পুতনা রাক্ষসী ছিল কংস রাজার অনুচরী। মানে, তার সব কথা এই রাক্ষসী শুনত। বাচ্চাদের মারার জন্য মায়াবিনী এই রাক্ষসীর এক অদ্ভুত কৌশল ছিল। পুতনা রাক্ষসীর বুকের দুধ ছিল বিষাক্ত। সে বাচ্চাদের মায়া-মমতায়-স্নেহে-আদরে ভুলিয়ে বুকের দুধ খাওয়াত। তাতেই বাচ্চারা মারা যেত।

www.pathagar.com

যখন কংস রাজাকে দমন করতে, তারই বোনের গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হলো, সে খবর শুনে কৃষ্ণকে মারার জন্য রাজা কংস হন্যে হয়ে উঠল। কিন্তু কোনোভাবেই সে কৃষ্ণকে মারতে পারছিল না। মারবে কী, সে তো কৃষ্ণকে খুঁজেই পাচ্ছিল না। শেষে কৃষ্ণকে খুঁজে না পেয়ে, সে মথুরার সব শিশুদেরই হত্যার আদেশ দিল। আর সে কাজের দায়িত্ব বর্তাল পুতনা রাক্ষসীর ঘাড়ে।

তখন পুতনা মায়াবলে এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করল। তারপর গিয়ে উপস্থিত হলো নন্দের বাড়িতে। কৃষ্ণ তখন সেই বাড়িতেই ছিলেন। সেখানে গিয়ে পুতনা মায়াবলে নন্দের স্ত্রীকে মুগ্ধ করল। তারপর শিশু কৃষ্ণকে কপট মায়া দেখিয়ে, লোক-দেখানো আদর করতে করতে, বুকের দুধ খাওয়াতে গেল।

কিন্তু কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণের অবতার। তিনি পুতনা রাক্ষসীর কথা আগে থেকেই জেনে গেলেন। আর বুকের দুধ খেতে গিয়ে তিনি কামড়ে কামড়ে পুতনার জীবনীশক্তিই শুষে নিলেন। যন্ত্রণায় পুতনা রাক্ষসী বিকট আর্তনাদ করতে শুরু করল। মায়াবলে নেয়া সুন্দরীর রূপ ছেড়ে তার আসল দানবী রূপে ফিরে এল। অসহ্য যন্ত্রণায় তড়পাতে লাগল। ওভাবে তড়পাতে তড়পাতে, বিকট চিৎকার করতে করতে, কৃষ্ণকে মারতে এসে পুতনা রাক্ষসী নিজেই মারা গেল।

এ রকম যে নারীর মুখে মধু অন্তরে বিষ, মনে অনিষ্ট করার ইচ্ছা পুষে মুখে ভালো ভালো কথা বলে, মনে মনে হিংসা পুষে রেখে বাইরে লোক দেখানো স্নেহ-মমতা দেখায়, তাদের বলা হয় পুতনা রাক্ষসী।

বৃন্দে দূতী

অর্থ : দুজনের কথা পরস্পরের নিকট চালাচালি করা, দুইজনের বা দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করা

কৃষ্ণ পৃথিবীতে জন্ম নেন বসুদেব-দেবকীর সন্তান হিসেবে। তবে কংস রাজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় গোয়ালা দম্পতি নন্দ-যশোদার ঘরে। কৃষ্ণ এই নন্দ-যশোদার সন্তান হিসেবেই বড় হতে থাকেন। পরে কৃষ্ণকে বাঁচাতে বসুদেব নন্দকে পরামর্শ দেন, মথুরা থেকে দূরে গিয়ে থাকতে। তখন থেকেই নন্দ-যশোদা কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলে বাসা বাঁধেন।

ওই গোকুলেরই আরেক গোয়ালা দম্পতি সাগর-পদ্মা দম্পতি। নারায়ণ যেমন কৃষ্ণ অবতার হিসেবে পৃথিবীতে বসুদেব-দেবকীর সন্তান হয়ে জন্ম

www.pathagar.com

নেন, তেমনি এই সাগর-পদ্মার সন্তান হিসেবে জন্ম নেন নারায়ণ বা বিষ্ণুর স্ত্রী দেবী লক্ষ্মী। এই জন্মে লক্ষ্মীর নাম হয় রাধা। দেবজগতে এই নারায়ণ ও লক্ষ্মী দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। মানবজন্মেও তারা সেই প্রেম ভুলে থাকতে পারেননি। এই জন্মেও তাদের দুজনের প্রেম হয়। আর সেই প্রেমে দূতিয়ালির কাজ করে রাধার বৃদ্ধা নানি বৃন্দা বা বৃন্দে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৃন্দার নাম উল্লেখ করা হয়েছে বড়ায়ি হিসেবে।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ক্ষেত্রে এই বৃন্দা বা বড়ায়ি সত্যি সত্যিই মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। তারচেয়েও বড় কথা, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের শুরুটাই হয় এই বৃন্দার হাত ধরে। আইহন ঘোষের স্ত্রী রাধা যেখানে যেখানে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে যেত এই বৃন্দা। তাদের বাসা ছিল গোকুলে। সেখানে সব ঘরেই গোয়ালাদের বাস। তাদের বাড়িতে বাড়িতে যে দুধ-দই হতো, সেগুলো মথুরার হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার দায়িত্ব ছিল বাড়ির মেয়েদের-বৌদের। তারা সবাই একসাথে দুধ-দই নিয়ে হাটে যেত, একসাথে ফিরে আসতো। এ রকম এক দিনেই ঘটনার শুরু।

সেদিনও সব সখীদের সাথে হাটে গিয়েছিলেন রাধা। সঙ্গে বৃন্দা। কিন্তু বৃন্দা তো বৃদ্ধা। সে তো রাধাদের সাথে সমান তালে হাঁটতে পারে না। সেদিন সে এতই পিছিয়ে পড়ল, রাধাদের আর খুঁজেই পেল না। শেষে দেখা হলো কৃষ্ণের সাথে। গোকুলের আর সব রাখাল ছেলেদের মতো কৃষ্ণও গরু চরাত। সে তখন ওই গরুই চরাচ্ছিল। এই কৃষ্ণ আবার বৃন্দার পূর্বপরিচিত, সম্পর্কে নাতি। তখন বৃন্দা কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করল, রাধা কোনদিকে গেছে, কোথায় গেছে, সে জানে কি না। কিন্তু কৃষ্ণ তো রাধাকে চেনে না। যাকে সে চেনেই না, তাকে দেখলেও তো সে বলতে পারবে না। তখন বৃন্দা কৃষ্ণকে রাধার বর্ণনা দিতে শুরু করে। আর সেই বর্ণনা শুনতে শুনতেই রাধা কৃষ্ণের প্রেমে পড়ে যায়।

আর তার পর থেকেই শুরু হয় বৃন্দার দূতিয়ালি। কৃষ্ণ রাধাকে উপহার দেন। বৃন্দা সেই উপহার কৃষ্ণের কাছ থেকে রাধার কাছে নিয়ে আসে। কৃষ্ণ রাধার সাথে দেখা করতে চান, বৃন্দা তাদের দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেয়। আবার রাধা যখন কৃষ্ণের বিরহে অধীর হয়ে ওঠেন, তখন বৃন্দা তারও ব্যবস্থা করে। কৃষ্ণকে রাজি করায় রাধার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এভাবে রাধা-কৃষ্ণের পুরো প্রেমকাহিনিতেই উপস্থিত এই বৃন্দা বা বড়ায়ি। দুজনের কথা দুজনের কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে এই বৃন্দার উপরেই নির্ভর

www.pathagar.com

করতেন। মানে, তাদের প্রেমের সম্পূর্ণ দূতিয়ালি বা মধ্যস্থতা করার কাজটাই করে সে।

এ রকম কেউ যখন দুজনের মধ্যে কথা চালাচালি করার কাজ করে, মানে দুজনের মধ্যে বা দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, তখন তাকে বলা হয় বৃন্দে দূতী।

কানায়ে ভাগিনা
অর্থ : লম্পট আত্মীয়

রাধা ছিলেন গোকুলের গোয়ালা দম্পতি সাগর-পদ্মার সন্তান। পরে তার বিয়ে হয় গোকুলেরই আইহন ঘোষের সঙ্গে। এই আইহন ঘোষ ছিলেন নপুংসক। তারচেয়েও বড় কথা, আইহন ঘোষ সম্পর্কে কৃষ্ণের মামা হতেন। অর্থাৎ, মানবীয় সম্পর্কে রাধা কৃষ্ণের মামি হতেন।

কৃষ্ণ অবশ্য রাধাকে চিনতেন না। কিন্তু তার রূপের বর্ণনা শুনেই তিনি রাধার প্রেমে পড়ে যান। প্রথম দেখাতে সে প্রেম আরো গভীর হয়। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণের দ্বিতীয় সাক্ষাতেই রাধা এই মামি-ভাগ্নে সম্পর্কের ব্যাপারটা বলে কৃষ্ণকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। মামির সঙ্গে ভাগ্নের প্রেমের সম্পর্কে জড়ানো যে অত্যন্ত গর্হিত একটা কাজ, সমাজের চোখে যে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, সেটা তিনি কৃষ্ণকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণ নাছোড়বান্দা। তিনি কোনো কথাই শুনবেন না। রাধাকে তার চাই, সেটাই শেষ কথা।

অবশ্য সেটা নিছক মানবীয় সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে এই কৃষ্ণ ছিলেন অবতারের রূপে নারায়ণ। আর রাধা আসলে ছিলেন দেবী লক্ষ্মী। দেবজগতে এই নারায়ণ ও লক্ষ্মী দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু দেবজগতের সেই সম্পর্কের কথা মনে না রাখলে, কৃষ্ণকে লম্পটই বলতে হয়। কেননা তিনি তার মামির প্রেমে তো পড়েনই, মামির কাছে সেই প্রেমের কথা প্রকাশ করতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। শুধু তাই না, জোর করে হলেও তিনি মামির ভালোবাসা আদায় করে তবেই ছাড়েন।

আর তাই পরিবার-পরিজনের মধ্যে যদি লম্পট চরিত্রের কেউ থাকে, যাকে বলে 'লম্পট আত্মীয়', তাকে ইঙ্গিত করে বলা হয়—কানায়ে ভাগিনা। অর্থাৎ, কানু বা কৃষ্ণ যেমন লম্পট ভাগ্নে ছিলেন, ওই আত্মীয়-ও তেমন চরিত্রের অধিকারী।

www.pathagar.com

বিনা দানে মথুরা পার

অর্থ : বিনা ব্যয়ে বা অনায়াসে কার্যসাধন

কৃষ্ণ ছিলেন অবতারের রূপে নারায়ণ। আর রাধা আসলে ছিলেন দেবী লক্ষ্মী। দেবজগতে এই নারায়ণ ও লক্ষ্মী দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। মানবজন্মেও তারা সেই প্রেম ভুলে থাকতে পারেননি। এই জন্মেও তাদের দুজনের প্রেম হয়। আর সেই প্রেমে দূতিয়ালির কাজ করে রাধার বৃদ্ধা নানি বৃন্দা বা বৃন্দে। কৃষ্ণ রাধাকে উপহার দেন। বৃন্দা সেই উপহার কৃষ্ণের কাছ থেকে রাধার কাছে নিয়ে আসে। কৃষ্ণ রাধার সাথে দেখা করতে চান, বৃন্দা তাদের দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেয়। রাধা তার সখীদের সাথে মথুরায় দই-দুধ বিক্রি করতে যান। পথে অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ। বৃন্দা জানে, কৃষ্ণ কোথায় থাকবেন। সে রাধাকে সেই পথেই নিয়ে চলে।

এমনি চলতে চলতে বর্ষাকাল চলে এল। এখন আর পথ হেঁটে মথুরায় যাওয়া যায় না। মথুরায় যেতে হয় নৌকায় চড়ে। কিন্তু কৃষ্ণ তো রাধার সাথে দেখা না করে থাকতে পারবেন না। তখন কৃষ্ণ আর বৃন্দা মিলে এক নতুন বুদ্ধি আঁটলেন। এবার কৃষ্ণ সাজলেন মাঝি। মাঝি সেজে তিনি রাধা আর তার সব সখীদের নদী পার করতে বসলেন।

আগে নদী পার করে দিলে, খেয়াপারের মাঝিদের দান বা মাসুল দিতে হতো। এখন যেমন ভাড়া দেয়া হয়, তেমনি। কৃষ্ণ কিন্তু রাধা আর তার সখীদের কারও কাছ থেকেই কোনো দান বা মাসুল নিলেন না। নিবেনই বা কেন, তিনি তো আর আয়-রোজগার করার জন্য নৌকার মাঝি সেজে বসেননি। তার তো কেবল রাধাকে প্রয়োজন। রাধার সাথে দেখা হওয়া প্রয়োজন। সেটা যখন হয়েছেই, দান-মাসুল দিয়ে তার কী হবে।

এভাবে রাধার সব সখীরাই বিনা দানে মথুরা পার হয়ে গিয়েছিল। কেউ যদি কোনো কাজ কোনো খরচ ছাড়া, বা কোনো পরিশ্রম ছাড়া সহজেই করিয়ে নিতে পারে, যাকে বলে বিনা খরচে বা বিনা পরিশ্রমে কার্যোদ্ধার, তখন রাধার সখীদের বিনা মাসুলে নদী পার হয়ে মথুরা যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তাকে বলা হয়—বিনা দানে মথুরা পার হয়ে গেলে।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি

অর্থ : দোটানায় পড়া

কৃষ্ণ ছিলেন অবতারের রূপে নারায়ণ। আর রাধা আসলে ছিলেন দেবী লক্ষ্মী। দেবজগতে এই নারায়ণ ও লক্ষ্মী দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

www.pathagar.com

মানবজন্মেও তাদের দুজনের মধ্যে প্রেম হয়। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে কৃষ্ণ রাধার প্রেমে অধীর হয়ে উঠতেন। রাধার সাথে দেখা না হলে বিরহে কাতর হয়ে পড়তেন। কিন্তু পরের পর্যায়ে সে ভূমিকা একদম উল্টে গেল। কৃষ্ণের মতো অবস্থা হলো রাধার। তিনি কৃষ্ণের প্রেমে অধীর হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণের সাথে দেখা না হলে বিরহে কাতর হয়ে পড়তেন। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত রাধা কৃষ্ণকে যে উপেক্ষা-বঞ্চনা উপহার দিয়েছিলেন, তাতে ততদিনে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ আর আগের মতো রাধার বিরহে কাতর হতেন না।

কিন্তু সেটাই রাধার জন্য একমাত্র সমস্যা ছিল না। আরেক সমস্যা, মানব কৃষ্ণের সাথে মানবী রাধার যে সম্পর্ক, মানে মামি-ভাগ্নের সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে প্রেম সামাজিকভাবে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, তাদের এই প্রেম সমাজ মেনে নেবে না।

সব মিলিয়ে রাধা দুই দিকেই বিপদে পড়েন। একদিকে, তিনি সবকিছু ছেড়েছুড়ে শ্যাম বা কৃষ্ণের কাছে চলে যেতে পারেন। কিন্তু তাতে তার কুল বা সমাজ রক্ষা হবে না। সমাজের চোখে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি কাজ। তখন সমাজ তাকে আর গ্রহণই করবে না। আবার সমাজ রক্ষা করতে গেলে তাকে শ্যাম বা কৃষ্ণকেই হারাতে হবে। অথচ কৃষ্ণকে তিনি এতটাই ভালোবেসেছেন, কৃষ্ণকে ছাড়া তিনি বাঁচবেনই না। আবার কৃষ্ণ নিজেই আর তাকে আগের মতো ভালোবাসেন না। ফলে তিনি চাইলেও শ্যাম বা কৃষ্ণ আর কুল বা জাতি-সম্মান—দুটোর থেকে একটা বেছে নিতে পারছেন না।

যখন কেউ এ রকম দোটানায় পড়ে, একদম বিপরীতমুখী দুটো ঘটনার চক্রে পড়ে দ্বিধান্বিত হয়ে যায়, কোন দিক রেখে কোন দিকে যাবে বা কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে ঠিক করতে পারে না, তখন সে বলে ওঠে—এখন আমার শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

কংস মামা

অর্থ : নির্দয় আত্মীয়

যদুবংশের অন্যতম শাখা-বংশ হলো ভোজবংশ। কংস ছিল এই ভোজবংশের রাজা। সে মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র। মানে কংস উগ্রসেনের স্ত্রীর গর্ভে জন্মালেও, উগ্রসেনের ঔরসে জন্মায়নি। তাই উগ্রসেন যদুবংশের রাজা হলেও, কংস নিজে ঠিক যদুবংশের রাজা নয়। সৌভপতি দ্রুমিল একদিন উগ্রসেনের রূপ নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়। আর তারই ফলে কংসের জন্ম।

www.pathagar.com

পরে এই কংস মগধের রাজা জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিয়ে করে। তাদের সহায়তায় সে তার নিজের বাবা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে মথুরার সিংহাসনে বসে। উগ্রসেনের ভাইয়ের নাম দেবক। দেবকের চার ছেলে, সাত মেয়ে। সাত মেয়েরই বিয়ে হয় বসুদেবের সাথে। এই সাত মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবকী। কংস উগ্রসেনকে সরিয়ে নিজে মথুরার সিংহাসনে বসার কিছুকালের মধ্যেই, দেবকীর সাথে বসুদেবের বিয়ে হয়।

সেই বিয়েতে কংস নিজেও গিয়েছিল। সেখানেই সে দৈববাণী শোনে যে, দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। সেই দৈববাণী শোনার পরপরই কংস তার বোন দেবকী ও বোন-জামাই বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করার আদেশ দেয়। কারাগারেই দেবকী-বসুদেবের একে একে ছয়টি সন্তান হয়। ছয়জনকেই কংসের আদেশে হত্যা করা হয়।

পরের দুই সন্তানকেও কংস হত্যা করারই আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু সপ্তম সন্তান বিষ্ণুর মায়ায় চলে যায় বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে। তার নাম রাখা হয় বলরাম। আর অষ্টম সন্তানকে বাঁচান স্বয়ং মহামায়া। তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের মা। তার মায়ায়, রাতে মথুরার সবাই অচেতন হয়ে পড়ে। আর সেই সময় বসুদেব তার ছেলেকে রেখে আসেন নন্দ-যশোদার ঘরে। বদলে নিয়ে আসেন যশোদার মেয়েকে।

পরদিন কংস যশোদার মেয়েকে দেবকীর মেয়ে ভেবে, তাকে পাথরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে গেল। তখন সেই মেয়ে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হওয়ার আগে সে কংসকে বলে দিয়ে গেল, তাকে যে হত্যা করবে সে পৃথিবীতে চলে এসেছে। অবস্থা দেখে বসুদেব বলরামকেও গোপনে নন্দের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। পরে ছেলেদের বিপদের আশঙ্কায়, বসুদেবের পরামর্শে, নন্দ দুই ভাই বলরাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরা ছেড়ে গোকুলে গিয়ে বাস করতে শুরু করল।

ওদিকে কংস তার হত্যাকারী সন্তানটিকে আর খুঁজে পেল না। তখন ডেকে পাঠাল পুতনা রাক্ষসীকে। তাকে আদেশ দিল, মথুরার সব শিশুকেই হত্যা করতে। কিন্তু কৃষ্ণকে মারতে গিয়ে উল্টো পুতনা রাক্ষসীই কৃষ্ণের হাতে মারা পড়ল। তাতে কংসের যে লাভ হলো, সে কৃষ্ণকে চিনে ফেলল। তারপর তাকে মারার জন্য বক, অঘ, অরিষ্টসহ অসংখ্য দানবকে পাঠাল। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তারা সবাই পরাস্ত হলো। শেষে কংস অন্য পথ ধরল। সে ধনুযজ্ঞের আয়োজন করল। আর গোপনে ফন্দি আঁটল, সে যজ্ঞে কৃষ্ণ আর বলরামকে নিমন্ত্রণ করে এনে, তাদের হত্যা করবে।

www.pathagar.com

এই ধনুযজ্ঞেই কৃষ্ণ কংস-বধ করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম ধনুযজ্ঞে যোগ দিলে, কংস দুই মল্লযোদ্ধার সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামকে মল্লযুদ্ধে নামিয়ে দিল। তার ফন্দি ছিল, ওরা কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, সে জন্য একটা হাতিও রেখেছিল পাশেই। অবস্থা সুবিধার না ঠেকলে, সেই হাতিকে মাঠে নামিয়ে দেয়া হবে। হাতির পায়ের চাপায় আর সবার সাথে যাতে কৃষ্ণও মারা যান। কিন্তু কৃষ্ণ বলরামকে সাথে নিয়ে দুই মল্লযোদ্ধাকেই মেরে ফেললেন। তারপর মেরে ফেললেন হাতিটিকেও। তারপর কৃষ্ণ তার মূল অভিযানে নামলেন। প্রথমে কংসের রক্ষীদের হত্যা করলেন। তারপর হত্যা করলেন অত্যাচারী রাজা কংসকেও। তারপর কারাবন্দি উগ্রসেনকে মুক্ত করে, তাকে মথুরার সিংহাসনে বসালেন।

এভাবে কৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু হলো বটে, কিন্তু তার আগেই কংস নিজের স্বার্থে কতটা নিচে নামতে পারা যায়, তার চূড়ান্ত প্রদর্শনী দেখিয়ে দিয়েছিল। নিজের স্বার্থে আপন আত্মীয়দের ক্ষতি করতে একটুও দ্বিধা করেনি সে। সিংহাসনের লোভে তার নিজের বাবাকেই গদি থেকে নামিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখে। নিজের জীবন বাঁচাতে নিজের বোনের ছেলেদের এক-এক করে হত্যা করে। আপন ভাগ্নেকে হত্যার জন্য সব রকম চেষ্টাই করে সে। আর তাই, কেউ যখন নিজের স্বার্থে আত্মীয়দের সাথেই শত্রুতা করতে থাকে, তাকে ঘৃণাভরে বলা হয় 'কংস মামা'।

কংস রাজার বদ ফরমাশ
অর্থ : অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ

রাজা কংস ছিল কৃষ্ণের মামা। তারা দুজনই ছিলেন যদুবংশের উত্তরসূরি। তবে কৃষ্ণের বাবা-মার বিয়েতেই দৈববাণী হয়, তাদের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে। সেই দৈববাণী শোনার পর থেকেই কংস তার বোন দেবকী ও বোন-জামাই বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করার অন্যায় আদেশ দেয়। আর তার পর থেকেই তাদের অষ্টম সন্তান যেন তাকে হত্যা করতে না পারে, সে জন্য একের পর এক অন্যায় আদেশ দিয়ে যেতে থাকে সে। এমন এমন সব আদেশও সে দেয়, যেগুলোর কথা ভাবাই যায় না।

কংস নিজেকে বাঁচাতে তার বোন আর বোন-জামাইকে কারাগারে বন্দি করে রাখে। সেখানে তার বোনের যত সন্তান হয়, সবাইকেই সে হত্যার আদেশ দেয়। অবশ্য শেষ দুই সন্তানকে হত্যা করা সম্ভব হয় না। দেবকীর সপ্তম ছেলে বলরামকে বাঁচান বিষ্ণু, আর অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে বাঁচান মহামায়া।

www.pathagar.com

তখন কৃষ্ণকে হত্যা করতে, কংস পুতনা রাক্ষসীকে ডেকে, মথুরার সব সন্তানদেরই হত্যার নির্দেশ দেয়।

পুতনা রাক্ষসী অবশ্য কৃষ্ণকে মারতে পারল না। উল্টো সে নিজেই কৃষ্ণের হাতে প্রাণ দিল। তাতে কংসের এটুকু লাভ অবশ্য হলো, সে কৃষ্ণকে চিনে ফেলল। তখন কৃষ্ণকে মারার জন্য কংস বক, অঘ, অরিষ্টসহ অসংখ্য দানবকে আদেশ দিল। কিন্তু কৃষ্ণের কাছে তারা সবাই পরাস্ত হলো। তখন কংস অন্য পথ ধরল। সে ধনুযজ্ঞের আয়োজন করে, সেখানে কৃষ্ণকে হত্যার পরিকল্পনা করল।

তাতেও অবশ্য লাভ হয়নি। কংসের সবগুলো বদ ফরমাশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকর হয়। তার সব মতলব ভেস্তে দিয়ে কৃষ্ণ তাকে দমন করেন। সে রকম, কেউ নিজের স্বার্থে এরকম অন্যায় আর অসম্ভব সব আদেশ দিতে থাকলে, বা অন্যায় সব ফরমান জারি করতে থাকলে, তখন বলা হয়, সে কংস রাজার বদ ফরমাশ দিয়েছে।

www.pathagar.com

বিষ্ণু ও দশাবতার

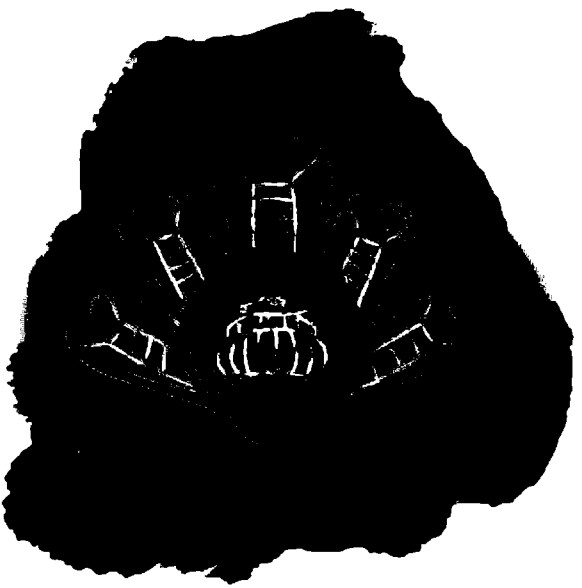

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নগদ নারায়ণ

অর্থ : কাঁচা টাকা, নগদ অর্থ

নারায়ণ বিষ্ণুর অপর নাম। ভারতীয় পুরাণে সকল দেবতার মধ্যে তিনজন দেবতার স্থান অন্য সবার চেয়ে উপরে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। এদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনকর্তা বা পালনের দেবতা। আর শিব ধ্বংসের, সংহারের দেবতা।

বিষ্ণু পালনকর্তা বা রক্ষক। বিভিন্ন যুগে বিষ্ণু অবতার রূপে পৃথিবীতে এসে বিভিন্ন অপদেবতা ও দুষ্কৃতকারীদের শাসন করে ধর্ম স্থাপন করে গেছেন। বিভিন্ন পুরাণে বিষ্ণুর বিভিন্ন সংখ্যক অবতারের উল্লেখ আছে। এগুলোর মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতার অধিক প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর এই দশ অবতার হলো—মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার, বামন অবতার, পরশুরাম অবতার, রাম অবতার, কৃষ্ণ (কৃষ্ণ-বলরাম) অবতার, বুদ্ধ অবতার এবং কল্কি অবতার।

বিষ্ণুর দুই স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ছেলে কামদেব। বাসা বৈকুণ্ঠতে। বাহন গরুড়। তার চারটি হাত। প্রথম হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হাতে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হাতে কৌমোদকী গদা এবং চতুর্থ হাতে পদ্ম থাকে। তার ধনুকের নাম শার্ঙ্গ, অসি বা তলোয়ারের নাম নন্দক। তার বুকে কৌস্তভ মনি আছে। আর আছে শ্রীবৎস নামের এক অদ্ভুত চিহ্ন।

দেবতারা কোনো বিপদে সুরাহা করতে না পারলে তবেই বিষ্ণুর কাছে আসেন। আর বিষ্ণুও তাদের বিমুখ করেন না। আর এখনকার যুগে টাকাও ঠিক তেমন। টাকারও তেমনি ক্ষমতা। টাকা দিয়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যায়। টাকার জন্য মানুষ ধ্বংস করে, টাকার জন্যই সৃষ্টি করে। আবার রক্ষণ বা পালনের জন্যও প্রয়োজন টাকা।

www.pathagar.com

এ রকম সাদৃশ্য থেকে, এক রকম শ্লেষাত্মক অর্থে কাঁচা টাকা বা নগদ অর্থকে বলা হয় নগদ নারায়ণ।

অতিথি নারায়ণ

অর্থ : অতিথির সেবা করা ধর্মের অংশ

নারায়ণ বিষ্ণুর অপর নাম। ভারতীয় পুরাণে সকল দেবতার মধ্যে তিনজন দেবতার স্থান অন্যদের চেয়ে উপরে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। এদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু পালনকর্তা বা পালনের দেবতা। আর শিব ধ্বংসের, সংহারের দেবতা।

অর্থাৎ নারায়ণ বা বিষ্ণু ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের একজন। আর তাই তার সেবা করা ধর্মের অংশ। কখনো যদি বিষ্ণু কারও বাসায় আসেন, তার সেবায় ত্রুটি করা একদমই উচিত নয়। বাঙালি প্রথা বা রীতি অনুযায়ী, অতিথিকেও সে রকম সম্মানের সাথেই বিবেচনা করা হয়। কারো বাড়িতে কেউ অতিথি হয়ে এলে, তাকে সবচেয়ে ভালো খাবার দেয়া, সবচেয়ে ভালো ঘরে থাকতে দেয়া, ভালো বিছানায় ঘুমাতে দেয়া বাঙালি রীতির অংশ। আর তাই বলা হয়—অতিথি নারায়ণ।

ভগবানের আসন বটপত্র

অর্থ : উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকায় সম্ভ্রান্ত লোককে কম সমাদর করা

এখন বছর-গণনা করা হয় সৌরবর্ষের হিসেবে। এই সৌরবর্ষ বা সৌরপঞ্জিকার হিসাব হয় সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে। সেই অনুযায়ী দিন-মাস-বছর হিসাব করা হয়। কিন্তু ভারতীয় পুরাণে কাল বা সময়ের হিসাব করা হয় চান্দ্রবছর বা চান্দ্রপঞ্জিকা দিয়ে। (হিজরি সনও তাই।)

ভারতীয় পুরাণের এই চান্দ্রবছরের হিসাব হয় চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে। এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে ধরা হয় এক মাস (চান্দ্রমাস)। ১২ চান্দ্রমাসে হয় এক চান্দ্রবছর। ভারতীয় পুরাণে এই বছরকে বলা হয় মানবীয় বছর। এই এক মানবীয় বছরের সমান সময়কালে হয় এক দৈব দিন। ৩৬০ দৈব দিনে হয় ১ দৈব বছর। আর ১২ হাজার দৈব বছর মিলে ১ দৈবযুগ বা ১ চতুর্যুগ।

এ রকম এক হাজার দৈবযুগ বা চতুর্যুগ মিলে হয় ব্রহ্মার এক দিন। এক ব্রহ্মার জীবনে ১৪ জন ইন্দ্র রাজা হন। আর ২ জন ব্রহ্মার জীবন মিলে হয় বিষ্ণুর এক জীবন।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে বড় তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও মৃত্যুর অধীন। ২ জন ব্রহ্মার জীবনকাল মিলিয়ে হয় বিষ্ণুর এক জীবনকাল। তারপর শুরু হয় শিবের যুগ। শিবের যুগ বিষ্ণুর যুগের দুই গুণ। তারপর শিবের যুগও শেষ হলে, ঘটে প্রলয়।

প্রলয়ের পর ১২০ ব্রহ্ম বছর ধরে পৃথিবী জনমানবশূন্য থাকে। সে সময় পৃথিবীতেও কিছু থাকে না, কেবল থইথই পানি চারদিকে। আর তার মধ্যে একটা বটের পাতার উপর ঘুমিয়ে থাকেন বিষ্ণু। ওইভাবে পানি বা নরের উপর শুয়ে থাকেন বলেই, তার আরেক নাম নারায়ণ।

ওইভাবে প্রলয় সাগরে ভাসমান অবস্থাতেই, তার নাভি থেকে একটি পদ্মফুল বের হয়। সেই পদ্ম থেকে জন্ম নেন ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা রূপে পুনরায় সবকিছু সৃষ্টি করেন।

এভাবে, প্রলয় শেষে পৃথিবীতে আর কিছুই না থাকায়, পানির উপরে সামান্য বটের পাতায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকতে হয় ভগবান বিষ্ণুকে। গরিব কারো বাসায় সম্ভ্রান্ত কেউ আসলেও মাঝে মাঝে অমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে এসেছে, তাকে বসতে দেয়ার মতো আসন হয়তো তার বাসাতেই নেই। অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলেও তাকে উপযুক্ত সমাদর করা সম্ভব হচ্ছে না। তখন বিষ্ণুর বটের পাতায় শোয়ার প্রসঙ্গ টেনে সামান্য আসনে বসতে বলে বিনয় করে বলা হয়—ভগবানের আসন বটপত্রে বসুন।

অমৃতে অরুচি
অর্থ : মূল্যবান জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণা

দেবতা আর অসুর—দুই পক্ষ। একদল ভালো, আরেকদল মন্দ। দেবতারা সকলের পূজনীয়। তারা একেক জন মানুষের জীবনের একেকটা দিকের দেখভাল করেন। আর মানুষও তাদের পূজা করে, যাগ-যজ্ঞ করে সন্তুষ্ট রাখে।

অসুররা আবার দেবতাদের ঠিক উল্টো। দেবতাদের বিরোধিতা করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা, তাদের নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করাই অসুরদের কাজ। দেবতাদের জন্য যে পূজা আর যজ্ঞ করা হয়, এই অসুরদের প্রধান কাজই হলো সে সবে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা। আবার যেসব অসুররা দেবতাদের হাতে মারা পড়ত, তারা তখন পৃথিবীতে মন্দ মানুষ হয়ে জন্মাত। তারপর তারা পৃথিবীতে নানা রকম ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাধাত। আশেপাশের মানুষদের জীবনে নানা রকম বিপদ-আপদ ডেকে আনতো। শুধু মানুষই না, তারা দৈত্য-দানব আর অন্যান্য পশুপাখি হয়েও জন্মাত। তবে রাক্ষস হয়ে জন্মাত না।

www.pathagar.com

এই সমগ্র সৃষ্টিজগতের পূর্বপুরুষ হলেন প্রজাপতি। তিনিই সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। অসুরও সরাসরি তার হাতেরই সৃষ্টি। তবে ওরা ঠিক তার 'হাতের' সৃষ্টি নয়। বরং তার 'নিঃশ্বাস'-এর সৃষ্টি বলা উচিত। শ্বাস গ্রহণকে বলা হয় প্রশ্বাস, আর শ্বাসত্যাগকে বলা হয় নিঃশ্বাস। একবার প্রজাপতির একটি নিঃশ্বাস প্রাণ পেয়ে গেল। সেই প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস থেকেই অসুরদের সৃষ্টি। অনেক পুরাণে আবার ব্রহ্মাকেই প্রজাপতি হিসেবে বলা হয়েছে। ব্রহ্মার হাতে অসুরদের জন্মের গল্পটাও একটু আলাদা। তাতে অসুরদের জন্ম ব্রহ্মার নিঃশ্বাস থেকে নয়, বরং তার জঙ্ঘা থেকে, মানে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত যে অংশ, তার থেকে।

তো এই অসুররা যাকে বলে দেবতাদের চিরশত্রু। এই দুপক্ষের মধ্যে নিত্যই খিটিমিটি লেগে থাকে। যুদ্ধও লাগে প্রায়ই। একবার হিরণ্যকশিপুর নেতৃত্বে দৈত্যরা দেবতাদের সাথে একশ বছরের এক যুদ্ধ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। তখন তারা তাদের নতুন রাজা করল বলিকে। এই বলির অভিষেকের দিন এমনকি ব্রহ্মাও এসেছিলেন তাকে আশীর্বাদ করতে। আর সিংহাসনে বসেই বলি দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। একের পর এক যুদ্ধে বলি দেবতাদের পরাস্ত করতে লাগল। তার বীরত্ব দেখে একবার পরাক্রমশালী দেবী দুর্গা তার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। ইন্দ্রও তার কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন বলি ইন্দ্রের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে চলে আসলেন।

ফিরে আসার পথে সেসব ধন-সম্পদ সমুদ্রে পড়ে গেল। তখন বিষ্ণু দেবতাদের পরামর্শ দিলেন, বলির সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করতে। তাহলে বলি ইন্দ্রের পরে যাওয়া ধন-সম্পদও পাবে, আর দেবতারাও অমৃত পাবেন। আর অমৃত পেলে, দেবতারাও অমর হয়ে উঠবেন। তখন অসুর বা দৈত্যদের পরাজিত করাও সম্ভব হবে।

অমৃত হলো সেই সুধা, যা পান করলে অমর হওয়া যায়। সেই অমৃত আছে ক্ষীরোদ সাগরের একদম তলদেশে। ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করলে, তবেই অমৃত পাওয়া যায়। এই অমৃত আগে পৃথিবীতেই ছিল। রাজা পৃথু পৃথিবীকে দোহন করলে, এই অমৃত উৎপন্ন হয়। পৃথু রাজা হওয়ার কিছুদিন পর জানতে পারলেন, তার প্রজারা সবাই ভীষণ অন্নকষ্টে আছে। কারণ কোনো ফসল ফলছে না। তখনো পৃথিবীর নাম ছিল ধরিত্রী। তিনি কোনো শস্য দিচ্ছেন না। তখন রাজা পৃথু তার তীর-ধনুক নিয়ে বের হলেন ধরিত্রীকে শায়েস্তা করতে। ধরিত্রী যেখানে গিয়েই লুকান, পৃথু সেখানে গিয়েই উপস্থিত হন। শেষে ধরিত্রী পৃথুর মেয়ে হতে রাজি হলেন। সেই সঙ্গে তার প্রজাদের শস্য দেওয়ারও অঙ্গীকার করলেন। পৃথুর মেয়ে হিসেবে, ধরিত্রীর নাম হলো পৃথিবী। পরে রাজা পৃথু পৃথিবীকে দোহন করে অমৃত ফলান।

www.pathagar.com

আবার দুর্বাসা মুনি ছিলেন ভীষণ বদরাগী। ভয়ে কেউ তাকে আতিথেয়তাও দিতে চাইত না। কখন কোন অপরাধে কাকে কী অভিশাপ দিয়ে দেন, তার তো ঠিক নেই। একবার শকুন্তলা তার আশ্রমে বসে বসে দুষ্মন্তের কথা ভাবছিলেন। তার আগেই দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার গান্ধর্বমতে বিয়ে হয়েছিল। শকুন্তলার পেটে তখন দুষ্মন্তের সন্তান। শকুন্তলাও বসে বসে দুষ্মন্তের কথাই ভাবছিলেন। এরই মধ্যে এলেন দুর্বাসা মুনি। আশ্রমে যে অতিথি এসেছে, তা শকুন্তলা খেয়ালই করলেন না। তিনি তো দুষ্মন্তের ভাবনাতে মশগুল। আর এইটুকু অবহেলার জন্যই দুর্বাসা তাকে এক ভীষণ অভিশাপ দিয়ে বসলেন। অভিশাপ দিলেন, যার কথা ভেবে শকুন্তলা তাকে আতিথেয়তা করলেন না, সেই দুষ্মন্ত আর শকুন্তলাকে চিনতেই পারবেন না। এই বদরাগী দুর্বাসা মুনি একবার অমৃতকেও অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপে অমৃতকে পৃথিবী ছেড়ে ক্ষীরোদ সাগরের তলদেশে চলে যেতে হয়।

তখন থেকেই অমৃত ক্ষীরোদ সাগরের একদম তলদেশে ছিল। তুলতে হলে সমুদ্র মন্থন ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সমুদ্র মন্থন করা যায় কীভাবে? এবারও সহায় হলেন বিষ্ণু। তিনি নিজে হলেন কূর্ম, মানে কচ্ছপ। মন্থনদণ্ড করা হল মন্দার পর্বতকে। আর মন্থনরজ্জু করা হল বাসুকী সাপকে। এবার সমুদ্র মন্থন করা গেল। উঠে এল অমৃত সুধা। বিষ্ণু নিজে দেবতাদের মধ্যে অমৃত বিতরণ করে দিলেন। দেবতারা সেই যে অমৃত খেলেন, তারা অমর হয়ে গেলেন; তাদের আর মৃত্যু হবে না। এবার তাদের জয় ঠেকায় কে!

অসুর শব্দটির সাথেও কিন্তু এই অমৃত সুধার যোগ আছে। তবে নেতিবাচক যোগ। অসুর শব্দটির অর্থই হলো যারা সুধা পায়নি। মানে, যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত সুধা পায়নি, তারাই অসুর। অবশ্য বেদের সবচেয়ে পুরনো অংশে শব্দটার অর্থ একেবারেই বিপরীত। সেখানে অসুর অর্থই দেবতা।

এমন যে অমৃত, যা খেলেই অমর হওয়া যায়, এর চেয়ে মূল্যবান আর কী হতে পারে! আর মূল্যবান জিনিসের প্রতি যদি কেউ বিতৃষ্ণা দেখায়, সেটাকে তো 'অমৃতে অরুচি'-ই বলতে হবে!

ধন্বন্তরি বিদ্যা
অর্থ : অব্যর্থ চিকিৎসা

ধন্বন্তরি ছিলেন দৈববৈদ্য, মানে দেবতাদের বৈদ্য। বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা যখন সমুদ্র মন্থন করলেন, তখন তিনিই অমৃতভাণ্ড হাতে সাগরের তলদেশ

www.pathagar.com

থেকে উঠে আসলেন। দেবতারা মূলত সমুদ্র মন্থন করছিলেন এই অমৃতের খোঁজেই। এই ধন্বন্তরি যেহেতু অমৃতভাণ্ড হাতে উঠে এলেন, তাই তাকেই দৈববৈদ্য করা হলো। পরে বিষ্ণু তার নাম দিলেন 'অব্জদেব'। আর তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পরের জন্মে তিনি আয়ুর্বেদ আট ভাগে ভাগ করবেন।

ধন্বন্তরি দ্বাপরযুগে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করলেন। তখন ধন্ব নামের এক ব্যক্তি অব্জদেব তথা ধন্বন্তরির আরাধনা করেছিলেন। ধন্ব চেয়েছিলেন, যে দেবতা তাকে বর দেবেন, তিনি নিজেই যেন তার ছেলে হয়ে জন্মান। কাজেই অব্জদেব তথা ধন্বন্তরি নিজেই ধন্বের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। তখন তার নাম রাখা হলো কাশীরাজ। এই কাশীরাজ মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি আয়ুর্বেদকে আট ভাগে ভাগ করেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় ধন্বন্তরির দখল ছিল অপরিসীম। আর সে জন্যই তিনি আয়ুর্বেদকে আট ভাগে ভাগ করার মতো কাজ করতে পেরেছিলেন। আর সে জন্য অব্যর্থ চিকিৎসা বোঝাতে তার প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়—ধন্বন্তরি বিদ্যা।

রাহুর গ্রাস
অর্থ : দুঃসময়

কশ্যপ মুনিকে বলা হয় সকল দেবদৈত্যের জনক। তিনি বিয়ে করেছিলেন দক্ষ প্রজাপতির তের মেয়েকে। কশ্যপের ঔরসে এই তেরজনের থেকে তেরটি ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। দক্ষ প্রজাপতির এই তের মেয়ের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন দনু। কশ্যপ-দনুর থেকেই দানবদের উৎপত্তি। কশ্যপ-দনুর সন্তানদের মধ্যে যারা সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছিল, তাদের একজন বিপ্রচিত্তি দানব। সিংহিকা ছিল তার সৎবোন (হিরণ্যকশিপুর বোন)। বিপ্রচিত্তি এই সিংহিকাকেই বিয়ে করেছিলেন। বিপ্রচিত্তি-সিংহিকার একুশটা ছেলে হয়েছিল। এরা সবাই গ্রহে পরিণত হয়েছিল। রাহু সেই একুশ ছেলেরই এক ছেলে।

বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা যেবার সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তুললেন, তখন সেখানে এই রাহুও গিয়ে উপস্থিত হলো। তখন দেবতারা অমৃত ভাগ-বাটোয়ারায় বসেছিলেন। বিষ্ণু মোহিনী-রূপ ধারণ করে সবাইকে অমৃত দিচ্ছিলেন। রাহু সেখানে এক দেবতার ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হলো। বিষ্ণুও চিনতে না পেরে, রাহুকেও অমৃত খেতে দিলেন। রাহুও অমৃত নিয়েই গলায় দিল ঢেলে। ওখানে তখন চন্দ্র আর সূর্যও ছিল। ওরা রাহুকে ঠিকই চিনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুকেও বলে দিলেন। আর যায় কোথায়, বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র ছুঁড়ে মারলেন। রাহুর মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

কিন্তু ততক্ষণে তো যা হওয়ার হয়ে গেছে। অমৃত রাহুর শরীরে প্রবেশ করেছে। কাজেই রাহু মারা গেল না। বরং ওর শরীরের দুটো অংশ দুটো আলাদা দানব হয়ে গেল। ওর মাথার অংশটা হল রাহু, আর দেহ-ভাগ হল কেতু। আর তখন থেকেই চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতা। সুযোগ পেলেই রাহু ওদের গ্রাস করে। চন্দ্রকে গ্রাস করলে হয় চন্দ্রগ্রহণ; সূর্যকে গ্রাস করলে হয় সূর্যগ্রহণ।

আবার প্রতি অমাবস্যার সময় রাহু চাঁদকে গ্রাস করার জন্য ছুটে যায়। তাই চাঁদ ছোট হতে থাকে, মানে ঢেকে যেতে থাকে। আর পূর্ণিমার সময় রাহু ছুটে যায় সূর্যকে গ্রাস করতে। ওদিকে আবার বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সারাক্ষণ আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে চক্রের প্রহরার কারণে রাহু চাঁদ-সূর্যকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে না। তাই সহজে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণও হতে পারে না।

আরেক পুরাণে চাঁদ আর রাহুর আকার-আকৃতিও বলা আছে। চাঁদের, মানে চন্দ্রমণ্ডলের বিস্তার ১২ যোজন। আর রাহুর শরীরের বিস্তার ১৩ যোজন।

দুঃসময়ও অনেকটা এই রাহুর মতোই। চাঁদ-সূর্য যেমন রাহুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, দুঃসময়ের গ্রাস থেকেও মানুষ তেমনভাবেই পালিয়ে বেড়াতে চায়। রাহুর মতোই ভয় পায় দুঃসময়কে। আর যে একবার দুঃসময়ের গ্রাসে পড়ে, তার অবস্থাও গ্রহণ লাগা চাঁদ-সূর্যের মতোই হয়। তখন সে যেন কোনো আশার আলোই দেখতে পায় না। তার জীবনের চাঁদ-সূর্যকে তখন কে যেন রাহুর গ্রাসের মতোই ঢেকে ফেলে। আর তাই দুঃসময় বোঝাতে এই ভয়ঙ্কর দানবকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করে এই বাগধারাটির প্রচলন হয়েছে।

রাহুর দশা

অর্থ : ভয়ানক কষ্টে পড়া, দুঃসময়

পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। এদের মধ্যে সোমকে অনেক পুরাণেই চন্দ্র বা চাঁদের সাথে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে। আরেক পুরাণে আছে, শনি মূলত সূর্যের ছেলে। সূর্যের স্ত্রী ছিল সংজ্ঞা। কিন্তু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা তাকে ফেলে চলে আসেন। রেখে আসেন তার ছায়াকে। সূর্য ছায়াকেই জানতেন সংজ্ঞা বলে। এই সূর্য ও ছায়ার দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে শনি।

আধুনিক বিজ্ঞানে অবশ্য এদের সবাই গ্রহের স্বীকৃতি পায়নি। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি পেয়েছে গ্রহের স্বীকৃতি। রবি বা সূর্য গ্রহ নয়, নক্ষত্র।

www.pathagar.com

সোম বা চাঁদ উপগ্রহ। আর রাহু ও কেতু দুটি নভো-বিন্দু। মানে আকাশের বুকে দুটি অবস্থান মাত্র। অর্থাৎ এদের বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে পুরাণে এই দুজনের অস্তিত্ব আছে। আছে বেশ ভালোভাবেই। এই রাহু ও কেতু মূলত একই দানব ছিল—রাহু। পরে এই রাহুই দুই ভাগ হয়ে হয় রাহু আর কেতু।

পুরাণে (এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে) এই গ্রহগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মানুষের জীবনে। মানুষের জন্মের সময় থেকেই তার জীবনের উপর এই গ্রহগুলোর প্রভাবের শুরু। মানুষের উপর গ্রহের এই প্রভাবকে দশা বলে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন গ্রহের দশা ভোগ করে।

গ্রহগুলোর এই দশার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হলো রাহুর দশা। রাহুর দশার সময় মানুষ নানা কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। এমনকি রাহুর দশায় মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। তাই মানুষ যখন ভয়ানক কষ্টে পড়ে, ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন বলা হয় তার রাহুর দশা চলছে।

অতি মন্থনে বিষ (গরল) ওঠে

অর্থ : ভালো কোনো কিছু বেশিবার (ব্যবহার) করলে তাই মন্দ হয়ে ওঠে
অনুরূপ : লেবু বেশি চটকালে তেতো হয়

অসুরদের সাথে যুদ্ধে বেকায়দায় পড়ে, বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তোলার ব্যবস্থা করলেন। এই অমৃত পান করলে আর দেবতাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই সমুদ্র মন্থন তো আর সামান্য ব্যাপার ছিল না। তাই নিয়ে ভীষণ কাণ্ড ঘটতে লাগল। মন্থন শুরু হলে, পরিশ্রমে বাসুকী সাপের মুখ থেকে আগুনের মতো গরম বাতাস বের হতে লাগল। সে বাতাসে জলের অনেক প্রাণী মারা গেল। মন্থনের চোটে বিকট শব্দ হতে লাগল। মন্দার পর্বতের বহু গাছ ভেঙে পড়তে লাগল। গাছে গাছে ঘষা লেগে পর্বতে আগুন লেগে গেল। সে আগুনে বহু জন্তু-জানোয়ার পুড়ে মারা গেল। শেষে ইন্দ্র বৃষ্টি ঝরিয়ে সে আগুন নেভালেন।

ব্যাপার দেখতে অসুররাও সেখানে চলে এল। এসে, ব্যাপার দেখে, তারাও অমৃতের জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিল। তখন বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধরে কৌশলে দেবতাদের জন্য অমৃত নিয়ে চলে আসলেন। তারপর নিজে সেই অমৃত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। দেবতারা সেই যে অমৃত খেলেন, তারা অমর হয়ে গেলেন; তাদের আর মৃত্যু হবে না।

কিন্তু অসুররা তো তখনো অমৃত পাননি। তাই সমুদ্র মন্থন চলতেই থাকল। প্রথমে তো অমৃত উঠেছিল। এবার একে একে উঠতে লাগল দই,

www.pathagar.com

সুরা, সোম, লক্ষ্মী, অশ্ব, কৌস্তুভ আর পারিজাত। সবশেষে উঠল কালকূট বা গরল। মানে বিষ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষ। তখন আবার সবাই শিবের শরণাপন্ন হলো। শিব সেই বিষ নিজের গলায় ধারণ করলেন। বিষের প্রভাবে তার গলার রং নীল হয়ে গেল। তখন থেকে শিবের আরেক নাম হলো নীলকণ্ঠ। সে সময় আবার খানিকটা বিষ নিচে পড়ে গিয়েছিল। সেই বিষটুকুই পৃথিবীর সব বিষধর পশু-পাখি-সাপেরা ভাগাভাগি করে নিল।

এভাবে, অমৃতের জন্য যে ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করা শুরু হয়েছিল, অতিরিক্ত মন্থন করায় সে সমুদ্র থেকেই গরল উঠল। একই রকম ভাবে, কোনো ভালো কাজ বেশি বেশি করলে, তার থেকেই খারাপ ফল ফলতে শুরু করে। তেমনই, কোনো ভালো জিনিস বেশি বেশি ব্যবহার করা হতে থাকলে, সেটাই মন্দ ফল দিতে শুরু করে। সে কথা বোঝাতেই এই বাগধারা ব্যবহার করা হয়।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী

অর্থ : রূপে-গুণে অতুলনীয়া নারী

দেবী লক্ষ্মী শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। মানে, সুন্দর আর ধনরত্নের দেবী। আর সরস্বতী বিদ্যার দেবী। বিশেষত, কবিদের ইষ্টদেবতা তিনি। আর তারা দুজনেই ছিলেন বিষ্ণুর স্ত্রী।

লক্ষ্মী শ্রীর দেবী, তাই তিনি নিজেই অতুলনীয় সুন্দরী। দেবীদের মধ্যেও তিনি একটু বেশিই সুন্দরী। তার বাবা মহর্ষি ভৃগু, মা দক্ষকন্যা খ্যাতি। এই দেবী লক্ষ্মীর হাতে সব সময় পদ্ম থাকে। সমুদ্র মন্থনের সময় তিনি যখন উঠে এসেছিলেন, তখনও তার হাতে এই পদ্ম ছিল।

অবশ্য তার সমুদ্র মন্থনে উঠে আসার গল্পের শুরুটা আরো অনেক আগের। তখন লক্ষ্মী স্বর্গেই থাকতেন। স্বামী বিষ্ণুর সাথে বেশ নির্বিবাদেই স্বর্গবাস করছিলেন। একবার দুর্বাসা মুনি একটা পারিজাত, মানে মান্দার ফুলের মালা বানিয়ে ইন্দ্রকে দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তখন রম্ভার সঙ্গে প্রেমলীলায় ব্যস্ত। হাতের কাছে একটা হাতি পেলেন, তাকেই পরিয়ে দিলেন দুর্বাসা মুনির দেয়া মালাটা। হাতিটাও মাথা নেড়েচেড়ে মুহূর্তেই সেই মালা ছিঁড়ে ফেলল। তাতে দুর্বাসা মুনি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এমনিতেই তার রাগ বেশি। সহজেই ক্ষেপে যান। রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন—স্বর্গ লক্ষ্মীহীন হবে। তখন আর কি, লক্ষ্মীকে স্বর্গ ছাড়তেই হলো। স্বামী বিষ্ণুর অনুমতি নিয়ে তিনি চলে গেলেন সমুদ্রে। সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে তখন স্বর্গ একেবারেই লক্ষ্মীহীন হয়ে পড়ল। স্বর্গে কোনো সুন্দরও নেই, শ্রীও নেই, ঐশ্বর্যও নেই। তখন দেবতারা গিয়ে সবাই মিলে ধরলেন বিষ্ণুকে। শেষে বিষ্ণু বুদ্ধি দিলেন, সমুদ্র মন্থন করতে হবে। পরে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করলে, লক্ষ্মী হাতে পদ্ম নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এলেন।

তখন আবার অসুররা ভাবল, এটাই সুযোগ। লক্ষ্মীকে পাওয়া গেলে, শ্রী আর ঐশ্বর্য—দুই-ই তাদের কাছে থাকবে। তখন তারাও লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য জোরাজুরি শুরু করল। কিন্তু দেবতারা তো কিছুতেই লক্ষ্মীকে ছাড়বেন না। তাই নিয়ে দুপক্ষে বেশ একটা গণ্ডগোল লেগে গেল। এবারও উদ্ধার করলেন লক্ষ্মীর স্বামী বিষ্ণু। তিনি মায়া বিস্তার করে সেখান থেকে লক্ষ্মীকে নিয়ে এলেন স্বর্গে। তখন স্বর্গেরও আবার শ্রী ফিরল। ঐশ্বর্যও ফিরে এল।

আবার সরস্বতী দেবীকে বলা হয় বিদ্যার দেবী। অবশ্য, সব পুরাণে তাকে বিদ্যার দেবী হিসেবে বলা হয়নি। একদম পুরনো যে পুরাণগুলো, সেগুলোতে তো সরস্বতী দেবীরই উল্লেখ নেই। সেগুলোতে বরং সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। সে নদী প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর অন্যতম। সপ্তসিন্ধুর বাকি ছয়টি নদী হলো—রাবতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও সিন্ধু।

তখন এই সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিরা বসবাস করতেন। সব সময়ই তাদের কেউ না কেউ সেখানে বেদ পড়তেনই। অর্থাৎ সে নদীর তীরে সব সময়ই বেদধ্বনি উচ্চারিত হতো। সেখান থেকেই বলা শুরু হলো, এই সরস্বতী নদীতেই বাগদেবীর বাস। সম্ভবত সেখান থেকেই, সরস্বতী নদীর দেবীকেই বাগদেবী বলা শুরু হয়। পরে সরস্বতী-ই হয়ে ওঠেন বিদ্যার দেবী।

এই বিদ্যার দেবী সরস্বতীর জন্ম নিয়ে অনেকগুলো মত প্রচলিত আছে। একটা পুরাণে বলা হয়েছে, পরমাত্মার মুখ থেকে দেবী সরস্বতীর জন্ম। আরেক পুরাণে বলা হয়েছে, তার জন্ম কৃষ্ণের গলা থেকে। আরেক পুরাণে আছে, তার জন্ম ব্রহ্মার থেকে। ব্রহ্মা একবার ধ্যান করছিলেন। ধ্যান করতে করতে, তার সবগুলো গুণই বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে, তার এই সবগুলো গুণ একসাথে হয়ে, সরস্বতীর রূপে তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। ব্রহ্মা তখন তার নাম দেন সরস্বতী। ব্রহ্মাই তখন বলেন, সরস্বতী সকলের জিভে (জিহ্বাগ্রে) অবস্থান করবেন।

অনেক পুরাণে অবশ্য সরস্বতীকে বিষ্ণুর নয়, ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে। রামায়ণেও সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কুম্ভকর্ণ একবার ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ভীষণ তপস্যায় বসেছিলেন। ব্রহ্মা তখন বেশ ভালোই বিপদে পড়লেন। এদিকে কুম্ভকর্ণের সেই ভীষণ তপস্যার পর, তাকে বর দিতেই হয়। আবার দেবতারা সবাই জোট পাকিয়ে তাকে নিষেধ করছে।

www.pathagar.com

কারণ, কুম্ভকর্ণ চাইছিল অমরত্ব। আর তার যে খিদা, অমরত্ব পেলে সে গোটা দুনিয়াই খেয়ে ফেলবে। তখন ব্রহ্মা তার স্ত্রী সরস্বতীর শরণ নিয়েছিলেন। সরস্বতী তো সবার জিভে অবস্থান করতে পারেন। সেবারও তিনি তাই করলেন। আর বর চাওয়ার সময় হলে, কুম্ভকর্ণ বললেন—অনন্ত জীবন। সরস্বতী সেই কথাটাই খানিকটা বদলে দিয়ে বলালেন—অনন্ত নিদ্রা।

ব্রহ্মা যে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেছেন, সেটা আরেকটা পুরাণেও আছে। তবে সেখানে কাহিনিটা ভিন্ন। তাতে বলা আছে, ব্রহ্মা ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদি সৃষ্টি করার পর সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলে, তখন সরস্বতী নিজেই জানান, শব্দব্রহ্ম থেকে তার জন্ম। তখন ব্রহ্মা বলেন, সরস্বতীর স্থান হবে কবিদের মুখে। আর সে কারণেই তিনি কবিদের ইষ্টদেবতা।

অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, লক্ষ্মী হলেন শ্রী বা সৌন্দর্যের দেবী। আর সরস্বতী বিদ্যা-বুদ্ধির দেবী। আর তাই কোনো মেয়ে যদি রূপে-গুণে অতুলনীয়া হয়, দেখতেও যেমন সুন্দর, তেমনি বিদ্যায়-বুদ্ধিতেও অসাধারণ, মানে যেমন তার রূপ, তেমনি তার গুণ, তেমন মেয়েদের প্রশংসা করতে বলা হয়, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়

অর্থ : উপকারীর উপকারে বাধা দেয়া

দেবী লক্ষ্মী শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। মানে, সুন্দর আর ধনরত্নের দেবী। তিনি মহর্ষি ভৃগু আর দক্ষকন্যা খ্যাতির মেয়ে। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে যখন লক্ষ্মীকে স্বর্গ ছাড়তে হলো, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ শ্রী ও ঐশ্বর্যও হারায়। পরে বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে ফিরে পান। পরে তাকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনলে, স্বর্গের শ্রী আর ঐশ্বর্যও ফিরে আসে।

অর্থাৎ লক্ষ্মী যেখানে যান, ঐশ্বর্য, মানে ধনরত্নও সেখানেই আসে। যার বাসায় লক্ষ্মী আসেন, ধনরত্ন তার বাসাতেই আসে। তিনি চলে গেলে, সে বাড়িতে আর ধনরত্নও আসে না, সে বাড়ির আর শ্রীবৃদ্ধিও হয় না। লক্ষ্মীর একটা পার্থিব রূপ আছে। সেই পার্থিব লক্ষ্মীই এ কাজ করেন। তিনিই ঠিক করে দেন, কার বাড়িতে ধনরত্ন হবে, কার বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হবে।

এখন কারো বাড়িতে লক্ষ্মী যেতে চাইলে, সে যদি দুয়ারে আগড় (আগল) দেয়, সেটাকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! লক্ষ্মী তার বাড়িতে আসতে চাইছেন মানে, দেবী নিজে তাকে ধনরত্ন দিতে চাইছেন, তার বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি করতে চাইছেন। অথচ সে নিজে ঘর বন্ধ করে রাখছে, দেবীকে ঢুকতে

www.pathagar.com

দিতে চাইছে না। এ রকম কেউ যদি তার উপকারীর উপকারের চেষ্টায় বাধা দেয়, তখন বলা হয়, সে লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড় দিচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

অর্থ : যে ভাণ্ডার নিঃশেষ হয় না, অনেক বড়লোক

দেবী লক্ষ্মী শ্রী আর ঐশ্বর্যের দেবী। সোজা বাংলায়, সুন্দর আর ধনরত্নের দেবী। আর তাই তিনি নিজে যেমন অতুলনীয়া সুন্দরী, তেমনি তার ভাণ্ডার ধনরত্নে সমৃদ্ধ। এই লক্ষ্মীর একটা পার্থিব রূপ আছে। এই পার্থিব লক্ষ্মীই পৃথিবীতে কার কত সম্পদ হবে, তা ঠিকঠাক করেন। তিনিই ঠিক করে দেন, কে ধনী হবে, কে হবে দরিদ্র। এমনকি কে কখন ধনী হবে, বা কোনো ধনী লোক কখন গরিব হবে, তাও তিনিই ঠিক করেন। এই পার্থিব লক্ষ্মী আবার ভীষণ চঞ্চল। তাই তিনি যখন তখন যাকে তাকে ধনী বা দরিদ্র করে দেন।

যে লক্ষ্মী এমনি ভাবে সকল মানুষের ঐশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তার ভাণ্ডার যে কত সমৃদ্ধ, তা তো বোঝাই যায়। আর কারো কাছে যদি সেই ভাণ্ডার থাকে, তার তো খরচের হিসাব করার প্রয়োজনই নেই। সে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। যত খুশি, যখন খুশি, যেভাবে খুশি। কারো যদি তেমন অবস্থা হয়, যত ইচ্ছা খরচ করে তবু ভাঁড়ার ফুরোয় না, সম্পদ শেষ হয় না, তখন বলা হয়, তার ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে।

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায়

অর্থ : কপাল মন্দ হলে অসম্ভব অনিষ্টও সাধিত হয়

পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে যে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) কথা বলা হয়েছে, তার একটি এই শনি। গ্রহগুলোর মধ্যে যে কয়টি গ্রহ সবচেয়ে অমঙ্গলজনক, শনি তাদের অন্যতম। এই শনি মূলত সূর্য ও ছায়ার ছেলে। ছায়া আবার ঠিক সূর্যের স্ত্রী নয়। সূর্যের স্ত্রী হলো সংজ্ঞা। সংজ্ঞা একবার সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে তার স্থলে ছায়াকে রেখে চলে গিয়েছিলেন। তখন ছায়ার গর্ভে সূর্যের তিন সন্তান হয়। তাদেরই একজন এই শনি। শনি এমনিতেই খুব একটা সুবিধার লোক ছিলেন না। তার উপর তার স্ত্রী তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তিনি যার দিকে তাকাবেন, সেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে সে যাকে বলে বেশ ভয়ঙ্কর।

একবার এই শনির সঙ্গে লক্ষ্মীর একটা বড় রকমের ঝগড়া বেধে গেল। তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই নিয়ে। কিন্তু ঝগড়া করে তো আর কোনো

www.pathagar.com

ফলাফলে আসা যায় না। তখন তারা ঠিক করলেন, শ্রীবৎসকে বলবেন, এই তর্কের মীমাংসা করে দিতে। শ্রীবৎস ছিলেন অযোধ্যার রাজা। তার স্ত্রীর নাম চিন্তা। তো এই জটিল সমস্যার কথা শুনে শ্রীবৎস ভাবলেন, এই সমস্যার সমাধান দেয়া তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। দুই দেবতার মধ্যে একজনকে শ্রেষ্ঠ বললে, আরেকজন তো রুষ্ট হবেনই। তখন শ্রীবৎস একটা কৌশলী সমাধানের কথা ভাবলেন। একটা দিন ঠিক করে দিলেন। সেদিন লক্ষ্মী আর শনিকে তার কাছে আসতে হবে। এর মধ্যে তিনি দুটো সিংহাসন বানালেন। একটা সোনা দিয়ে, আরেকটা রূপা দিয়ে।

নির্দিষ্ট দিনে লক্ষ্মী আর শনি দুজনেই এসে হাজির হলেন। এসে, লক্ষ্মী গিয়ে বসলেন সোনার সিংহাসনে। আর শনি বসলেন রূপার সিংহাসনে। ব্যস, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা প্রমাণ হয়ে গেল। শ্রীবৎসকে কিছুই বলতে হলো না। লক্ষ্মীও খুশি হয়ে রাজা শ্রীবৎসকে আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় নিলেন।

শনি কিন্তু একদমই খুশি হতে পারলেন না। এমনিতেই তিনি লোক ভালো না। মেজাজটাও উগ্র। ক্ষেপে গিয়ে তিনি তক্কে তক্কে থাকলেন, কখন কীভাবে রাজা শ্রীবৎসের ক্ষতি করা যায়। একদিন সে সুযোগও মিলে গেল। শ্রীবৎস সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পরে পা ধুতে ভুলে গেলেন। ব্যস, সেই অপবিত্র পা দিয়ে শ্রীবৎসের শরীরে ঢুকলেন শনি। তারপর শ্রীবৎসের জীবনে, যাকে বলে একদম শনির দশা শুরু হলো। দিন দিন তার রাজ্যের সমৃদ্ধি কমতে লাগল। শেষে তিনি রাজ্যহারা হলেন। একে অভাবগ্রস্ত, তার উপর রাজ্যহীন হয়ে তিনি তার স্ত্রী চিন্তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যা কিছু রত্নটত্ন অবশিষ্ট ছিল, একটা কাঁথায় জড়িয়ে নিলেন।

চলতে চলতে সামনে পড়ল এক নদী। আসলে সেটা নদী ছিল না। শনিই মায়াবলে তাদের সামনে সে নদী বানালেন। সে নদীতে খেয়াপারের একটিমাত্র নৌকা। সে নৌকাও এত ভাঙাচোরা, জীর্ণশীর্ণ, তাতে একটার বেশি জিনিস নিয়ে পার হওয়া যায় না। তখন শ্রীবৎস প্রথমে কাঁথায় মোড়ানো রত্নগুলো পার করতে দিলেন। মাঝিকে বললেন, ওগুলো ওপারে রেখে ফিরে এসে, একে একে তাদের নিয়ে যেতে। কিন্তু সে মাঝি তো স্বয়ং শনি! তিনি সেসব রত্ন নিয়ে মাঝনদীতে গিয়ে, নৌকাসমেত উধাও হয়ে গেলেন।

এবার শ্রীবৎস একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তাদের কাছে টাকা-পয়সা ধন-সম্পত্তি আর কিচ্ছু নেই। রাজ্যও নেই, ঘরবাড়িও নেই। অসহায় হয়ে শ্রীবৎস আর চিন্তা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে তাদের খিদেও লেগে গেল। খাবারের সন্ধানে শ্রীবৎস নদীতীরে গেলেন। সেখানে গিয়ে একটা শোল মাছ ধরলেন। খাওয়ার জন্য মাছটিকে পোড়ালেনও। তারপর নদীতে

www.pathagar.com

নিয়ে গেলেন, পোড়ানোর সময় মাছটির গায়ে যে কয়লার গুঁড়ো লেগেছিল, তা ধুতে। তখন শনি মুচকি হাসলেন। শ্রীবৎস যেমনি শোল মাছটিকে নদীর পানিতে ধুতে নিলেন, অমনি শনির কৌশলে পোড়া শোল মাছটিও জ্যান্ত হয়ে উঠল। লেজ নেড়ে নদীর জলে পালিয়ে গেল।

এরপরও শনির কারণে শ্রীবৎস আর চিন্তাকে আরো অনেক দুর্দশা ভোগ করতে হয়। এক মহাজন চিন্তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। তখন অসহায় চিন্তা সতীত্ব রক্ষার জন্য সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেন। সূর্য তার চাওয়া পূর্ণ করে তাকে কুরূপা করে দেন। শেষে এক রাজার সাহায্যে শ্রীবৎস চিন্তাকে ফিরে পান। তাদের সাহায্যেই ফিরে যান অযোধ্যায়। তখন লক্ষ্মী তাকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দেন। সঙ্গে ফিরিয়ে দেন তাদের ধন-সম্পত্তিও। আর চিন্তার রূপ।

যাদের কপালে শনি থাকে, মানে কপাল ভীষণ মন্দ হয়, তাদের দুর্দশার জন্য জোরালো কোনো কারণ লাগে না। তখন তার দুর্দশার জন্য অসম্ভব সব ঘটনাও ঘটে। যেমন শ্রীবৎসের পোড়ানো শোল মাছ নদীতে পালিয়ে গিয়েছিল। তেমনি অসম্ভব কোনো ঘটনা ঘটে যখন কেউ দুরবস্থায় পড়ে, তেমন পরিস্থিতিতে বলা হয়, শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায়।

ধ্রুব সত্য

অর্থ : স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণ বা যুক্তি ব্যতিরেকে সত্য বলে গৃহীত উক্তি, চরম সত্যের পরাকাষ্ঠা

রাজা উত্তানপাদের ছিল দুই রানি—সুনীতি আর সুরুচি। সুনীতি বড় রানি ছিল বটে, কিন্তু রাজা ছোট রানিকেই বেশি পছন্দ করতেন। আর সুরুচিও তার সুবিধা নিয়েছিল ষোল আনা। সে রাজাকে প্ররোচিত করে বড় রানিকে বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে একা একা বাস করতেন সুনীতি। আর সুরুচি বাস করত রাজার সাথে, রাজপ্রাসাদে।

একদিন রাজা উত্তানপাদ মৃগয়ায় গেছেন, মানে বনে হরিণ শিকার করতে গেছেন। বনে হরিণের পিছে ঘুরতে ঘুরতে পথ ভুল করে চলে গেলেন সুনীতির কুটিরে। পরে তারা মিলিতও হলেন। সে মিলনে সুনীতির কোল আলো করে জন্ম হলো ধ্রুব-র। ওদিকে সুরুচিরও কোল জুড়ে আসে এক ছেলে, নাম উত্তম।

একদিন ধ্রুব গেলেন রাজসভায়। গিয়ে দেখলেন, উত্তম বাবার কোলে বসে আছে। দেখে তিনিও বাবার কোলে বসার আবদার জুড়ে দিলেন। পাশ থেকে সৎমা সুরুচি মুখ ঝামটা দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল। বলল, ধ্রুব আগে তপস্যা করে আসুক। তারপর না হয় বাবার কোলে বসার কথাটা ভেবে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

ধ্রুব তো মন খারাপ করে মায়ের কাছে ফিরে এলেন। সব শুনে মা বললেন, হরিই ভরসা। মানে বিষ্ণু, বা নারায়ণই ভরসা। তিনিই কেবল দুঃখীদের দুঃখমোচন করতে পারেন। এবার ধ্রুব হরিকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। হরিকে পেতে তিনি রাতের আঁধারে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে গেলেন। হরির অন্বেষণে পুবদিকে রওয়ানা দিলেন। যেতে যেতে যেতে একদিন তিনি সাত জন মুনির দেখা পেলেন। এই সাত মুনি মূলত সপ্তর্ষি, ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র। তারা জিজ্ঞেস করলে, ধ্রুব জানালেন, তিনি অর্থ-বিত্ত-রাজ্য এসব কিছুই প্রার্থনা করেন না। তার প্রার্থনা, তাকে এমন একটা স্থান দেয়া হোক, যেখানে কেউ আগে কখনো যায়নি। তার বাবাও যাননি।

কিন্তু এমন স্থান তো সেই মুনিদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তারা ধ্রুবকে বিষ্ণুর কথা বাতলে দিলেন। জানালেন, অমন জায়গা যদি কেউ দিতে পারে, তবে বিষ্ণুই দিতে পারবেন। আর তাই শুনে ধ্রুব বিষ্ণুকে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলেন। সে তপস্যার তাপে দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। তারা নানাভাবে তার তপস্যা ভাঙানোর চেষ্টা করলেন। নারদ এসে তাকে থামানোর চেষ্টা করলেন। তার তপস্যা থামাতে এসে এমনকি তার মা সুনীতিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

শেষমেশ দেবতাদের বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হতে হলো। তখন বিষ্ণু গেলেন ধ্রুব-র কাছে। গিয়ে জানালেন, তিনিই হরি। তিনি ধ্রুবকে বর চাইতে বললেন। ধ্রুব চিরদিন বিষ্ণুর স্তব করতে পারার বর চাইলেন। বিষ্ণু খুশি হয়ে তাকে আরো কয়েকটি বর দিলেন। বর দিলেন যে, ধ্রুব পিতৃরাজ্য পাবে, দীর্ঘ ৩৬ বছর সে রাজ্য শাসন করবে। এটাও জানিয়ে দিলেন, তার সৎভাই উত্তম মৃগয়াতে গিয়ে, মানে বনে হরিণ শিকার করতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। আর সৎমা ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দাবানলে মারা যাবে।

এত কিছুর মধ্যে ধ্রুব তার পুরনো সেই—কেউ-যায়নি-এমন জায়গার প্রার্থনার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বিষ্ণুই তাকে সে কথা মনে করিয়ে দিলেন। জানালেন, ধ্রুব আগের জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন। সে জন্মে এক রাজার ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই রাজপুত্রকে দেখে তারও রাজার ঘরে জন্মানোর ইচ্ছে হয়েছিল। সে জন্যই ধ্রুব এই জন্মে রাজা উত্তানপাদের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। বিষ্ণুকে আরাধনার মধ্য দিয়ে ধ্রুব-র সেই কামনা থেকে মুক্তি মিলেছে। কাজেই মৃত্যুর পরে সে সব তারা ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপরে স্থান পাবে। যেখানে কেউ আগে কখনো যায়নি। সেখানে গিয়ে সে সব গ্রহ-নক্ষত্রের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকবে। সে জায়গার নাম হবে ধ্রুবলোক।

পরে ধ্রুব পিতার রাজ্য লাভ করেন। তারপর বিয়ে করে সংসারীও হন। তার দুই ছেলে হয়। ৩৬ বছর রাজ্য শাসন করার পর তিনি মারা যান। মৃত্যুর

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে ধ্রুব দেহত্যাগ করে ধ্রুবলোকে যান। সেখানে গিয়ে তিনি 'ধ্রুবতারা' রূপে বিরাজ করছেন।

এই ধ্রুবলোক, ধ্রুবতারা তথা ধ্রুব-র এই কাহিনি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে 'ধ্রুবসত্য' বাগধারাটির। ধ্রুবলোকে, মানে আকাশে ধ্রুব তথা ধ্রুবতারা যেমন সর্বদা সবার উপরে বিরাজ করে, তেমনি যে সব সত্য স্বতঃসিদ্ধ, সর্বক্ষেত্রে-সবার ক্ষেত্রেই সত্য, কখনোই তাদের ব্যত্যয় ঘটে না, সেগুলোকেই বলা হয় ধ্রুবসত্য।

ধুন্ধুমার কাণ্ড

অর্থ : ভীষণ আয়োজন/ভীষণ ব্যাপার

'ধুন্ধুমার কাণ্ড'-এর এই 'ধুন্ধুমার' ছিল অযোধ্যার রাজা। তার আসল নাম কুবলাশ্ব। তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা। অবশ্য তার নাম যখন ধুন্ধুমার হল, তখনও তিনি রাজা হননি। তখন অযোধ্যার রাজা তার বাবা বৃহদশ্ব। সে সময় ধুন্ধু নামে এক দানব ছিল; মধুকৈটভের পুত্র। মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রম ছিল মরুপ্রদেশে। কাছেই ছিল এক বালুর সাগর। নাম উজ্জ্বালক। সেই বালুর সাগরে থাকত এই ধুন্ধু। আর সেই বালুর সাগরের গভীরে সে ঘুমাত। ঘুমের মধ্যে একেক বছর শেষে সে যখন নিঃশ্বাস ফেলত, ধুলো-ধোঁয়া-আগুনের যে ঝড় উঠত, তাতে এমনকি সূর্যও ঢাকা পড়ে যেত। আর ভূমিকম্প হত টানা এক সপ্তাহ।

এই ধুন্ধু তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল—দেব-দানব-রাক্ষস-যক্ষ-গন্ধর্ব-নাগ কেউ তাকে মারতে পারবে না। আর বর পাওয়ার পর শুরু করল শয়তানি। লুকিয়ে লুকিয়ে উতঙ্কের আশ্রমে নানা উপদ্রব করত সে। তখন মহর্ষি উতঙ্ক বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। এখন বিষ্ণু তো কিছু করতেও পারেন না; কারণ ব্রহ্মার বর আছে ধুন্ধুর সঙ্গে। তখন তারা এক বুদ্ধি আঁটলেন। সে মোতাবেক, মহর্ষি উতঙ্ক অযোধ্যার রাজা বৃহদশ্বকে অনুরোধ করলেন ধুন্ধুকে বিনাশ করতে। বৃহদশ্ব সে দায়িত্বে নিয়োগ করলেন তার পুত্র কুবলাশ্বকে। ওদিকে আবার বিষ্ণু প্রবেশ করলেন কুবলাশ্বের দেহে। তারপর কুবলাশ্ব রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে ফেললেন ধুন্ধু বধের জন্য। কুবলাশ্বের ছিল একুশ হাজার ছেলে। সে তার একুশ হাজার পুত্র নিয়ে রওয়ানা হলেন ধুন্ধু বধের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত তো রয়েছেই। কুবলাশ্ব তার এই বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন উজ্জ্বালক বালু-সাগরে। তারপর খুঁড়তে খুঁড়তে বের করে ফেললেন ধুন্ধুকে।

www.pathagar.com

ধুন্ধুও কী কম যায়! সঙ্গে সঙ্গে মুখের আগুনে কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্রকে পুড়িয়ে ফেলল। এদিকে কুবলাশ্বের সঙ্গে যে স্বয়ং বিষ্ণুই আছেন। তিনি তখন যোগমায়ার প্রভাবে ধুন্ধুর মুখের আগুন নিভিয়ে ফেললেন। তারপর ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে বধ করলেন ধুন্ধুকে। তখন থেকেই তার নাম 'ধুন্ধুমার'। আর বিষ্ণুর সাহায্যে তার এই বিশাল আয়োজন করে ধুন্ধু বধের কাহিনি থেকেই এসেছে 'ধুন্ধুমার কাণ্ড' বাগধারাটি।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ

অর্থ : মন্দদের দলে/বংশে ভালো লোক

কশ্যপ ঋষিকে বলা যায় দেব-দৈত্যসহ সৃষ্টিজগতের সকল প্রাণীর জনক। ব্রহ্মা থেকে তার জন্ম। আবার অনেক পুরাণে তার জন্ম ব্রহ্মার থেকে না হলেও, সেগুলোতেও তাকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে। এই কশ্যপ বিয়ে করেছিলেন দক্ষ প্রজাপতির তের মেয়েকে—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি।

কশ্যপের এই তের স্ত্রীর গর্ভে সৃষ্টির তের রকমের জাতি বা প্রাণীর উদ্ভব হয়। অদিতির থেকে জন্ম নেয় দেবগণ। দিতির থেকে দৈত্যগণ। দনুর গর্ভে জন্ম নেয় দানবেরা। এমনি কাষ্ঠার গর্ভে ঘোড়া ও অন্যান্য পশুরা, অরিষ্ঠার গর্ভে গন্ধর্বরা, সুরসার গর্ভে রাক্ষসরা, ইলার গর্ভে গাছপালা, মুনির গর্ভে অপ্সরা, ক্রোধবশার গর্ভে পিশাচরা, তাম্রার গর্ভে পাখিরা, সুরভির গর্ভে গরু-মহিষ, সরমার গর্ভে শিকারি প্রাণী আর তিমির গর্ভে জলজ প্রাণীদের জন্ম হয়।

এই তের স্ত্রীর মধ্যে একদিন দিতি কশ্যপের কাছে এসে এক বলবান পুত্র কামনা করলেন। কিন্তু তখন দিতি আসলে কামাতুর ছিলেন, আর অপবিত্রও ছিলেন। কাজেই কশ্যপ তার কামনা পূরণ করলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে শাপও দিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, দিতির দুই ছেলে হবে—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তারা শক্তিশালীও হবে, কিন্তু ভালো হবে না। দুর্জন হবে। তারা সবাইকে অত্যাচার করে বেড়াবে।

শুনে দিতি কেবল এই প্রার্থনা করলেন, যাতে ভগবান বিষ্ণুর হাতে তাদের মৃত্যু হয়। কশ্যপ সে প্রার্থনাটুকু মঞ্জুর করলেন। জানালেন, ভগবান বিষ্ণু অবতাররূপে এসে তার দুই ছেলেকে বধ করবেন। সঙ্গে এও জানালেন, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক ছেলে হবে, যে তাদেরকে পবিত্র করবে।

পরে দিতির দুই ছেলে হয়—হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। তারা সবাইকে ভীষণ অত্যাচার করতে শুরু করে। তখন বিষ্ণু বরাহ অবতার হয়ে এসে প্রথমে

www.pathagar.com

হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করেন। তখন হিরণ্যকশিপু ক্ষেপে গিয়ে বিষ্ণুকে হত্যা করতে মনস্থ করে। সে জন্যে, পাশাপাশি অদ্বিতীয়-অজেয়-অমর রাজা হওয়ার বাসনায় সে ব্রহ্মার তপস্যা করতে শুরু করে। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলে, তার কাছ থেকে বর চেয়ে নেন, যাতে কোনো দেব, দানব, মানব বা জন্তুর হাতে তার মৃত্যু না হয়।

হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীর নাম কয়াধু। তাদের চার ছেলে—হ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ ও প্রহ্লাদ। বাবা-চাচারা ভয়ঙ্কর বিষ্ণু-বিদ্বেষী হলেও, প্রহ্লাদ আবার ছিলেন ভীষণ বিষ্ণুভক্ত। কোনোভাবেই তার এই ভক্তি টলাতে না পেরে তার বাবা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। একবার খড়্গের আঘাতে, একবার হাতির পায়ের নিচে ফেলে, আরেকবার আগুনে ফেলে দিয়ে, আরেকবার সাগরে ফেলে দিয়ে অবাধ্য ছেলেকে হত্যার চেষ্টা করলেন হিরণ্যকশিপু। কিন্তু প্রত্যেক বারেই ব্যর্থ হলেন।

কোনোভাবেই মারতে না পেরে, এক সন্ধ্যায় ছেলে প্রহ্লাদকে বাবা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞেস করে বসলেন, কে তাকে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। প্রহ্লাদ অবিচল চিত্তে জবাব দিলেন, শ্রীহরি। মানে বিষ্ণু। শুনে হিরণ্যকশিপু আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই শ্রীহরি কোথায় আছেন? প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, সর্বত্র। শুনে একটা স্তম্ভ দেখিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এর ভেতরেও শ্রীহরি আছেন? প্রহ্লাদ হ্যাঁ বললে হিরণ্যকশিপু সেই স্তম্ভে লাথি মেরে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভ থেকে বিষ্ণু নৃসিংহ রূপ ধরে বেরিয়ে এলেন। মানে, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক সিংহ। যেহেতু সেই নৃসিংহ ঠিক মানুষও নয়, আবার জন্তুও নয়, কাজেই সে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করতে সমর্থ হলো। আর অত্যাচারী দুই ভাই হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর বিষ্ণুভক্ত সজ্জন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের রাজা হলেন।

দৈত্যকুলে জন্ম নিলেও, প্রহ্লাদ ছিলেন সজ্জন। বিশেষত তার বিষ্ণুভক্তি ছিল অতুলনীয়। দেবতা বিষ্ণুর প্রতি অবিচল ভক্তিতে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও ভয় করেননি। আর বিষ্ণুও তার প্রতিদানে তাকে প্রতিবারই বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এমনকি অবিচল বিষ্ণুভক্তিতে তিনি দুর্জন বাবাকেও ভুলতে পেরেছিলেন। তার মতো মন্দ বংশে বা মন্দ লোকদের ভিড়ে কোনো ভালো মানুষের দেখা মিললে তাকে বলা হয় 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'।

অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই (অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই)
অর্থ : অতিরিক্ত দানশীলতা ভালো নয়, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করতে গেলে পতন ঘটে

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন। এই বিরোচনের ছেলেই বলি। বলির তিন স্ত্রীর কথা জানা যায়—বিন্ধ্যাবলি, সুদেষ্ণা ও অশনা। সুদেষ্ণার পাঁচ ছেলে—

www.pathagar.com

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। আর অশনার গর্ভে তার একশ ছেলে হয়। এদের মধ্যে সেরা ছিল বাণ। এই বলি দীর্ঘদিন তপস্যা করে অজেয় ও অমর হওয়ার বর পেয়েছিলেন। প্রহ্লাদের বাবা ছিলেন হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পরে রাজা হন প্রহ্লাদ। তারপর প্রহ্লাদের বয়স হয়ে গেলে বিরোচন, আর বিরোচনও বুড়িয়ে গেলে সিংহাসনে বসে বলি। আবার আরেক পুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপুর পরেই রাজা হয় বলি। দেবতাদের হারাতেই দৈত্যরা হিরণ্যকশিপুর পরে তাকেই রাজা বানায়।

এর আগে হিরণ্যকশিপুর নেতৃত্বে দৈত্যরা দেবতাদের সাথে একশ বছরের এক যুদ্ধ করলেও তাতে হেরে যায়। কিন্তু এবার তাদের নেতৃত্বে বলি। এই বলির অভিষেকের দিন এমনকি ব্রহ্মাও এসেছিলেন। আর সিংহাসনে বসেই বলি দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। একের পর এক যুদ্ধে বলি দেবতাদের পরাস্ত করতে লাগল। তার বীরত্ব দেখে একবার পরাক্রমশালী দেবী দুর্গা তার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। ইন্দ্রও তার কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন বলি ইন্দ্রের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে চলে আসলেন।

আসার পথে সে সব ধনসম্পদ সমুদ্রে পড়ে গেল। তখন বিষ্ণু দেবতাদের পরামর্শ দিলেন, বলির সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করতে। তাহলে বলি ইন্দ্রের পড়ে যাওয়া ধনসম্পদও পাবে, আবার দেবতারাও অমৃত পাবেন। আর অমৃত পেলে দেবতারাও অমর হয়ে উঠবেন। তখন অসুর বা দৈত্যদের পরাজিত করা সম্ভব হবে।

তখন বলির সাহায্য নিয়ে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করলেন। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠে আসলে, তাই নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের গণ্ডগোল লেগে গেল। শেষে বিষ্ণুর সাহায্য নিয়ে ইন্দ্র মোহিনী রূপ ধারণ করে, দেবতাদের জন্য অমৃত নিয়ে গেলেন। আর বজ্রাঘাত করে বলিকে গুরুতর আহত করলেন। দৈত্যরাও সে যাত্রায় পরাস্ত হলো।

পরে শুক্র বলিকে আবার জীবিত করে তুললেন। তারপর বলির হয়ে শুরু করলেন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। তখন যজ্ঞদেব সে যজ্ঞের আগুন থেকে বলিকে দিব্য রথ, দিব্য কবচ, স্বর্ণধেনু ও দুটি অক্ষয় তূণ দান করলেন। প্রহ্লাদ বলিকে দিলেন চির অম্লান মালা। আর শুক্র দিলেন দিব্য শঙ্খ।

সে সময় আবার বিষ্ণুর সঙ্গে দেবতাদের মন কষাকষি চলছিল। শুক্রও সে কথা বলে, বলিকে পরামর্শ দিলেন, তখনই যুদ্ধ করতে। বলিও দেবতাদের আক্রমণ করলেন। এবার বলির আক্রমণে দেবতারা একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লেন। বৃহস্পতিও তাদের বললেন, স্বর্গ ছেড়ে পালাতে।

www.pathagar.com

এভাবে বলি ত্রিভুবনের রাজা হলেন। প্রহ্লাদ বলিকে ইন্দ্র হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। তাকে পরামর্শ দিলেন, ধর্মপথে রাজ্য চালাতে। বলিও বাবার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। সুশাসনের জন্য দ্রুতই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। রাজা হয়ে তিনি একশ অশ্বমেধ যজ্ঞও পালন করলেন।

তার পতনও ডেকে আনল এই অশ্বমেধ যজ্ঞ। রাজা হয়ে যতই ধর্মপথে রাজ্য চালান না কেন, তিনি তো রাজত্বই পেয়েছেন দেবতা ও ব্রাহ্মণদের অধিকার কেড়ে নিয়ে। কাজেই, তারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলির এ সব কাজের প্রতিকার চাইলেন। সব শুনে বিষ্ণুও তাদের কথা দিলেন, তিনি বলিকে দমন করবেন। সে জন্য তিনি বামন অবতাররূপে পৃথিবীতে আসলেন।

ওদিকে বলি তখন নর্মদা নদীর তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেছেন। সে সময় তিনি প্রতিজ্ঞাও করলেন, এই যজ্ঞের সময় তার কাছে এসে যে যা চাইবে, তিনি তাই দিবেন। তখন বলির কাছে এলেন বামন অবতাররূপী বিষ্ণু। এসে তিনি বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি, মানে তিন পা রাখার মতো জমি প্রার্থনা করলেন। বলি তাকে তিন পা জমির পরিবর্তে গোটা ভৃঙ্গারক রাজ্যই দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু বামন রাজ্য নয়, কেবল তিন পা জমিই চান।

বামনের এসব কথা শুনে বলির গুরু শুক্রাচার্য আঁচ করলেন, নিশ্চয়ই বামনের মনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। তিনি বলিকে বারবার করে নিষেধ করলেন, বামনের প্রার্থনা পূরণ না করতে। এমনকি তার কথা না শোনায় তিনি বলিকে অভিশাপও দিলেন। কিন্তু বলি তার প্রতিজ্ঞায় অটল। তিনি বামনকে তিন পা পরিমাণ জমি দিতে সম্মত হলেন।

এবার বামনরূপী বিষ্ণু তার শরীর বৃদ্ধি করতে শুরু করলেন। বাড়তে বাড়তে বামনের শরীর বিশাল বড় হয়ে গেল। তার শরীরে পুরো আকাশ ঢেকে গেল। তারপর তিনি এক পা রাখলেন পৃথিবীতে বা মর্ত্যে। সেই এক পায়ের নিচে পুরো পৃথিবী ঢেকে গেল। দ্বিতীয় পা রাখলেন স্বর্গে। সেই পায়ের নিচে ঢেকে গেল পুরো স্বর্গ। তারপর তার নাভি থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় আরেকটি পা। এখন এই তিন নম্বর পা তিনি রাখবেন কোথায়?

বলি তখন তার মাথা পেতে দিলেন। বামনও বলির মাথায় পা দিয়ে তাকে পাতালে পাঠাতে উদ্যত হলেন। বলিও একাগ্রমনে বিষ্ণুর স্তব করতে শুরু করলেন। ছুটে এলেন প্রহ্লাদ। তিনিও বিষ্ণুর স্তব করতে শুরু করলেন। বিন্ধ্যাবলিও শুরু করলেন বিষ্ণুর স্তব।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলিকে আর পাতালে যেতে হলো না। এত কষ্ট স্বীকার করেও তার প্রতিজ্ঞা পূরণে অবিচল থাকায়, বিষ্ণু নিজেই বলির উপর সন্তুষ্ট হলেন। খুশি হয়ে বিষ্ণু বলিকে মুক্তি দিলেন। যে রসাতলে দেবতারাও বাস

www.pathagar.com

করতে পারেন না, বলিকে সেই রসাতলে থাকতে দিলেন। সঙ্গে বলির পরিবার-পরিজনকেও। পাশাপাশি বলির ইন্দ্রত্বেরও বন্দোবস্ত করে দিলেন তিনি। প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্রের বদল ঘটে। এমনি মন্বন্তর গড়িয়ে গড়িয়ে যখন সাবর্ণি মন্বন্তর আসবে, তখন ইন্দ্র হবেন বলি।

এভাবে অজেয় ও অমর হওয়ার পরেও, এবং ধর্মপথে রাজ্য চালনা করলেও, বলির পতন হয়। এবং সে পতনের কারণ ছিল তার অতি দানশীলতার মনোভাব। তিনি তার সাধ্যের অতিরিক্ত দান করতে গিয়েছিলেন। আর সেই দানশীলতাকে আশ্রয় করেই বিষ্ণু তাকে দমন করেন। সে রকম কেউ যদি তার সাধ্যের অতিরিক্ত দান করতে থাকে, তবে শীঘ্রই তারও ধনসম্পদ ফুরিয়ে যায়, তাকে দারিদ্র্য বরণ করতে হয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়—অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।

আবার নিজেকে দানশীল দাবি করে বলির যে অভিমান বা অহংকার ছিল, সে অভিমানের বশবর্তী হয়েই তিনি তার সাধ্যের অতিরিক্ত এ দান করতে ব্রতী হয়েছিলেন। এই অভিমানের জন্যই তিনি দান করার সময় গুরু শুক্রাচার্যের সাবধান বাণীও শোনেননি। সে রকম যদি কারও অভিমান বা অহংকার থাকে, এবং সেই অভিমান-অহংকার বজায় রাখতে সে প্রয়োজনে তার সাধ্যেরও অতিরিক্ত দান করতে থাকে, তবে শীঘ্রই তার ধনসম্পদ ফুরিয়ে যায়, এবং তাকে দারিদ্র্য বরণ করতে হয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়—অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।

পরশুরামের কুঠার

অর্থ : সর্ব সংহারক অস্ত্র/নৃশংসভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের অস্ত্র

পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। তিনি ঋষি জমদগ্নি ও রেণুকার সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে আসেন। জমদগ্নি-রেণুকার পাঁচ ছেলে ছিল—বসু, বিশ্বাবসু, বৃহদ্‌ভানু, বৃহৎকম্ব ও রাম। এই রামই পরে পরশুরাম নামে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পরিচিত হন।

সে সময় মার্তিকাবর্ত দেশের রাজা ছিলেন গন্ধর্ব। একবার তিনি নৌকায় করে সস্ত্রীক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সে সময় তাকে দেখে রেণুকা কামার্ত হয়ে ওঠেন। স্ত্রীর এই বিকারগ্রস্ত আচরণ দেখে ক্ষেপে ওঠেন জমদগ্নি। তিনি ক্রোধের বশে বসুকে ডেকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। কিন্তু বসু নিজের মাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। একে একে অস্বীকৃতি জানালেন তার আরো তিন ছেলে—বিশ্বাবসু, বৃহদ্‌ভানু ও বৃহৎকম্ব। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। সে অভিশাপে তারা পশুপাখির মতো জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

তবে তার আদেশ পালন করলেন তার ছোট ছেলে রাম, তথা পরশুরাম। তিনি কুঠারের আঘাতে তার মায়ের শিরশ্ছেদ করলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলে তিনি পাঁচটা বর চেয়ে নেন। সেই বরগুলোর মধ্যে তার মার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়া এবং তার ভাইদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও ছিল। এ ছাড়া তিনি যাতে যুদ্ধে অজেয় থাকেন, সেই বরও চেয়ে নেন তিনি।

আরেকবার ক্ষত্রিয়দের সাথে পরশুরামের ভীষণ ঠোকাঠুকি হলো। পরশুরাম তার ভাইদের সাথে করে আশ্রম থেকে দূরে এক জায়গায় গিয়েছিলেন। এসে দেখেন, কার্তবীর্য নামের এক ক্ষত্রিয় রাজা তাদের আশ্রমে এসে হোমের সবগুলো বাছুর নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় আশ্রম একদম তছনছ করে দিয়ে গেছে। ক্ষেপে গিয়ে পরশুরাম তখনই বেরিয়ে গেলেন। এই কার্তবীর্যের আবার হাত ছিল হাজারখানেক। মুখোমুখি হয়ে পরশুরাম বর্শার আঘাতে কার্তবীর্যের হাজারটা হাতই কেটে ফেললেন। তারপর তাকে হত্যা করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কার্তবীর্যের ছেলেরা আশ্রমে এসে এর প্রতিশোধ নিয়ে গেল। তারা একদিন আচমকা এল তাদের আশ্রমে। এসে জমদগ্নিকে একাকীও পেয়ে গেল। তারপর তাকে খুন করল। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে দেখে, তার বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি ক্ষত্রিয়দের সবংশে ধ্বংস করবেন। তারপর কুঠার হাতে বেরিয়ে পড়লেন। একাই কার্তবীর্যের ছেলেদের সহ পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয়দের হত্যা করলেন।

এভাবে তিনি তার কুঠার দিয়ে একুশ বার পৃথিবীর সকল ক্ষত্রিয়দের হত্যা করেন। তার হাতে নিহত ক্ষত্রিয়দের রক্তে পাঁচটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। শেষমেশ তার দাদা ঋচীকের অনুরোধে, তিনি ক্ষত্রিয় হত্যা বন্ধ করেন। তারপর এক মহাযজ্ঞ করে পৃথিবী মহাত্মা কশ্যপের হাতে ন্যস্ত করেন। তারপর নিজে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন।

অর্থাৎ, পরশুরামের এই কুঠার ছিল ভয়ঙ্কর, নৃশংস ও নিষ্ঠুর। আর এই কুঠার দিয়েই পরশুরাম নির্মমভাবে তার প্রতিশোধস্পৃহা মিটিয়েছিলেন। এই কুঠার দিয়েই যেমন তিনি নিস্পৃহভাবে পিতার আদেশে তার মায়ের শিরশ্ছেদ করেছিলেন, তেমনি তার বাবার হত্যার বদলা নিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের একুশ বার সমূলে বিনাশও করেন এই কুঠার দিয়েই। তাই সর্বসংহারী বা নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের অস্ত্র বা উপায়ের কথা বলার সময় পরশুরামের ওই কুঠারের উদাহরণ টানা হয়।

www.pathagar.com

শিব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হরিহর আত্মা (অভেদাত্মা হরিহর)
অর্থ : ভীষণ ঘনিষ্ঠ বন্ধু
সমার্থক বাগধারা : দুই দেহ এক প্রাণ, অভিন্ন আত্মা

হরি ভগবান বিষ্ণুর নাম। আর হর ভগবান শিবের। এরা দুজনেই ভারতীয় পুরাণের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দুই দেবতা। ভারতীয় পুরাণে সকল দেবতার মধ্যে যে তিনজন দেবতার স্থান অন্যদের চেয়ে উপরে, তাদের দুজন এই বিষ্ণু ও শিব। অন্যজন ব্রহ্মা।

এদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা আর হরি বা বিষ্ণু পালনকর্তা বা পালনের দেবতা। আর হর বা শিব হলেন ধ্বংসের, সংহারের দেবতা। শিব প্রলয়ের সময় রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বিশ্বসংসারের সবকিছু হরণ বা ধ্বংস করেন বলে, তার নাম হর। আর তার সেই ধ্বংসযজ্ঞ শেষে, ১২০ ব্রহ্ম বছর বটপত্রে ঘুমিয়ে থাকার পরে, জেগে উঠে আবার বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন ব্রহ্মা। তারপর সেই সৃষ্টিজগতের পালনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন বিষ্ণু বা হরি।

অনেক পুরাণেই আবার এই বিষ্ণু ও শিবকে, অর্থাৎ হরি ও হরকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সেসব পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, বিষ্ণু ও শিব মূলত একই দেবতার দুই রূপ। রক্ষক বা পালনকারী রূপে বিষ্ণু, আর ধ্বংসকারী রূপে শিব। অবশ্য বেশিরভাগ পুরাণেই, বিশেষ করে পরের দিকের সব পুরাণেই বিষ্ণু ও শিবকে পৃথক দেবতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন দুই ব্যক্তির বা বন্ধুর সম্পর্ক যদি এতটাই ভালো হয়, তাদের মনের মিল যদি এমন হয়, যে মনে হয় তারা আসলে একই অভিন্ন আত্মা বা অভিন্ন হৃদয়ের দুইজন মানুষ, যাকে বলে দুই দেহ এক প্রাণ, তেমন ক্ষেত্রে বিষ্ণু ও শিবের সেই অভিন্নতার প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়, হরিহর আত্মা (বা অভেদাত্মা হরিহর)।

www.pathagar.com

সাপকে মারলে শিবেরও লাগে

অর্থ : কাউকে অপমান করলে তার আশ্রয়দাতা-পালক বা মুরুব্বিদেরও অপমান করা হয়

শিব ধ্বংসের, সংহারের দেবতা। তার সারা শরীর ছাই দিয়ে আবৃত। জটাধারী, মানে মাথা ভরা জটা-পাকানো চুল। তাতে একটা অর্ধচন্দ্র বসানো। কপালে তৃতীয় আরেকটা চোখ। গায়ে বাঘের চামড়ার পোশাক, তার সাথে হরিণের চামড়ার চাদর। গলা জড়িয়ে থাকে একটা সাপ। যেন একটা সাপের উপবীত।

আবার শ্মশানে তার আরেক রূপ দেখা যায়। সেখানে তিনি যখন অনুচরদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তখন তার গলায় থাকে কঙ্কালের মালা। তবে সঙ্গে সাপ থাকে ঠিকই। অর্থাৎ, ওই সাপ সব সময় তার সাথে সাথে, তার গায়ে জড়িয়ে থাকে। আর তাই সে সাপকে মারতে গেলে, শিবের গায়ে লাগবেই।

সে রকম, যে লোক আরেকজনের উপর নির্ভরশীল, তাকে অপমান করলে, সে যার উপর নির্ভরশীল, তাকেও অপমান করা হয়। কেউ যদি অন্য কারো আশ্রয়ে-অনুগ্রহে বাস করে, তাকে অপমান করলে তার আশ্রয়দাতারও অপমান হয়। আবার ছেলেমেয়েকে অপমান করলে, তাদের বাবা-মাকেও অপমান করা হয়। এ ধরনের ব্যাপার বোঝাতে তাই বলা হয়—সাপকে মারলে শিবেরও লাগে।

রুদ্রমূর্তি

অর্থ : ভয়ঙ্কর মূর্তি, সংহার মূর্তি

শিব ধ্বংসের, সংহারের দেবতা। তার প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। পাশুপত বলে তার আরেকটা অস্ত্র আছে, যেটাকে বলা হয় বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র। তার ধনুকের নাম পিনাক। প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ডমরু। বাসা কৈলাসে। তার নাচের নাম তাণ্ডবনৃত্য। শিবের আরো অনেকগুলো নাম আছে। সেসব নামের পিছে আবার কাহিনিও আছে। যেমন, সমুদ্রমন্থন করে গরল বা বিষ উঠলে, দেবতারা ভয় পেয়ে যান। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে শিব সেই বিষ পান করে গলায় ধারণ করেন। বিষের প্রকোপে তার গলা নীল হয়ে যায়। তাই তার নাম 'নীলকণ্ঠ'। আরেকবার তার স্ত্রী পার্বতী তার দুই চোখ চেপে ধরেন। তখন পুরো পৃথিবী

www.pathagar.com

অন্ধকার হয়ে যায়। পৃথিবীর মানুষ ভীষণ বিপদে পরে যায়। মানুষদের বাঁচাতে শিব তখন তার কপালে তৃতীয় আরেকটা চোখ ফোটালে, তার নাম হয় 'ত্রিলোচন'। শিবের এমনি আরো নাম আছে—'মহাদেব', 'মহাকাল', 'হর', 'আশুতোষ', 'বিরুপাক্ষ', 'স্মরহর', 'পিনাকী', 'কপর্দী', 'নটরাজ', 'ভৈরব', 'ত্রিপুরারি', 'দুর্জটি', 'পশুপতি'। তার এমন আরেকটা নাম 'রুদ্র'।

তার এই রুদ্র নামের উল্লেখ প্রধানত পাওয়া যায় বেদে। পৌরাণিক এই গ্রন্থটিতে শিব বা মহাদেব নামের কোনো উল্লেখ নেই, আছে রুদ্র নামটি। বেদে রুদ্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এরকম—তিনি ধ্বংসকারী, ভয়াবহ পশুর মতো সবকিছু ধ্বংস করেন। কিন্তু তাকে তপস্যা না করলে ভয়ঙ্কর বিপদ। যারা তার তপস্যা করে না, কিংবা যাদের উপর তিনি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হন, তাদের সহায়-সম্পত্তি তিনি ধ্বংস করে দেন। বজ্রাঘাতে মানুষ-পশু মারেন। রোগব্যাধি পাঠিয়ে দেন। কেবল তার পূজা ও স্তুতি করার মাধ্যমেই তার এই রুদ্র রূপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

অবশ্য সহজেই, অল্প তপস্যাতেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। সন্তুষ্ট হলে তিনি মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেন। তার মঙ্গলময় রূপের নাম শিব। আর এই ভয়ঙ্কর-ধ্বংসকারী-সংহারী রূপের নাম রুদ্র। তার এই ধ্বংসের বিগ্রহের এই নাম থেকেই 'রুদ্রমূর্তি' বাগধারাটি এসেছে।

সদাশিব

অর্থ : সদা প্রফুল্ল ব্যক্তি, যে কখনোই কারও প্রতি রাগ, ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করে না

ধ্বংসকারী রুদ্র রূপের শিব ভয়ঙ্কর। তাকে তপস্যা না করলে ভয়ঙ্কর বিপদ। যারা তার তপস্যা করে না, কিংবা যাদের উপর তিনি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হন, তাদের সম্পত্তি তিনি ধ্বংস করে দেন। বজ্রাঘাতে মানুষ-পশু মারেন। রোগব্যাধি পাঠিয়ে দেন।

তার এই 'রুদ্ররূপ' ভয়ঙ্কর হলেও, তা থেকে নিস্তার পাওয়াটা খুব একটা কঠিন নয়। তার পূজা-তপস্যা করার মাধ্যমেই সহজেই তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। অল্প তপস্যায়, সহজেই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং বর দেন বলে তার আরেক নাম আশুতোষ। আর সন্তুষ্ট হলে তিনি ভীষণ মঙ্গলময় রূপ ধারণ করেন।

www.pathagar.com

তার এই মঙ্গলময় রূপেরই নাম শিব বা সদাশিব। সদাশিব সর্বদাই মঙ্গলকর। তিনি খুব সহজেই সন্তুষ্ট হন। কিছুতেই ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন না। কারও আচার-আচরণ যদি শিবের এই মঙ্গলময় সদাশিব রূপের মতো হয়, যে সব সময় হাসি-খুশি থাকে, সব সময় অন্যের উপকার করার কথা ভাবে, কারও প্রতি রাগ, ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় সদাশিব।

তাণ্ডবলীলা

অর্থ : বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড

এখন বছর-গণনা করা হয় সৌরবর্ষের হিসেবে। এই সৌরবর্ষ বা সৌরপঞ্জিকার হিসাব হয় সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে। সেই অনুযায়ী দিন-মাস-বছর হিসাব করা হয়। কিন্তু ভারতীয় পুরাণে কাল বা সময়ের হিসাব করা হয় চান্দ্রবছর বা চান্দ্রপঞ্জিকা দিয়ে। (হিজরি সনও তাই।)

ভারতীয় পুরাণের এই চান্দ্রবছরের হিসাব হয় চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে। এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে ধরা হয় এক মাস (চান্দ্রমাস)। ১২ চান্দ্রমাসে হয় এক চান্দ্রবছর। ভারতীয় পুরাণে এই বছরকে বলা হয় মানবীয় বছর। এই এক মানবীয় বছরের সমান সময়কালে হয় এক দৈব দিন। ৩৬০ দৈব দিনে হয় ১ দৈব বছর। আর ১২ হাজার দৈব বছর মিলে ১ দৈবযুগ বা ১ চতুর্যুগ।

এ রকম এক হাজার দৈবযুগ বা চতুর্যুগ মিলে হয় ব্রহ্মার এক দিন। এক ব্রহ্মার জীবনে ১৪ জন ইন্দ্র রাজা হন। আর ২ জন ব্রহ্মার জীবন মিলে হয় বিষ্ণুর এক জীবন।

হ্যাঁ, ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে বড় তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও মৃত্যুর অধীন। ২ জন ব্রহ্মার জীবনকাল মিলিয়ে হয় বিষ্ণুর এক জীবনকাল। তারপর শুরু হয় শিবের যুগ। শিবের যুগ বিষ্ণুর যুগের দুই গুণ। তারপর শিবের যুগও শেষ হলে, ঘটে প্রলয়।

প্রলয়কালে বিষাণ ও ডমরু বাজাতে বাজাতে, নাচতে নাচতে শিব বিশ্বজগৎ ধ্বংস করেন। তার এই নাচের নাম 'তাণ্ডব'। তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে তিনি বিশ্বধ্বংস করেন। তাই প্রলয়ের সময়ে শিবের এই ধ্বংসের লীলাকে বলা হয় তাণ্ডবলীলা।

কেউ যখন কোনো ভীষণ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে থাকে, তখন শিবের প্রলয়লীলার সঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়, সে তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

সতী সাবিত্রী

অর্থ : পতিপ্রাণা নারী

সাবিত্রী ছিলেন মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির মেয়ে। অশ্বপতির স্ত্রীর নাম মালতী। দীর্ঘদিন তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তাই সন্তানের আশায় তারা সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ শুরু করেন। এই সাবিত্রীই বেদমাতা গায়ত্রী। সাবিত্রী নিজে দুভাগ হয়ে, এক ভাগ থেকে নারী, আর আরেক ভাগ থেকে পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। সন্তান কামনায় এই সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে অশ্বপতি ও মালতী যজ্ঞ শুরু করলেন। সে যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে এলেন স্বয়ং সাবিত্রী। এসে অশ্বপতিকে বর দিলেন, তাদের এক মেয়ে হবে। সাবিত্রীর বরে জন্ম বলে, তার নামও সাবিত্রী রাখা হলো।

দিনে দিনে সাবিত্রী যেমন সুন্দরী হয়ে ওঠেন, তেমনি অতুলনীয়া হয়ে ওঠেন বিদ্যায়-বুদ্ধিতে। তার তেজও হয় তেমনি। সব মিলিয়ে তার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া-ই যাচ্ছিল না। শেষে অশ্বপতি মেয়েকে বলেন, দেশ-বিদেশে ঘুরে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতে। তখন সাবিত্রী কয়েক জন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন একটা মুনিদের আশ্রমে।

যে বনে সেই আশ্রম, সেখানে তখন দ্যুমৎসেনও বাস করছিলেন। তিনি ছিলেন শাল্বদেশের রাজা। দ্যুমৎসেনের ছেলে সত্যবান ছিলেন ভীষণ ধার্মিক। কিন্তু সত্যবান যখন ছোট, তখনই দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়ে যান। তখন শত্রুরাও ষড়যন্ত্র করে তাকে রাজ্যচ্যুত করে। তখন থেকেই দ্যুমৎসেন স্ত্রী শৈব্যা ও ছেলে সত্যবানকে নিয়ে এই বনে এসে বাস করছিলেন।

এই সত্যবানকেই স্বামী হিসেবে পছন্দ হলো সাবিত্রীর। মনে মনে সত্যবানকে পতি, মানে স্বামী হিসেবে বরণও করলেন তিনি। তারপর মদ্রদেশে ফিরে গিয়ে, বাবা অশ্বপতিকে সে কথা জানালেন। সে সময় নারদও মদ্রদেশে পৌঁছালেন। ঘটনা শুনে, তিনি সত্যবান সম্পর্কে যা যা জানতেন, সবই বললেন অশ্বপতিকে। বললেন তার সব গুণের কথাই। সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিলেন, সত্যবানের আয়ু আছে আর মাত্র এক বছর। সে খবর শুনে অশ্বপতি এই বিয়েতে আপত্তি তুললেন। কিন্তু অবিচল রইলেন সাবিত্রী। কারণ, মনে মনে তো তিনি সত্যবানকে স্বামী হিসেবে বরণ করেই নিয়েছেন। শেষে অশ্বপতিও সত্যবানকে মেনে নিলেন। দ্যুমৎসেনের ছেলে সত্যবানের সাথে সাবিত্রীর বিয়ে হলো।

বিয়ের পর সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে বনের কুটিরে গিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। রাজপরিবারের জাঁকজমকপূর্ণ কাপড়-চোপড় ছেড়ে সাধারণ

www.pathagar.com

পোশাক-আশাক গায়ে চড়ালেন। স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ওদিকে সত্যবানের মৃত্যুর দিনও এগিয়ে আসতে লাগল। সাবিত্রী সযতনে সে দিনের হিসাব রাখছিলেন। সত্যবানের মৃত্যুর চারদিন আগে তিনি উপবাস শুরু করলেন। উপবাস করলেন টানা তিন দিন। চতুর্থ দিনে উপবাস ভাঙলেন। কিন্তু খাবার না খেয়ে সে খাবার আগুনে আহুতি দিলেন। সবাইকে বললেন, সূর্য অস্ত গেলে তারপর খাবেন।

প্রতি দিনের মতো সেদিনও সত্যবান কাঠ কাটতে বের হচ্ছিলেন। তখন সাবিত্রী গোঁ ধরলেন, তিনিও সঙ্গে যাবেন। সত্যবান প্রথমে একদমই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষে সাবিত্রী যখন শ্বশুর-শাশুড়িকেও রাজি করিয়ে ফেললেন, তখন সত্যবানকেও রাজি হতে হলো। তখন সত্যবান ও সাবিত্রী গেলেন বনে, কাঠ কাটতে। কাটতে কাটতে সত্যবানের মাথা ব্যথা শুরু হলো। সাবিত্রী সত্যবানের মাথা কোলে নিয়ে বসে রইলেন। সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সত্যবান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যবানের সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মা নিয়ে যেতে যমলোক থেকে দূত এল। ঠিক দূত নয়, এলেন যমরাজ নিজেই। তিনি সত্যবানের সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করলেন। পিছু নিলেন সাবিত্রী। যমরাজ সাবিত্রীকে অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সে যাতে ফিরে যায়। কিন্তু সাবিত্রী কোনোভাবেই রাজি হলেন না। শেষে যম সাবিত্রীকে একটা বর দিতে চাইলেন। বললেন, সত্যবানের জীবন ছাড়া আর যে কোনো বর চাইতে।

সাবিত্রী তার শ্বশুরের অন্ধত্ব দূর করার বর চাইলেন। যম তথাস্তু বলে সে বর পূরণ করলেন। তারপরও সাবিত্রী যমের পিছু ছাড়লেন না। উল্টো যমকে বোঝাতে থাকলেন, স্বামীর অনুসরণ করাই স্ত্রীর ধর্ম। কাজেই তিনি যমের অনুসরণ করে ভুল করছেন না। বরং এটাই তার করা উচিত। যম তখন তাকে আরেকটা বর চাইতে বললেন। অবশ্যই সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য কিছু। এবার সাবিত্রী তার শ্বশুরের হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার বর চাইলেন। যম এই চাওয়াও পূর্ণ করলেন।

তবু সাবিত্রী যমের অনুসরণ করা বন্ধ করলেন না। তখন যম আরো একটা বর দিতে চাইলেন। সাবিত্রীর বাবা অশ্বপতির কোনো ছেলে ছিল না। এবার তাই সাবিত্রী তার বাবার একশ ছেলে হোক, সে বর চাইলেন। যম এবারও তথাস্তু বললেন। কিন্তু এবারও সাবিত্রী থামলেন না।

যম তখন শেষ বারের মতো আরেকটা বর দিতে চাইলেন। চতুর্থ বরে সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে তার নিজের একশ শক্তিশালী ছেলে কামনা করলেন। যমরাজও আগেপিছে না ভেবেই সে বর পূরণ করলেন। এবার

www.pathagar.com

সাবিত্রী তার স্বামীকে ফেরত চাইলেন। তার স্বামীকেই যদি যম নিয়ে যান, তাহলে তার শত ছেলে হবে কীভাবে? যমরাজও তো নিজেই নিজের কথা ব্যর্থ হওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারেন না। নিজের কথা রাখার জন্যই যম তখন সত্যবানকে তার স্ত্রী সাবিত্রীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আর সাবিত্রীর এই বুদ্ধিদীপ্ত কাজে মুগ্ধ হয়ে তাকে আরো একটা বর দিলেন। এবার তার নিজের পছন্দ মতো। বর দিলেন সত্যবান-সাবিত্রী আরো চারশ বছর একত্রে বাঁচবেন।

এরই মধ্যে রাত হয়ে গিয়েছিল। সত্যবান চোখ খুলে চাইলেন। দেখলেন, রাত হয়ে গেছে। এত রাত হয়ে গেছে, তাও সাবিত্রী কেন তাকে ডাকেনি, তাই নিয়ে খানিক্ষণ অনুযোগ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, যে লোকটা এসে তাকে টানাটানি করছিল, সে কোথায়? সাবিত্রী তখন তাকে সব কথা খুলে বললেন। সত্যবান ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না সব কথা। সাবিত্রী তখন তাকে ঘুমাতে বললেন। সকাল হলে তারা ফিরবেন। কিন্তু সত্যবান দেরি করতে রাজি হলেন না। তারা সে রাতেই তাদের কুটিরের পথে রওয়ানা দিলেন। কুঠারটি সাবিত্রীই হাতে তুলে নিলেন।

ওদিকে তার অনেক আগেই দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। তারপর থেকেই স্ত্রী শৈব্যাকে নিয়ে ছেলে ও ছেলে-বৌকে পুরো বনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এর মধ্যেই সাবিত্রী ও সত্যবান ফিরে এল। কুটিরে ফিরে সাবিত্রী সত্যবান ও দ্যুমৎসেনকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি যে আগে থেকেই সত্যবানের মৃত্যুর ব্যাপারটা জানতেন, সেটাও জানালেন।

পরদিন শাল্বদেশ থেকে প্রজারা এসে তাদের রাজাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। অশ্বপতিরও শত ছেলে হলো। আর এসবই হলো সাবিত্রীর পতিপ্রেমের জন্য। স্বামীর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার জন্যই তার স্বামী জীবন ফিরে পেল। শুধু জীবনই ফিরে পেল না, আরো চারশ বছর আয়ুও পেল।

আর সতী ছিলেন শিবের স্ত্রী। তিনি ছিলেন দক্ষের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। দক্ষ বিখ্যাত দশ ঋষিদের একজন। এই দশ ঋষিকে বলা হয় 'প্রজাপতি'। তারা সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাদের থেকেই মানবের সৃষ্টি। ব্রহ্মার বুড়ো আঙুল থেকে জন্ম বলে, এই প্রজাপতির নাম দক্ষ। দক্ষ নিজেই সতীর বিয়ে দিয়েছিলেন মহাদেব, মানে শিবের সাথে।

একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে সকল দেব-দেবী যোগ দিতে এলেন। এলেন দক্ষও। তাকে আসতে দেখে সব দেবতারাই উঠে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেন না শিব আর ব্রহ্মা। তাতে দক্ষ ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। রেগে গিয়ে শিবকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

তারপর অভিশাপ দিলেন, ইন্দ্রসহ বিভিন্ন দেবতারা যজ্ঞের যে ফল ভোগ করে, শিব তা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর কিছুদিন পরে, কোনো এক কারণে দক্ষের উপর খুশি হয়ে ব্রহ্মা তাকে সকল প্রজাপতিদের উপর আধিপত্য করার অধিকার দিলেন। খুশির খবর। কাজেই দক্ষ এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সে যজ্ঞের নাম বৃহস্পতি যজ্ঞ। সে যজ্ঞে দক্ষ ত্রিলোকের সকলকে দাওয়াত দিলেন। কেবল দাওয়াত দিলেন না শিব-সতীকে।

সতী তো যজ্ঞের কথা শুনেই আসার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। দাওয়াত না করুক, বাবার আয়োজন বলে কথা। কিন্তু শিব তো দাওয়াত ছাড়া কোনোভাবেই সে যজ্ঞে যাবেন না। স্ত্রীকেও যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। শেষে সতী দশ মূর্তি ধারণ করলেন—কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও মহালক্ষ্মী। দশ রূপে শিবকে বিভ্রান্ত করে তার অনুমতিও আদায় করে নিলেন। তারপর গেলেন সে যজ্ঞে।

মেয়েকে দেখে, মেয়ের সামনেই দক্ষ তার মেয়ে-জামাইকে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। হোক বাবা বলছেন, তবু স্বামীর নিন্দা বেশিক্ষণ সইতে পারলেন না সতী। স্বামীর নিন্দা শোনার চেয়ে মরে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন তিনি। ওই যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করলেন সতী। এতটাই গাঢ় ছিল সতীর পতিপ্রেম।

এই দুই নারী—সতী ও সাবিত্রী, দুজনেই তাদের স্বামী বা পতিদের খুবই ভালোবাসতেন। তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি তারা। আর তাই যে নারীরা তাদের স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে, জীবন দিয়ে ভালোবাসে, একদম পতিপ্রাণা, তাদের বলা হয় সতী সাবিত্রী।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার

অর্থ : চরম হট্টগোল, বিপুল কর্মযজ্ঞে বিপর্যস্ত অবস্থা

শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনে শিব তো রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তিনি তার মাথাভরা জটা থেকে একটা জটা ছিঁড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন। সেই জটা মাটিতে পরলে, ওই জটা থেকে বীরভদ্রের উদ্ভব হলো। তখন এই বীরভদ্র শিবের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গিকে নিয়ে রওয়ানা হলো দক্ষযজ্ঞ, মানে দক্ষের যজ্ঞের উদ্দেশ্যে। তারা দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হয়ে, সে যজ্ঞের দফারফা করে দিল। বীরভদ্র প্রাচীন প্রজাপতি ভৃগুর দাড়ি কেটে নিল, পূষণের দাঁত উপড়ে নিল। শেষে তার অস্ত্রের আঘাতে দক্ষের মাথা কাটা পরল। সেই

www.pathagar.com

কাটা মাথা যজ্ঞের হোমাগ্নিতে পুড়িয়ে ছাই করে, তবেই ফিরল বীরভদ্র-নন্দী-ভৃঙ্গি।

এভাবে দক্ষের বিশাল যজ্ঞের আয়োজন জট পাকিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে তাকেই বিপর্যস্ত করে তোলে। পরে দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি এলেন শিবের কাছে। তার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে, শেষে দক্ষকে আবার জীবিত করে তোলেন তিনি। তবে তার নিন্দা করার শোধ নিলেন ঠিকই। দক্ষের মাথার জায়গায় বসিয়ে দিলেন ছাগলের মাথা। তবে জীবন ফিরে পেয়ে তাতেই খুশি হয়ে, যজ্ঞ সম্পন্ন করে শিবের স্তবগান করতে থাকেন দক্ষ।

তো দক্ষের ওই যজ্ঞের মতো, কেউ যখন বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে গিয়ে জট পাকিয়ে ফেলে, চরম হট্টগোলে এক বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন বলা হয়, 'দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার' ঘটেছে।

শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে
অর্থ : অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, ভীষণ সুখী দম্পতি

দক্ষযজ্ঞে গিয়ে, বাবার মুখে স্বামীর নিন্দা শুনে যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন শিবের স্ত্রী সতী। তখন রাগে-ক্ষোভে শিব বীরভদ্র-নন্দী-ভৃঙ্গিকে পাঠিয়ে দক্ষের যজ্ঞের দফারফা করলেন। রক্ষা পাননি দক্ষও। তারপর সতীর মৃতদেহ ঘাড়ে তুলে নিয়ে পাগলের মতো নাচতে শুরু করলেন। কোনোভাবেই তাকে আর থামানো যাচ্ছিল না। ওদিকে তার প্রচণ্ড নাচের তালে পুরো সৃষ্টিজগৎই ধ্বংস হয়-হয়, এমন অবস্থা। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র ছুঁড়লেন। তাতে সতীর শরীর বায়ান্ন টুকরো হয়ে, পৃথিবীর বায়ান্নটা স্থানে গিয়ে পরল। সেই বায়ান্নটা জায়গাই পরে বায়ান্নটা পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হয়।

পরে অবশ্য সতীর পুনর্জন্ম হয়। তিনি হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মেও তিনি তার স্বামীকে ভোলেননি। এ জন্মেও শিবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। ওদিকে আবার তখন তারকা নামের এক দৈত্যের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তারা জানতে পারলেন, শিব-পার্বতীর এক ছেলে হবে, যিনি তারকা দৈত্যকে বধ করবেন। তারা মদনকে পাঠালেন, শিবের সঙ্গে পার্বতীর মিলন ঘটিয়ে দিতে।

তাতে অবশ্য মদন ব্যর্থ হলেন। উল্টো শিবের কোপানলে পুড়ে ছাই হলেন তিনি। তবে পার্বতী ঠিকই শিবকে সন্তুষ্ট করলেন। তাদের মিলন হলে,

www.pathagar.com

মদনও আবার জীবন ফিরে পেলেন। পরে তাদের বড় ছেলে কার্তিক তারকাসুর বা তারকা দৈত্যকে বধ করেন।

এই শিব-পার্বতী দুজনই দুজনকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তাদের বিয়ের পর তারা দুজনে দুজনকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পরেছিলেন, শিব ঠিকঠাকমতো পৃথিবীর দেখাশুনাই করছিলেন না। তাই নিয়ে মেনকা পার্বতীকে গালমন্দ করলে, শিব পার্বতীকে নিয়ে পৃথিবীতে বাস করতে চলে আসেন। এরপর তারা তিন যুগ বাস করেন কাশীতে। পরে তারা আবার ফিরে গিয়ে হিমালয়ে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে তাদের সাথে বাস করে সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং প্রমথরা।

এক কথায় বলা যায়, এই শিব আর পার্বতী দুজনেই দুজনকে ভীষণ ভালোবাসেন। শিব যেমন পার্বতীর আগের জন্মের, মানে সতীর মৃত্যুতে পাগলের মতো কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি পার্বতীও নতুন জন্মে শিবের সান্নিধ্যকেই তার ধ্যান-জ্ঞান বানান। আর তাই যখন দুজনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব হয়, যে তারা দুইজন সব সময় একসাথে থাকে, একজন যা বলে অন্যজন তাতেই সায় দেয়, কিংবা কোনো দম্পতির মধ্যে অনেক বেশি মনের মিল হলে, তাদেরও যদি এমনটা হয়, একজন যা বলে অন্যজন তাই মেনে নেয়, তখন তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়—শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে।

কাশীতে ভূমিকম্প
অর্থ : অসম্ভব ঘটনা
সমার্থক বাগধারা : ব্যাঙের সর্দি

ভারতীয় পুরাণে কাশী অত্যন্ত পবিত্র স্থান। প্রাচীন কাশী বর্তমান ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। রাজ্যটির রাজধানী ছিল বারাণসী। শহরটি এখনো আছে। শহরটি এখন বেনারস ও কাশী নামেও পরিচিত। গঙ্গা তীরের এই শহরটি ভারতীয় পুরাণের সাত পবিত্র শহরের একটি। এগুলোকে একসাথে বলা হয় সপ্তপুরী। এই কাশীর পত্তন করেছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা কাশ। তার নাম অনুসারেই এ রাজ্যের নাম হয় কাশী। এই কাশের ছেলে কাশীরাজ, তারপর যথাক্রমে দীর্ঘতপা, ধন্বন্তরি, কেতুমান, ভীমরথ ও দিবোদাস। এই দিবোদাসের সময়ে শিবের নির্দেশে কাশী ধ্বংস করা হয়।

শিব পার্বতীকে বিয়ে করার পর বেশ কিছুদিন পৃথিবী দেখাশুনার কাজে তেমন একটা মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। স্ত্রীর সাথে খুনসুটিতেই মেতে ছিলেন। তখন দেবতারা মিলে পার্বতীর মা মেনকাকে গিয়ে ধরলেন। তাকে বললেন,

www.pathagar.com

শিবকে এসব কথা বুঝিয়ে বলতে। মেনকা উল্টো সেজন্য পার্বতীকে ডেকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। তখন শিব রেগে গিয়ে ঠিক করলেন, স্বর্গেই আর থাকবেন না। তারচেয়ে বরং পৃথিবীতে গিয়েই থাকবেন। সারা পৃথিবী ঘুরে তিনি থাকার জন্য এই কাশী রাজ্যটিকেই পছন্দ করলেন। এরপর নিকুম্ভকে পাঠালেন, কাশী খালি করার দায়িত্ব দিয়ে।

নিকুম্ভ বারাণসীতে এসে কণ্ডুক নামের এক নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। তাকে বললেন, শহরের প্রান্তে তার একটা মূর্তি স্থাপন করতে। কণ্ডুকও শহরের প্রান্তে নিকুম্ভের মূর্তি স্থাপন করল। ব্যাপারটা সে কাশীরাজ দিবোদাসকেও জানাল। তখন থেকে কাশীতে বেশ জাঁকজমকের সাথে নিকুম্ভের পূজা শুরু হয়ে গেল।

এদিকে রাজা দিবোদাসের কোনো ছেলে হচ্ছিল না। সেজন্য তার স্ত্রী সুযশার দুঃখের সীমা ছিল না। এবার তিনি ছেলের জন্য নিকুম্ভের পূজা শুরু করলেন। বহু দিন কেটে গেল, অন্য সবার প্রার্থনা পূরণ হলো, কিন্তু দিবোদাসের আর ছেলে হলো না। শেষমেশ রেগে গিয়ে একদিন দিবোদাস নিকুম্ভের মূর্তিটাই ভেঙে ফেললেন। তখন, পরিকল্পনা মাফিক, নিকুম্ভও অভিশাপ দিলেন, কাশী ধ্বংস হয়ে যাবে। জনশূন্য হয়ে যাবে।

সে অভিশাপের ফলেই হেহয়, তালজঙ্ঘসহ বিভিন্ন রাজ্যের আক্রমণে কাশী ধ্বংস হলো। তারপর শিব-পার্বতী এসে এখানে বাস করতে শুরু করলেন। তারা এখানে তিন যুগ বাস করেছিলেন। পরে কলিযুগ এলে, তারা এখান থেকে চলে যান। আর বারাণসী নগরেরও আবার পত্তন হয়।

এই শিবের অস্ত্র ত্রিশূল। অনেক পুরাণে আবার বলা হয়েছে, এই কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। এমনিতেই কাশী ভীষণ পবিত্র এলাকা। এখানে শিব-পার্বতী তিন যুগ বাস করেছেন। তার উপর যদি আবার সেটা শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত হয়, তাহলে তো সেখানে আর ভূমিকম্প হওয়াই সম্ভব না। আর তাই কোনো অসম্ভব ঘটনা বোঝাতে বলা হয়—যেন কাশীতে ভূমিকম্প।

ব্যাস-কাশী

অর্থ : ভালো কাজ করতে গিয়ে মন্দ করা

শিব পার্বতীকে নিয়ে কাশীতে থাকা শুরু করার পর, তার এই কাশীধাম রক্ষার দায়িত্ব দেন কালভৈরবের কাঁধে। এই কালভৈরব ছিল তার শিষ্য। শিব তার নিজের শরীর থেকে একে সৃষ্টি করেছিলেন। কালভৈরবের কাজই ছিল, কাশী পাহারা দেয়া আর খারাপ লোকদের শাস্তি দেয়া।

www.pathagar.com

কিন্তু এই কালভৈরবও একবার ভুল করল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস একবার কাশীতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কী একটা ছোট্ট ভুল করলেন, তাতেই কালভৈরব তাকে শাস্তি দিয়ে বসল। তখন ব্যাসদেব তো ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। রেগে গিয়ে তিনি আরেকটা কাশী নির্মাণ করতে শুরু করলেন। ওটা বানানোর পর বিধান জারি করে দিলেন, যে যে ব্যাসদেবের এই কাশীতে মারা যাবে, তারা মরার সাথে সাথেই মোক্ষলাভ করবে।

কিন্তু অমনটা হলে তো ভীষণ সমস্যা। এ কথা জানাজানি হলে তো আসল কাশীরই আর দাম থাকবে না। তাই নিয়ে দেবতাদের মধ্যে রীতিমতো হুলস্থুল পড়ে গেল। শেষে সবাইকে উদ্ধার করলেন দেবী ভগবতী, মানে দুর্গা। তিনি কৌশলে, কথার প্যাঁচে ফেলে, ব্যাসদেবকে দিয়ে বিধানের একটু পরিবর্তন করিয়ে নিলেন। নতুন বিধান হলো, এই ব্যাসদেবের কাশীতে কেউ মারা গেলে সে গাধা হয়ে জন্মাবে।

এইভাবে বুদ্ধিদোষে ব্যাসদেব তার নিজের হাতে নির্মিত কাশীর ভবিষ্যৎ নিজের হাতেই নষ্ট করলেন। কারও ক্ষেত্রে যখন এমনটা ঘটে, কেউ যখন একটা ভালো কাজ করতে গিয়েও, বুদ্ধিদোষে সেটা মন্দ কাজে পরিণত হয়, তখন ব্যাসদেব নির্মিত এই ব্যাস-কাশীর প্রসঙ্গ টানা হয়।

গণেশ উল্টানো

অর্থ : উঠে যাওয়া, ফেল মারা, (ব্যবসায়) বন্ধ হওয়া

শিব ও পার্বতীর ছেলের নাম গণেশ। গণেশের যখন জন্ম হলো, তখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল থেকে সব দেবতারা আসলেন তাকে দেখতে। শিব-পার্বতীর সন্তান বলে কথা! অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শনিও আসলেন। এমনিতেই শনি খুব একটা সুবিধার লোক নন। তার উপর তার নিজের স্ত্রী-ই অভিশাপ দিয়েছিলেন—তিনি যার দিকে তাকাবেন, সে-ই ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই শনি নবজাতকের দিকে তাকাচ্ছিলেন-ই না। পার্বতী কিন্তু নাছোড়বান্দা। সন্তান দেখতে এসে সন্তান না দেখেই চলে যাবে? তাই কি হয়? অনুরোধে-উপরোধে পড়ে শেষে শনি তাকালেন গণেশের মুখের দিকে। তারপর যা হবার তাই হলো—গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হয়ে গেল।

তখন তো ভীষণ বিপদ! দ্রুত খবর দেওয়া হল বিষ্ণুকে। তিনি ছুটলেন ব্যবস্থা করতে। পথে দেখলেন এক হাতি, ঘুমুচ্ছে। ব্যস, ওর মাথাই কেটে নিয়ে আসলেন। জুড়ে দিলেন গণেশের মাথায়। তখন থেকেই গণেশ এমন হাতি-মাথা।

www.pathagar.com

অবশ্য গণেশের এই মাথা কাটা যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে আরো অনেকগুলো কাহিনি আছে। কোনো পুরাণে আছে, গণেশের মাথা কাটা যায় সূর্যের পিতা কশ্যপের অভিশাপে। আরেকটাতে আছে, সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর পেটে ঢুকে গণেশের মাথা কেটে ফেলে। কিন্তু সবগুলোরই ফলাফল একই। গণেশের মাথার বদলে একটা হাতির মাথা বসিয়ে দেয়া হলো।

কিন্তু এমন হাতি-মাথা নিয়ে ঘুরলে তো গণেশের অনাদর হতে পারে। তখন সব দেবতা মিলে ঠিক করলেন, এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কোনোভাবেই গণেশের অনাদর না হয়। তখন সিদ্ধান্ত হলো, যে কোনো দেবতার পুজো করতে হলেই আগে গণেশের পুজো করতে হবে। নইলে কোনো দেবতাই পূজা গ্রহণ করবেন না।

তখন থেকেই গণেশ সিদ্ধিদাতা দেবতা। তার পূজা ছাড়া যেমন অন্য দেবতাদের পুজো হয় না, তেমনি তার কৃপা ছাড়া সিদ্ধিলাভও হয় না। অর্থাৎ, ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করতে হলে গণেশের আশীর্বাদ লাগবেই। তাই আগে দোকানদাররা দোকানে আর ব্যবসায়ীরা অফিসে গণেশের ছবি ঝুলিয়ে রাখতেন। আর ব্যবসায়ে ফেল মারলে, মানে ব্যবসা বা দোকান গুটিয়ে নেয়ার সময়, গণেশের সেই ছবি উল্টিয়ে দেওয়ার রেওয়াজও ছিল। সেখান থেকেই 'গণেশ উল্টানো' বাগধারার জন্ম।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে
অর্থ : ধনী লোকের অর্থাভাব

শিবের তিন স্ত্রী—সতী, পার্বতী ও গঙ্গা। আবার অনেক পুরাণে তার আরো এক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়—মঙ্গল। এই মঙ্গল হলেন আদ্যাশক্তি বা শক্তির দেবী। অর্থ, বল, প্রতিপত্তি, প্রজনন ইত্যাদি সবকিছুই তার মূল শক্তি বা আদ্যাশক্তির অংশ। সেই মূল শক্তি বা আদ্যাশক্তিরই একটি অংশ বা রূপ এই দেবী অন্নপূর্ণা।

দেবী অন্নপূর্ণার গায়ের রং রক্তের মতো লাল। চোখ চঞ্চল। গায়ের কাপড় বিচিত্র। মাথায় বালচন্দ্র। তার একপাশে থাকেন ভূমি, আরেক পাশে থাকেন শ্রী। এই ভূমি (বা পৃথিবী) ব্রহ্মার মেয়ে, বিষ্ণুর স্ত্রী। আর শ্রী বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীরই আরেক নাম।

অন্নপূর্ণার দুই হাতের এক হাতে একটা খাবারের পাত্র থাকে, আরেক হাতে থাকে রান্নার সরঞ্জাম (দর্বি বা খুন্তি)। দেবী সবাইকে অন্ন বা খাবার

www.pathagar.com

দিয়ে, সকলের অন্নকষ্ট দূর করেন। অর্থাৎ, তিনি অন্ন বা খাবারের দেবী। কার ভাগ্যে কত খাবার জুটবে, সে সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন।

এখন, সেই দেবী অন্নপূর্ণা যদি কারও ঘরে যান, তার খাবারের কোনো অভাবই আর থাকার কথা নয়। খাবারের দেবী স্বয়ং যদি ঘরে থাকেন, তার খাবারের অভাব হওয়াটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য কথাও নয়। তেমনি যে লোক অনেক বড়লোক, সকলের মাঝে অর্থকড়ি বিলিয়ে বেড়ান, তারও অর্থের অভাব হওয়া, টাকাকড়িতে টান পড়াটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি কারও বেলায় তেমনটা ঘটে, তখন বিস্মিত হয়ে বলা হয়—অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

ভূতের মুখে রামনাম
অর্থ : অসম্ভব ঘটনা, অবিশ্বাস্য ব্যাপার

দেবতা হতে যাদের জন্ম, কিন্তু দেবতা নয়, তাদের বলা হয় দেবযোনি। দেবযোনিরা দশ ধরনের—বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ (রাক্ষস), গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ এবং ভূত।

এই ভূতেরা দেখতে ভীষণ রকমের হয়। এরা গায়ে-গতরে রোগা। কান লম্বা। ঠোঁট মোটা ও ঝুলে পড়া। চোখ সব সময় লাল হয়ে থাকে। ভুরু ঘন। লম্বা লম্বা দাঁত মুখের বাইরে খানিকটা বের হয়ে থাকে। নখ লম্বা। জটা ধরা চুল। গায়ে সাপ উপবীতের মতো জড়ানো থাকে। এরা প্রায় সময়ই নগ্ন থাকে। তবে মাঝে মধ্যে হাতির চামড়ার অদ্ভুত কাপড় পরা ভূতেরও দেখা মেলে। এরা সাধারণত ত্রিশূল ও তীর-ধনুক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। কিছু পুরাণে এদের সংখ্যাও দেয়া আছে—এগার কোটি। এরা অসুরদের বিরুদ্ধে, এমনকি দেবতাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিল।

অনেক পুরাণেই এই ভূতদের সর্দার বা ভূতনাথ হিসেবে রুদ্র বা শিবের নাম বলা হয়েছে। অনেক পুরাণে আবার শিবের দুই চেলা বীরভদ্র ও নন্দীর নাম বলা হয়েছে। অনেক জায়গায় আবার স্কন্দকে বলা হয়েছে ভূতনাথ, অনেক জায়গায় বলা হয়েছে বিনায়কের নাম।

একবার ভূতেদের সর্দার বিনায়ককে আক্রমণ করেন অন্ধক নামের এক দৈত্য। তার কাছে পরাজিত হয়ে বিনায়ক নন্দীর সঙ্গে জোট বাঁধেন। তারপর তারা দুজনে মিলে অন্ধককে আক্রমণ করেন। তখন অন্ধক শিবের শরণ নেন। শেষে শিব অন্ধককেও একদল ভূত দিয়ে দেন। তখন অন্ধকও শিবের চেলা বনে যান। তার নাম হয় ভৃঙ্গী। অবশ্য আরেক পুরাণে আছে, অন্ধক শিবের

www.pathagar.com

সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। শেষে তার কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভৃঙ্গী নাম গ্রহণ করেন।

এই ভূতেরা শিবের বা শিবের শিষ্য নন্দী-ভৃঙ্গীর চেলা হলেও, এরা রামনাম সহ্য করতে পারে না। বলা হয়, রামনাম জপলে ভূতেরা পালিয়ে যায়। আর তাই ভূতের ভয় থাকলে রামনাম জপতে বলা হয়। সেই ভূতেরাই উল্টো রামনাম জপবে, এটা নিতান্তই অসম্ভব একটা ব্যাপার। সে রকম অসম্ভব কোনো ব্যাপার বা ঘটনার বর্ণনা দিতেই বলা হয়—ভূতের মুখে রামনাম।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

অর্থ : অনেকে মিলে এক কাজ করতে গিয়ে পণ্ড করা

শিবের গাজন বা চড়ক পূজাকে ঠিক পৌরাণিক আচার বলা যায় না। কারণ, ধারণা করা হয় এই পুজোর প্রচলন হয়েছে অনেক পরে। আর এর প্রচলন হয়েছে সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে। বৌদ্ধধর্মের ধর্মরাজ হিন্দু ধর্মে এসে ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত হন। গাজন বা চড়ক ছিল মূলত এই ধর্মঠাকুরের পুজো। পরে সেটা শিবের গাজনে রূপ নেয়।

এই শিবের গাজন বা ধর্মঠাকুরের গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। নতুন বছরের শুরুতে গ্রামের জনসাধারণ স্বচ্ছল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় এই গাজন করে। গ্রামের বা গাঁয়ের মানুষের থেকে 'গা', আর জনসাধারণের থেকে 'জন' নিয়েই 'গাজন' শব্দটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে, সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিয়ে দিতেই নাকি এই চড়কের উদ্ভব হয়েছিল। আবার এমন লোকবিশ্বাসও আছে যে, এই গাজনের দিনটিতেই শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। সে দিনটিকে উদযাপন করতেই শিবের গাজন পালন করা হয়। আর সেই গাজনে যে সন্ন্যাসীরা জড়ো হন, তারা নাকি সে বিয়ের বরযাত্রী হিসেবে আসেন।

এই গাজন বা চড়কের পূজায় যে মেলা হয়, সে মেলাতে সন্ন্যাসীরাই সকলের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকেন। তারা কেবল শিবের স্তবই করেন না, নানা শারীরিক কসরতও দেখান। এমনকি শিবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে নানা শারীরিক কষ্টও সহ্য করেন তারা।

সব মিলিয়ে শিবের গাজনে, মানে গাজনের মেলায় বা চড়কের মেলায় অনেক সন্ন্যাসীরা একত্র হন। প্রায়ই সেই সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তা থেকে অনেক সময় ঝগড়াঝাঁটিও লেগে যায়। এভাবে তারা শিবের স্তব করে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জড়ো হলেও, উল্টো তারাই শিবের পুজো এক

www.pathagar.com

রকম পণ্ড করে দেন। এ রকম হলে, মানে অনেকে মিলে একটা কাজ করতে গিয়ে উল্টো দ্বন্দ্ব-কোন্দল করে সে কাজ পণ্ড করে দিলে, তখন ফোড়ন কেটে বলা হয়—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

শিবের কোনো খোঁজ নাই, গাজনের ঘটা ভারি

অর্থ : মূল বিষয় বাদ দিয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়া

শিবের গাজন বা চড়ক পুজোতে কেবল পূজাই হয় না, সঙ্গে বিশাল মেলাও বসে। সব মিলিয়ে বেশ একটা জমজমাট উৎসব আয়োজিত হয়। অনেক জায়গায় এমনও হয়, সারা বছর শিবের উপাসনা-স্তব-পুজো খুব একটা হয় না, মানুষ খুব একটা শিবভক্তও নয়, কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তিতে খুব ধুমধাম করে শিবের গাজনের আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ, শিবের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই, কিন্তু গাজন ঠিকই খুব ঘটা করে পালন করে। প্রায়ই সেসব জায়গায় পূজাটা আর মুখ্য থাকে না, চড়কের মেলাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রায়ই এমনটা ঘটে। মূল কাজের কোনো খবর থাকে না, কিন্তু সে কাজের সঙ্গে আনুষঙ্গিক যেগুলো, সেসব কাজ খুব ঘটা করে করা হয়। তেমন ক্ষেত্রে বলা হয়—শিবের কোনো খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা ভারি।

www.pathagar.com

আরো পৌরাণিক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কলিকাল (ঘোর কলিকাল, ঘোর কলি)
অর্থ : ভীষণ অরাজকতা

এখন বছর গণনা করা হয় সৌরবর্ষের হিসাবে। এই সৌরবর্ষ বা সৌরপঞ্জিকার হিসাব হয় সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে। সেই অনুযায়ী দিন-মাস-বছর হিসাব করা হয়। কিন্তু ভারতীয় পুরাণে কাল বা সময়ের হিসাব করা হয় চান্দ্রবছর বা চান্দ্রপঞ্জিকা দিয়ে। (হিজরি সনও তাই।)

ভারতীয় পুরাণের গণনা অনুযায়ী, একেকটা দিনে থাকে ৬০ দণ্ড। প্রতি দণ্ডে ৬০ পল, প্রতি পলে ৬০ বিপল, আর প্রতি বিপলে ৬ প্রাণ। অর্থাৎ, এখনকার ঘণ্টা-মিনিটের হিসাবে ১ দণ্ড = ২৪ মিনিট, আর ১ প্রাণ = ৪ সেকেন্ড।

আবার একেকটা চান্দ্রদিনকে ৮টা প্রহরে ভাগ করা হয়। এই প্রহরগুলোর সময় অবশ্য সমান নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মানে দিনের বেলা ৪ প্রহর। বাকি ৪ প্রহর রাতের বেলা, মানে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এই প্রহরগুলোকে আবার কয়েকটা মুহূর্তে ভাগ করা হয়। দিনের পনের ভাগের এক ভাগ হলো দিনের একেকটা মুহূর্ত। আর রাতের পনের ভাগের এক ভাগ করে একেকটা রাতের মুহূর্ত। কাজেই বছরের প্রায় কোনো দিনেই মুহূর্ত সমান হয় না। তবে বিষুব সংক্রান্তির দুই দিনে পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি প্রায় সমান হয়। তাই মুহূর্তগুলোও প্রায় সমানই হয়। বিষুব সংক্রান্তির এই দুই দিন হলো—২০ মার্চ (বসন্ত বিষুব) ও ২৩ সেপ্টেম্বর (শারদীয় বিষুব)। এই দুই দিনের হিসাবকে গড় বা মান হিসেবে ধরলে ১ প্রহর হয় ৩ ঘণ্টায়, আর ১ মুহূর্ত হয় ৪৮ মিনিটে।

চান্দ্রমাসের হিসাবও হয় চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে। এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কালকে ধরা হয় এক মাস (চান্দ্রমাস)। ১২ চান্দ্রমাসে হয় এক চান্দ্রবছর। ভারতীয় পুরাণে এই বছরকে বলা হয় মানবীয়

www.pathagar.com

বছর। এই এক মানবীয় বছরের সমান সময়কালে হয় এক দৈব দিন। ৩৬০ দৈব দিনে হয় ১ দৈব বছর। আর ১২ হাজার দৈব বছর মিলে ১ দৈবযুগ বা ১ চতুর্যুগ।

এরকম ৭১টি দৈবযুগ মিলে হয় এক মন্বন্তর। প্রতি মন্বন্তরে একজন করে নতুন মনু আসেন। মন্বন্তর পার হলে কেবল মনুই নন, বদলে যান ইন্দ্রসহ সকল দেবতাই। বদল ঘটে সপ্তর্ষি ও মনুর পুত্রেরও।

এই দৈবযুগ বা চতুর্যুগের চারটি ভাগ থাকে। সেজন্যই একে চতুর্যুগ বলা হয়। চতুর্যুগের চারটি যুগ হলো—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। দৈবযুগের প্রথম ৪,৮০০ দৈব বছর হলো সত্যযুগ (১৭ লক্ষ ২৮ হাজার মানবীয় বছর)। তার পরের ৩,৬০০ দৈব বছর জুড়ে ত্রেতাযুগ (১২ লক্ষ ৯৬ হাজার মানবীয় বছর), পরের ২,৪০০ দৈব বছর দ্বাপরযুগ (৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মানবীয় বছর), আর শেষ ১,২০০ দৈব বছর কলিযুগ (৪ লক্ষ ৩২ হাজার মানবীয় বছর)।

এখন যে মন্বন্তর চলছে, সেটা বৈবস্বত মনুর রাজত্বকাল। তিনি সপ্তম মনু। মানে এখন সপ্তম মন্বন্তর চলছে। এই মন্বন্তরের ২৭টি দৈবযুগ পার হয়ে গেছে। ২৮তম দৈবযুগেরও সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন চলছে বৈবস্বত মন্বন্তরের ২৮তম দৈবযুগের কলিযুগ বা কলিকাল।

এর মধ্যে সত্যযুগের শুরুটা হয়েছিল এক বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে। এই যুগে অবতার এসেছিলেন চারজন—মৎস্য অবতার, কূর্ম অবতার, বরাহ অবতার ও নৃসিংহ অবতার। রাজা ছিলেন ছয়জন—বলি, বেণ, পুরূরবা, মান্ধাতা, ধুন্ধুমার ও কার্তবীর্য। সে সময় অবশ্য পৃথিবীতে কোনো পাপ ছিল না। সবই ছিল পুণ্য। কোনো রোগ-বালাইও ছিল না। মানুষ ইচ্ছামৃত্যু বরণ করত। মানে, জীবনের সায়াহ্নে এসে মানুষ খুশি মনে মৃত্যু বরণের ইচ্ছা করলে, তখন মারা যেত। সে সময় একেকজন মানুষ লম্বায় হতো গড়ে বিশ হাতের মতন। তাদের জীবনকালও ছিল অনেক বেশি। চাইলে তারা লক্ষ বছরও বাঁচতে পারত।

সত্যযুগের পরে শুরু হয় ত্রেতাযুগ। এই যুগে অবতার এসেছিলেন তিন জন—বামন, পরশুরাম ও রাম। সূর্যবংশের বাহুক, ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রমুখ রাজাদের রাজত্বকালও ছিল এই যুগেই। এ সময়ে পৃথিবীতে চার ভাগের তিন ভাগই ছিল পুণ্য। পাপ ছিল মোটে এক ভাগ। মানুষরা গড়ে একেক জন লম্বায় হতো চোদ্দ হাত। তাদের গড় আয়ুও কমে এসেছিল দশ হাজার বছরে।

www.pathagar.com

ত্রেতাযুগের শেষে, এক ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন, রোজ বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগের আরম্ভ। দ্বাপর যুগের অবতার দুজন—কৃষ্ণ অবতার ও বলরাম অবতার। আর রাজাদের মধ্যে অন্যতম—শাল্ব, বিরাট, কংস, হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্ষঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বিষ্ককসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন প্রমুখ। দ্বাপর যুগের অর্ধেক পাপ, আর অর্ধেক পুণ্য। মানুষের গড় উচ্চতা কমে হয় সাত হাত। গড় আয়ু নেমে আসে একশ বছরে। এ যুগেই মানুষ খাওয়া-দাওয়ার জন্য তামার পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করে।

দ্বাপর যুগের শেষে, এখন চলছে কলিযুগ। ধরা হয়, এই যুগ শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে। কলিযুগের দুই অবতারের একজন চলে এসেছেন—বুদ্ধ অবতার। আরেক জন আসবেন—কল্কি অবতার।

এই কলিযুগের অধিষ্ঠাতা দেবতার নাম কলি। অবশ্য এই কলি ভালো কোনো দেবতা নন, নিতান্ত মন্দ দেবতা। দ্বাপরযুগ শেষ হলে ব্রহ্মার পিঠ থেকে সৃষ্টি হয় অধর্মের। অধর্মের স্ত্রী মিথ্যা। অধর্ম-মিথ্যার ছেলে দম্ভ, আর মেয়ে মায়া। এই দম্ভ-মায়া আবার নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করেন। তাদের ছেলে-মেয়ে লোভ আর নিবৃতি। এই লোভ-নিবৃতিও নিজেরা বিয়ে করেন। তাদের ছেলে ক্রোধ, মেয়ে হিংসা। এই ক্রোধ-হিংসারই ছেলে কলি। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো, আর তেলতেলে। বিকট-দর্শন মুখ, লকলকে জিভ। আর ক্রোধ-হিংসার মেয়ে দিরুক্তি। কলি-দিরুক্তিরও এক ছেলে এক মেয়ে আছে। তাদের ছেলে ভয়, আর মেয়ে মৃত্যু।

এই কলি ছিলেন মূলত এক শূদ্র রাজা। একবার তার সাথে দেখা হয় রাজা পরীক্ষিতের। এই পরীক্ষিৎ ছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা। তার বাবা-মা অভিমন্যু ও উত্তরা। পরীক্ষিৎ যখন উত্তরার গর্ভে ছিলেন, তখন একবার অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্র উত্তরাকে আঘাত করে। তাতে পরীক্ষিৎ মারা যান। পরে কৃষ্ণ তাকে জীবিত করে তোলেন। সঙ্গে আশীর্বাদ করেন, পরীক্ষিৎ ৬০ বছর রাজত্ব করবেন।

রাজা হওয়ার পর পরীক্ষিৎ রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে সরস্বতীর তীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। ভাগবতে তিনি যখন রাজ্য জয়ের জন্য বেরিয়েছিলেন, তখনই তার সাথে দেখা হলো কলির। তিনি দেখলেন, কলি এক জোড়া গরু-গাভীকে লাথি মারছে। দেখে ভীষণ রেগে গেলেন পরীক্ষিৎ। তিনি কলিকে বাণ মারতে উদ্যত হলেন। ব্যাপার দেখে কলি দ্রুত তার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন। শেষে পরীক্ষিৎ তাকে ক্ষমা করে দিলেন বটে, তবে শর্ত জুড়ে দিলেন—তার রাজ্য ছাড়তে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু তখন সমস্ত পৃথিবীই ছিল পরীক্ষিতের রাজ্য। মানে কলির আর কোথাও যাওয়ার জায়গা রইল না। শেষে কলির জন্য জায়গা নির্ধারিত হলো—তিনি থাকবেন সে সব জায়গায়, যেখানে অধর্মের কাজ হয়। যেখানে পাশা খেলা হয়, যেখানে বেশ্যালয় আছে, যেখানে মদ্যপান করা হয়, হত্যা-লুণ্ঠন করা হয়, সে সব জায়গায় থাকবেন কলি।

নিষধের রাজা নল বিয়ে করেছিলেন বিদর্ভের রাজার মেয়ে দময়ন্তীকে। এই নলকে কলি পাপ পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। নলের সাথে দময়ন্তীর বিয়েতে দূতিয়ালি করে কতগুলো হাঁস। নল একবার এই হাঁসগুলোকে মারতে গিয়েছিলেন। তখন হাঁসগুলো তাদের মারতে নিষেধ করল। নলকে দময়ন্তীর কথা শুনিয়ে বলল, তাদের ছেড়ে দিলে তারা দময়ন্তীকে পাইয়ে দেবে।

নলও তখন হাঁসগুলোকে ছেড়ে দিলেন। হাঁসগুলোও তখন দল বেঁধে দময়ন্তী ও তার সখীদের কাছে গিয়ে নলের অনেক প্রশংসা করল। হাঁসদের মুখে নলের প্রশংসা শুনতে শুনতে দময়ন্তীও নলের প্রেমে পড়ে গেলেন। নলকে বিয়ে করার জন্য দময়ন্তী স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। আর এই স্বয়ংবর সভা থেকেই নলের উপর কলির রাগের উৎপত্তি।

দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম। কিন্তু দময়ন্তী মানুষ নলকেই বিয়ে করার জন্য পছন্দ করলেন। নল-দময়ন্তীর এই ভালোবাসা দেখে দেবতারাও খুশি হলেন। তারা নলকে মোট আটটা বর দিলেন।

ওদিকে কলি ও দ্বাপরও আসছিলেন এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে। তাদের মনেও আশা ছিল, তারা দময়ন্তীকে বিয়ে করবেন। পথে দেখা হলো, ইন্দ্র আর অন্যান্য দেবতাদের সাথে। তারা তখন ফিরে আসছিলেন। তাদের কাছ থেকেই শুনলেন, দময়ন্তী নলকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছেন। শুনে কলি ও দ্বাপর দুজনেই ভীষণ রেগে গেলেন। কলি তো নলকে তখনই শাস্তি দিবেন ঠিক করলেন। মানুষ হয়ে সে দেবতাদের অবজ্ঞা করে দময়ন্তীকে বিয়ে করতে চায়! তখন ইন্দ্র আর অন্যান্য দেবতারা তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তখনকার জন্য ঠাণ্ডা হলেও, কলি কিন্তু ব্যাপারটা ভুলে গেলেন না। তক্কে তক্কে থাকলেন, কখন নলের দেহে প্রবেশ করা যায়, তার জন্য।

সুযোগ অবশ্য সহসা মিলল না। মিলল বার বছর পর। একদিন প্রস্রাব করে পা ধুতে ভুলে গেলেন নল। সে অবস্থাতেই বসে গেলেন সন্ধ্যা আহ্নিকে। অপবিত্র শরীরে প্রার্থনা—ছুতো পেয়েই নলের শরীরে ঢুকে গেলেন কলি। বাইরে থেকে সাহায্য করতে থাকলেন দ্বাপর। দুজনে মিলে নলকে একদম নিঃস্ব-রিক্ত করে ছাড়লেন। তাকে পাশা খেলিয়ে তার রাজ্য, ধনসম্পদ এমনকি

www.pathagar.com

পরনের কাপড় পর্যন্ত কেড়ে নিলেন। শেষে নল দময়ন্তীকেও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

এমন যে দেবতা কলি, তার যুগটা যে ঘোর অধর্মের যুগ হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! এই কলিযুগের চার ভাগের তিন ভাগই অধর্ম, এক ভাগ মাত্র ধর্ম। পুরাণে আছে, কলিযুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কি-অবতার রূপে পৃথিবীতে আসবেন। এসে তিনি সকল পাপ দমন করবেন। তার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আবার সত্যযুগের আরম্ভ হবে।

আর তাই ভীষণ অরাজকতা দেখলেই অনেকে মুখ বাঁকিয়ে মনে করিয়ে দেন, এখন ওই কলির যুগ চলছে। বলে ওঠেন, কলিকাল হে, ঘোর কলিকাল!

সবে কলির সন্ধ্যা
অর্থ : বিপদ কেবল শুরু

ধরা হয়, এই কলিযুগ বা কলিকাল শুরু হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে। মানে, কলিযুগের মোটে পাঁচ হাজার বছর পেরিয়েছে। অথচ মানবীয় বছরের হিসাবে, এই কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪ লাখ ৩২ হাজার বছর। মানে, কলিযুগের মোটে শুরু হলো—সবে কলির সন্ধ্যা। এখনই যদি পাপাচার দেখে কেউ অস্থির হয়ে পড়ে, যখন কলিযুগের মধ্যভাগ বা শেষভাগ আসবে, তখন তারা কী করবে!

অনেক সময় বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিও এমন হয়। কোনো বিপজ্জনক কাজে নেমে, বিপদ শুরু হতে না হতেই অনেকে অস্থির হয়ে পড়ে। তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, সবে তো কলির সন্ধ্যা!

একাদশে বৃহস্পতি
অর্থ : সৌভাগ্যের বিষয়

এই বাগধারাটা যেমন পুরাণ থেকে এসেছে, তেমনি এসেছে জ্যোতির্বিদ্যা থেকেও। আসলে পুরাণের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার বেশ একটা সম্পর্ক আছে। এই যেমন বৃহস্পতি; জ্যোতির্বিদ্যায় সবচেয়ে ভালো গ্রহ হলো বৃহস্পতি। পুরাণে আবার এই বৃহস্পতি রীতিমতো কেউকেটা গোছের একজন। সে অঙ্গিরার পুত্র। এই অঙ্গিরা আবার স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র।

একবার অঙ্গিরা জোর তপস্যা করে অগ্নির চেয়েও তেজস্বী হয়ে উঠেছিলেন। তখন অগ্নির তো ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সে অগ্নি, অথচ

www.pathagar.com

অঙ্গিরা কিনা তারচেয়েও তেজস্বী হয়ে গেলেন! অগ্নি তখন একেবারে পানির ভেতরে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করলেন।

তখন অঙ্গিরা নিজেই গেলেন অগ্নির কাছে। তাকে বোঝালেন, অগ্নি না থাকলে তো জগতের বিপদ। শেষমেশ অগ্নি সন্তুষ্ট হলেন। আবার আপন অগ্নিতেজ গ্রহণ করলেন। মানে আগের মতোই ভয়ঙ্কর আর সর্ববিনাশী রূপে ফিরে এলেন। বিনিময়ে অঙ্গিরা অগ্নির কাছ থেকে এক পুত্রসন্তানের বর চেয়ে নিলেন। অঙ্গিরার সেই সন্তানই হলো বৃহস্পতি। তার মায়ের নাম শ্রদ্ধা।

এই বৃহস্পতির অনেক গুণ। তিনি দেবতাদের পুরোহিত। তার প্রসাদ ছাড়া যজ্ঞলাভ হয় না। তিনি অগ্নির ন্যায় ত্রিলোকবাসী; মানে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তিন লোকেই বাস করেন। তিনি দেবকামীদের ফল দেন। প্রাণীদের চৈতন্য প্রদান করেন। তার আদেশেই চন্দ্র-সূর্য বিকশিত হয়। তিনি ছন্দের অধিকারী। এমনি আরো অনেক গুণ আছে তার। শুধু তাই না, তার চেহারার বর্ণনাও অপূর্ব। তার বর্ণনায় বলা হয়, তার সপ্ত মুখ, সপ্ত রশ্মি, মিষ্ট জিহ্বা, নীল পিঠ, হিরণ্য ও লোহিত বর্ণ, মানে সোনালি আর লালচে রং। তার রথ বহন করে আটটি ঘোড়া; তাদের গায়ের রং-ও লাল।

যদি বলা হয়, কারও ভাগ্যে এই বৃহস্পতির আনাগোনা চলছে, সেটা তো সৌভাগ্যের বিষয়ই হবে।

শনির দশা (শনির ফের, শনির আছর)
অর্থ : ভীষণ দুরবস্থা

পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

এদের মধ্যে সোমকে অনেক পুরাণেই চন্দ্র বা চাঁদের সাথে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে। আরেক পুরাণে আছে, শনি মূলত সূর্যের ছেলে। সূর্যের স্ত্রী ছিলেন সংজ্ঞা। কিন্তু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা তাকে ফেলে চলে আসেন। রেখে আসেন তার ছায়াকে। সূর্য ছায়াকেই জানতেন সংজ্ঞা বলে। এই সূর্য ও ছায়ার দুই ছেলে ও এক মেয়ে হয়। শনি তাদের দ্বিতীয় ছেলে। তার বিয়ে হয় চিত্ররথের মেয়ের সঙ্গে।

একদিন শনি ধ্যান করছিলেন। ওদিকে তার স্ত্রী তখন ঋতুবতী। তিনি সেজেগুজে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। শনি তো তখন ধ্যান করছেন। তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকালেন না। রেগেমেগে তার স্ত্রী তাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—শনি যার দিকে তাকাবে, সেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং,

www.pathagar.com

কারও কপালে শনির আনাগোনা দেখা দিলে, তার কপালে তো খারাপি থাকবেই।

অবশ্য শনির দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়। শিব-পার্বতীর পুত্র গণেশের জন্ম হলে, অন্য দেবতাদের সঙ্গে শনিও গণেশকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখতে গিয়েও অবশ্য তিনি গণেশের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেনই না। কিন্তু পার্বতীর জোরাজুরিতে শেষ পর্যন্ত গণেশের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আর অমনি গণেশের মুণ্ড দেহচ্যুত হয়ে গেল। শেষে বিষ্ণু এসে এক হাতির মাথা নিয়ে গণেশের মাথায় জুড়ে দিলে, তবে রক্ষা হলো। শনির অবশ্য শেষ রক্ষা হলো না। পার্বতীর অভিশাপে শনি চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেলেন।

পুরাণে (এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে) এই গ্রহগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মানুষের জীবনে। মানুষের জন্মের সময় থেকেই তার জীবনের উপর এই গ্রহগুলোর প্রভাবের শুরু। মানুষের উপর গ্রহের এই প্রভাবকে দশা বলে। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন গ্রহের দশা ভোগ করে।

যে শনি এমন অভিশপ্ত, যার দিকে তাকান, সেই ধ্বংস হয়ে যায়, কেউ সে গ্রহের দশায় পড়লে, তার তো ভীষণ দুরবস্থা হবেই। তাই কেউ চরম দুরবস্থায় পড়লে, তখন বলা হয়, তার শনির দশা বা শনির ফের চলছে। অথবা বলা হয়, তার উপর শনির আছর পড়েছে।

যজ্ঞের ঘোড়া

অর্থ : অসহায় বা বিপন্ন ব্যক্তি

সনাতন বা হিন্দু ধর্মের যে মূল গ্রন্থ, সেই বেদ মূলত আর্য জাতির রচনা। এই আর্যদের মূল সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞতে মূলত দেবতাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দ্রব্য দান করা হতো। ভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থগুলি এই যজ্ঞের বর্ণনায় ভরপুর। সেগুলোতে কোন যজ্ঞ কেন-কখন করা হয়, যজ্ঞগুলোতে কী কী আচার পালন করতে হয়, কোন যজ্ঞে কোন দেবতাকে কী দ্রব্য দান করতে হয়, সে সবের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে।

যজ্ঞগুলোতে যে সব দ্রব্য দান করা হতো, সেগুলোর নাম হব্য। দান করার নাম আহুতি। আর যে আগুনে দান করা হতো, তার নাম হোম বা হোমাগ্নি। যজ্ঞগুলোতে এই হোমে যে সব হব্য আহুতি দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে আছে—ঘি, পায়েসান্ন বা পায়েস-ভাত, দুধ, দই, রুটি, মাংস, সোমলতার রস ইত্যাদি। এগুলো দান করার আরেক নাম যাগ দেয়া বা করা। যার আয়োজনে, বা যার মঙ্গল কামনায় যাগ করা হত, তাকে বলা হত যজমান। যে যজ্ঞ সম্পন্ন

www.pathagar.com

করত, সে যাজক বা ঋত্বিক। সে নির্দিষ্ট যজ্ঞের নির্দিষ্ট হব্য আহূতি বা যাগ দিয়ে, নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞ পালন করত।

এই যজ্ঞগুলোর মধ্যে সেরা যজ্ঞ হলো অশ্বমেধযজ্ঞ। এই যজ্ঞের সৃষ্টি করেন স্বয়ং প্রজাপতি। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর, তবেই অশ্বমেধযজ্ঞ করা যেত। যজ্ঞটা শুরু করতে হতো বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে। তারপর চলত এমনকি এক বছর পর্যন্তও। মূলত রাজারা পুত্রকামনায়, নয়তো রাজচক্রবর্তী হওয়ার আশায় এই যজ্ঞ করতেন।

এই যজ্ঞের জন্য একটি ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ঘোড়া অবশ্য যে-সে ঘোড়া হলে হবে না। সে ঘোড়ার গায়ের রং হতে হবে মেঘের মতো কালো। পেটের অংশের রং হতে হবে কুন্দ ফুলের মতো সাদা। পা সবুজ, কান সিঁদুরের মতো লাল, মুখের রং সোনার মতন। আর জিভ হতে হবে আগুনের শিখার মতো। দুপাশে অর্ধচন্দ্রের চিহ্ন থাকতে হবে। ছোটার সময় সে ঘোড়ার লেজ বিদ্যুতের মতো ঝলসে-ঝলসে উঠতে হবে। অশ্বমেধযজ্ঞ করতে প্রথমে এমন ভীষণ দ্রুতগতির আর সুন্দর একটা ঘোড়াকে ছেড়ে দেয়া হয়। তার কপালে বেঁধে দেয়া হয় জয়পত্র। আর সে ঘোড়ার পেছনে রাজা বা রাজার বিশাল সৈন্যবাহিনী ছুটতে থাকে। তাদের দায়িত্ব, যজ্ঞের ঘোড়াটি যাতে চলার পথে কোনো বাধা না পায়, তা নিশ্চিত করা।

যজ্ঞের এই ঘোড়া যেখান দিয়ে যাবে, সে জায়গাগুলোর সবই যজমান রাজার অধীনে চলে আসবে। মানে, ঘোড়া যার রাজ্য দিয়েই যাবে, তাকেই রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। বাধা দিলেই যুদ্ধ। হয় যুদ্ধ করে যজমান রাজাকে হারাতে হবে, নইলে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। যজ্ঞের ঘোড়া যতগুলো রাজ্য দিয়ে যাবে, যজমান রাজা যদি সে সব রাজ্যের সবগুলোর রাজাকেই বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন, তবে তিনি রাজচক্রবর্তী উপাধি লাভ করেন।

এই পর্যন্ত যজ্ঞের ঘোড়া বেশ সুখে-শান্তিতেই একটা বছর পার করে। সে যেমন ইচ্ছা ছুটতে পারে, কেউ তাকে বাধা দেয় না। উল্টো সে যেন তার ইচ্ছামতো ছুটতে পারে, সে জন্য স্বয়ং রাজার বাহিনীই তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। কিন্তু এক বছর পরে যখন ঘোড়াকে ফিরিয়ে এনে মূল যজ্ঞ শুরু করা হয়, তখন সে ঘোড়ার সব সুখের সমাপ্তি তো বটেই, জীবনেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। অশ্বমেধযজ্ঞের মূল আয়োজনে বলি দেয়া হয় যজ্ঞের ঘোড়াটিকে।

যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে যজ্ঞের ঘোড়াকে বলি দেয়া হয়। পরে সে ঘোড়ার মেদ পুড়িয়ে যে ধোঁয়া হয়, রাজা সে ধোঁয়া গ্রহণ করেন। একে বলা হয় 'দগ্ধাবসার

www.pathagar.com

ধূম'। বলি দেয়া ঘোড়ার শরীরের বাদবাকি পুরোটাই, টুকরো টুকরো করে কেটে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেয়া হয় হোমাগ্নিতে।

অর্থাৎ, যজ্ঞের ঘোড়া প্রকৃতপক্ষে নিতান্তই বিপন্ন এক প্রাণী। একটা ঘোড়া যজ্ঞের জন্য নির্বাচিত হয়েছে মানেই, সর্বোচ্চ বছরখানেক পরে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাকে অশ্বমেধযজ্ঞে বলি দেয়া হচ্ছে। তাই নিতান্ত বিপন্ন, অসহায় ব্যক্তিকে বোঝাতে, সামনে যার পরাভব নিশ্চিত, তাকে বলা হয়—যজ্ঞের ঘোড়া।

অগস্ত্য যাত্রা

অর্থ : চিরদিনের জন্য প্রস্থান/চিরবিদায়/মৃত্যু

'অগস্ত্য' বেদের একজন ঋষির নাম। তিনি 'সূর্য' ও 'বরুণ'-এর সন্তান। তিনি চিরকুমারব্রত গ্রহণ করেছিলেন। মানে, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, জীবনে কখনো বিয়ে করবেন না।

একদিন তিনি এমনি এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে একটা গুহার কাছে চলে গেলেন। গুহার ভেতরে ঢুকে দেখলেন, তার পূর্বপুরুষরা সেখানে উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। সবার মুখ মলিন, বিষণ্ন। তখন তাদের জিজ্ঞেস করে অগস্ত্য মুনি জানতে পারলেন, তিনিই তার পূর্বপুরুষদের এই দুর্ভোগের কারণ। তিনি এ জীবনে বিয়ে করবেন না, তাই তাদের বংশরক্ষারও কোনো সম্ভাবনা নেই। সে জন্যই তাদের এমন দুর্ভোগ। তখন, পূর্বপুরুষদের এই দুর্ভোগ দেখে তিনি তার সিদ্ধান্ত বদলালেন। ঠিক করলেন, বিয়ে করবেন।

তখন অগস্ত্য মুনি বিয়ে করার জন্য তপস্যায় বসলেন। তপস্যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়ে এক পরমাসুন্দরী নারীকে সৃজন করলেন। তার নাম দিলেন লোপামুদ্রা। পরে এই লোপামুদ্রাকে তিনি বিদর্ভরাজের হাতে তুলে দিলেন। বিদর্ভরাজ তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। পরে লোপামুদ্রা বড় হলে, অগস্ত্য মুনি তাকে বিয়ে করলেন।

এতেই অবশ্য অগস্ত্য মুনির পূর্বপুরুষদের দুঃখের শেষ হয়নি। কারণ, লোপামুদ্রা তো বিদর্ভরাজের কাছে আরাম-আয়েশে মানুষ হয়েছিলেন। অগস্ত্যের কাছে এসে মুনিদের মতো কঠিন জীবনে তিনি ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। শেষমেশ তিনি দাবি করে বসলেন, বিদর্ভরাজের কাছে থাকাকালে যেমন সারা গায়ে অলঙ্কার জড়িয়ে তিনি ঘুমুতে যেতেন, অগস্ত্য মুনির ঘরেও তেমনটাই চান তিনি। নইলে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে একটুও ঘর

www.pathagar.com

করবেন না। অগস্ত্য মুনির পক্ষে তো তেমনটা একেবারেই সম্ভব না। তারপরও তিনি সব রাজাদের কাছে গেলেন। রাজারা কেউই তাকে তেমন একটা সাহায্য করলেন না। উল্টো তাকে দানবরাজ ইল্বলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এই ইল্বল আর তার ভাই বাতাপির অত্যাচারে তখন মুনি-ঋষিরা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এরা এক ভয়ঙ্কর খেলা শুরু করেছিলেন। ইল্বল ভালোমানুষ সেজে কোনো এক মুনিকে ডেকে আনত। বাতাপিকে কেটেকুটে রান্না করে তাকে খাওয়াত। তারপর বাতাপি সেই মুনির পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত। তখন সেই মুনিও সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। এভাবে তারা যে কত মুনিকে মেরেছিল, তার ইয়ত্তা নেই।

ইল্বল আর বাতাপি অগস্ত্য মুনির সঙ্গেও একই কাজ করল। কিন্তু বাতাপি আর অগস্ত্য মুনির পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারল না। তার আগেই অগস্ত্য মুনি বাতাপিকে হজম করে ফেললেন। তখন ভয়ে-বিস্ময়ে ইল্বল অগস্ত্য মুনির সব চাহিদা পূরণ করে দিলেন। তাকে প্রচুর ধনরত্ন দিলেন। তারপর অগস্ত্য আর লোপামুদ্রা সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে লাগলেন। তাদের একটা শক্তিশালী ছেলেও হলো। নাম দৃঢ়স্যু।

আরেকবার বৃত্রাসুরের সাথে ইন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বৃত্রাসুরের পরাজয় ঘটল। ইন্দ্রের হাতে মারা গেল বৃত্রাসুর। এই বৃত্রাসুরের অনুসারী ছিল কালকেয় অসুররা। এই কালকেয়রা ছিল ষাট হাজার ভাই। বৃত্রাসুর মারা গেলে এরা সবাই সাগরের তলদেশে গিয়ে আশ্রয় নিল। ওখান থেকে ওরা প্রতি রাতে আশ্রমে আক্রমণ করে একে-ওকে মেরে-কেটে যেত। এক সময় ব্যাপারটা দেবতাদের ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। তখন তারা গেলেন নারায়ণের কাছে, শলা-পরামর্শ করতে। নারায়ণ বুদ্ধি দিলেন, অগস্ত্য মুনিকে ডাকা হোক। সে সাগরের সব পানি শুষে নেবে। তারপর কালকেয় অসুরদের মারা আর এমন কী কঠিন কাজ! তখন অগস্ত্য মুনিকে ডাকা হলো। তিনি এসে গোটা সাগরের জল শুষে নিলেন। তারপর দেবতারা কালকেয় অসুরদের বিনাশ করলেন।

এই ভয়ঙ্কর অগস্ত্য মুনি ছিলেন বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। একবার বিন্ধ্যপর্বতের এক অদ্ভুত ইচ্ছা হলো। সূর্য তো উদয়াস্তকালে সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন। বিন্ধ্যপর্বতের ইচ্ছা হলো, সূর্য তাকেও এভাবে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করবেন। তার এই অদ্ভুত ইচ্ছা হওয়ার পেছনে অবশ্য নারদেরও খানিকটা দায় আছে। সে যাই হোক, তখন বিন্ধ্যপর্বত সূর্যকে গিয়ে বললেন, তাকেও প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করতে হবে। কিন্তু সূর্য রাজি হলেন না। তার সোজা কথা— শিবের বাতলানো পথেই তিনি সূর্যকে পরিভ্রমণ করবেন। অন্য পথে তিনি যাবেনই না।

www.pathagar.com

শুনে তো বিন্ধ্যপর্বত ভীষণ রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে নিজের শরীর এমনভাবে ফোলাতে-ফাঁপাতে শুরু করলেন, সূর্যের পথই বন্ধ হয়ে গেল। এবার তো ভীষণ বিপদ হয়ে গেল। সূর্য তো সূর্য, দেবতারাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেলে তো গোটা সৃষ্টিজগৎই বিপন্ন হয়ে পড়বে! তখন সবাই মিলে গিয়ে ধরলেন বিন্ধ্যপর্বতের গুরু অগস্ত্য মুনিকে।

সব শুনে অগস্ত্য মুনি চললেন ব্যাপারটার সুরাহা করতে। সোজা গেলেন বিন্ধ্যপর্বতের কাছে। গুরুকে দেখেই বিন্ধ্যপর্বত একেবারে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য মুনি তখন বললেন, আমি দক্ষিণাপথে যাত্রা করছি। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসছি, তুমি এভাবেই থাক। এই বলে অগস্ত্য মুনি দক্ষিণাপথে সেই যে যাত্রা করলেন, আর ফিরলেন না। সেদিন ছিল ১ ভাদ্র। তাই ১ ভাদ্র নাকি কোনো যাত্রা করতে হয় না। সেদিনটা নাকি শুভযাত্রার জন্য একদম নিষিদ্ধ।

আবার অনেক পুরাণে আছে, অগস্ত্য মুনি এখনো ওই দক্ষিণাকাশেই আছেন। নক্ষত্র হয়ে। তিনি তো গিয়েছিলেন শরৎকালের শুরুতে, মানে ভাদ্র মাসের ১ তারিখে। তাই সে মাসের ১৭-১৮ তারিখে তিনি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। সেদিনই ওই নক্ষত্রটা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।

অগস্ত্য মুনির সেই যাত্রা থেকেই 'অগস্ত্য যাত্রা' অর্থ হয়ে গেল এমন যাত্রা করা, যে যাত্রা থেকে কেউ আর ফিরে আসে না। পরে সেটাই হয়ে গেল মারা যাওয়া।

গজ-কচ্ছপ লড়াই (গজ-কচ্ছপী লড়াই)

অর্থ : ভাইয়ে ভাইয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ, জ্ঞাতিদের দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ

অনেক আগে বিভাবসু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তবে তার রাগ ছিল অনেক বেশি। তার ছোট ভাইয়ের নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীক তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি করার জন্য বিভাবসুকে প্রায়ই বলতেন। একই কথা বারবার শুনতে শুনতে বিভাবসু বিরক্ত হয়ে একদিন ছোট ভাইকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন। ভাইয়ের অভিশাপে সুপ্রতীক হাতি হয়ে গেল।

তখন সুপ্রতীকও বড় ভাইকে অভিশাপ দিয়ে কচ্ছপ বানিয়ে দিল। তারপর দুই ভাই শুরু করল মারামারি। গজ বা হাতি আর কচ্ছপে মারামারি— গজ-কচ্ছপ লড়াই। সে মারামারি বহুকাল ধরে চলতে লাগল, চলতেই লাগল।

www.pathagar.com

ওদিকে কশ্যপ মুনির দুই ছেলে—অরুণ আর গরুড়। তাদের মা বিনতা। বিনতা দুইটি ডিম প্রসব করেছিলেন। একটি ডিম অসময়ে ভেঙে অরুণকে বের করায়, তার শরীরের নিচের অংশ ছিল না। অন্য ডিমটি থেকে গরুড়ের জন্ম হয়। তাদের সৎমা কদ্রু। কদ্রু কৌশলে অরুণ-গরুড়ের মা বিনতাকে দাসী বানিয়ে রেখেছিল। সে জন্যই কদ্রুর সন্তান সাপদের সাথে পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড়ের চিরশত্রুতা।

তো কদ্রুর কবল থেকে মা বিনতাকে উদ্ধারের জন্য গরুড় অমৃত আনতে রওয়ানা দিলেন। পথে যেতে যেতে তার লেগে গেল ভীষণ খিদা। তখন তিনি বাবা কশ্যপকে বললেন কিছু খাবারদাবারের বন্দোবস্ত করে দিতে। তখন কশ্যপ মুনিও দূরে লড়তে থাকা গজ-কচ্ছপকে, মানে বিভাবসু আর সুপ্রতীককে দেখিয়ে দিলেন।

ব্যস, গরুড় দুই ভাইকে দুই নখে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা বটগাছের ডালে গিয়ে বসলেন। বটগাছের ডালটা এত ওজন নিতে না পেরে ভেঙে গেল। সে ডালে আবার ষাট হাজার খুদে খুদে বালখিল্য মুনি উল্টো হয়ে ঝুলে তপস্যা করছিলেন। তখন, মুনিদের শাপের ভয়ে গরুড় তাড়াতাড়ি সে ডাল ঠোঁটে নিয়ে উড়ে গেলেন বাবার কাছে।

কশ্যপ মুনি তখন হিমালয়ে। তার অনুরোধে বালখিল্য মুনিরা তখন হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করলেন। আর তার কথামতো গরুড় হিমালয়ের আরেকটা পর্বতের চূড়ায় বসে গজ আর কচ্ছপ, মানে বিভাবসু আর সুপ্রতীককে খেয়ে পেটপুজো সেরে নিলেন।

এ রকম যদি ভাইয়ে-ভাইয়ের মধ্যে, কিংবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দীর্ঘকাল বিবাদ চলে, তখন বাইরের অনেকেই সে লড়াইয়ের সুযোগ নিতে পারে, তাদের দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে। আর সে রকম ভাইয়ে-ভাইয়ে বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিবাদ বোঝাতেই এই বাগধারাটির প্রচলন হয়েছে।

বালখিল্য স্বভাব, বালখিল্যতা
অর্থ : শিশুজনোচিত, ছোটদের মতো ব্যবহার

বালখিল্য মূলত এক শ্রেণীর ঋষির নাম। এদের মোট সংখ্যা ষাট হাজার। এই ঋষিরা আকারে একেক জন একেকটা বুড়ো আঙুলের সমান। তবে আকারে ছোট হলে কী হবে, এদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা মোটেই কম নয়। এরাও ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার লোম থেকে এদের জন্ম।

www.pathagar.com

একবার কশ্যপ ঋষি এক যজ্ঞ আয়োজনের কথা ভাবলেন। তো সেই যজ্ঞের আগুনের জ্বালানি, মানে কাঠ-খড়কুটো-লতাপাতা জড়ো করার ভার দিলেন এই বালখিল্য মুনিদের। কিন্তু বালখিল্য মুনিরা তো নিতান্তই ছোট। তারা সবাই মিলে একটা পাতা বয়ে আনতে আনতেই ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেলেন। তো তারা যে পথ দিয়ে পাতাটা বয়ে আনছিলেন, সে পথে সামনেই একটা গোষ্পদ, মানে গরুর পায়ের চাপে তৈরি গর্ত ছিল। সে গর্ত ভরা পানি। বালখিল্যরা পাতা বইতে বইতে সেদিকে আর খেয়াল করতে পারেননি। পাতাসমেত সবাই মিলে সেই পানি-ভর্তি গোষ্পদে গিয়ে পড়লেন। তাই দেখে ইন্দ্রের সে কী হাসি!

তাই দেখে বালখিল্যরা তো ভীষণ রেগে গেলেন। শোধ নিতে তারা নিজেরাই এক মহাযজ্ঞ শুরু করে দিলেন। ইন্দ্রের চেয়েও শক্তিশালী আরেক ইন্দ্র সৃষ্টির জন্য। খবর পেয়ে ইন্দ্র তো ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারচেয়েও শক্তিশালী ইন্দ্রের আবির্ভাব ঘটলে তো তার সমূহ বিপদ। তিনি তখন ছুটে গেলেন কশ্যপের কাছে। কশ্যপ সব শুনে ছুটে এলেন বালখিল্যদের কাছে। তাদের বোঝালেন, ব্রহ্মা স্বয়ং ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তারা যদি আরেকজন ইন্দ্রের সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেন, তাহলে তো ব্রহ্মাকেই অমান্য করা হবে। কাজেই আরেকজন আরো শক্তিশালী ইন্দ্রের দরকার নেই। তার বদলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। বালখিল্যদের প্রার্থনায় এক পক্ষীশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে।

বালখিল্যরা তাতে রাজি হলেন। তখন বালখিল্য মুনিদের তপস্যার প্রভাবে আর কশ্যপের সংকল্পের জোরে, কশ্যপের স্ত্রী বিনতার গর্ভে, কশ্যপের ঔরসে দুই বীর পুত্রের জন্ম হলো—অরুণ আর গরুড়। এরা দুজনে পক্ষীশ্রেষ্ঠ, সমস্ত পাখিদের উপর তারা ইন্দ্রত্ব করে।

একবার ক্ষুধার্ত গরুড় কশ্যপকে বললেন তার খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দিতে। কশ্যপ তাকে লড়তে থাকা গজ-কচ্ছপদের দেখিয়ে দিলেন। তখন গরুড়ও গজ-কচ্ছপদের নিয়ে, একটা বটগাছের ডালে গিয়ে বসলেন। কিন্তু বসতেই সেই ডাল ভেঙে পড়ল। সেই ডালেই আবার ষাট হাজার বালখিল্য ঋষি উল্টো হয়ে ঝুলে তপস্যা করছিলেন। তারা যদি অভিশাপ দিয়ে দেন, তাহলে তো ভীষণ বিপদ। গরুড় তখন তাড়াতাড়ি করে ডালটা ঠোঁটে করে নিয়ে সোজা চলে এলেন তার বাবা, মানে কশ্যপের কাছে। তখন কশ্যপ বালখিল্য মুনিদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করলেন। তারপর তার অনুরোধে বালখিল্যরা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করলেন।

এই নিতান্ত খুদে আকৃতির বালখিল্য ঋষিদের নাম থেকেই শব্দটা ছোট শিশুদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আর তাদের আচার-ব্যবহারও

www.pathagar.com

বেশ শিশুতোষ। ইন্দ্র তাদের দুর্দশা দেখে একটু হেসে দিয়েছিলেন, তাতেই তারা আরেকটা ইন্দ্র সৃষ্টির মতো বিশাল দাবি তুলে তপস্যা শুরু করে দিয়েছিলেন। তেমনি কেউ যখন নিতান্ত বাচ্চাদের মতো আচার-ব্যবহার করে, কিংবা নিতান্ত বাচ্চাদের মতো গোঁ ধরে, তখন সে ব্যবহারকে বলা হয় 'বালখিল্য স্বভাব' বা 'বালখিল্যতা'।

চোরা গরুর সঙ্গে (বা গরু চুরির অপরাধে) কপিলার বন্ধন
অর্থ : দোষীর সংসর্গে থাকলে নিরপরাধ ব্যক্তিকেও ফলভোগ করতে হয়
সমার্থক প্রবাদ : সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ

কপিল মুনি ছিলেন বিখ্যাত ঋষি। তার বাবা ছিলেন কর্দম প্রজাপতি। আর মা দেবহুতি। এই কপিল মুনি ছিলেন সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। এই দর্শনে তিনি মূলত নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি দেখান, প্রকৃতি অনাদি। আর প্রকৃতির মতো পুরুষ বা আত্মাও অনাদি। কর্ম অনুসারে মানুষের আত্মা এক দেহ থেকে আরেক দেহে আশ্রয় নেয়। কর্মক্ষয় হলে এই দেহান্তর গ্রহণ শেষ হয়।

এই কপিল মুনি একাগ্রচিত্তে তপস্যা করতেন। তার তপস্যায় যাতে কেউ ব্যাঘাত না ঘটায়, সে জন্য তিনি তার আশ্রম বানিয়েছিলেন পাতালে। সেখানেই একমনে তপস্যা করতেন তিনি।

একবার সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এই সগর ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। তার বাবা রাজা বাহু, মা যাদবী। তার মা যখন গর্ভবতী হয়েছিলেন, তখন তার সৎমা যাদবীকে বিষ খাওয়ান। কিন্তু সগরের দৈবশক্তিতে তার মায়েরও কিছু হলো না, মায়ের গর্ভে থাকা সগরেরও কিছু হলো না। এভাবে বিষ সাথে নিয়েই জন্ম বলে, তার নাম হয় সগর (স = সহ, গর = গরল/বিষ)।

এই রাজা সগরের কোনো সন্তান হচ্ছিল না। তখন তিনি সন্তান কামনা করে শিবের তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হলে, সগরকে বর দিলেন, তার এক স্ত্রীর গর্ভে ষাট হাজার ছেলে হবে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হবে বটে, কিন্তু একসঙ্গে তারা সবাই ধ্বংস হবে। আর অন্য স্ত্রীর গর্ভে একজনই সন্তান হবে। সে যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনি তার বংশরক্ষাও করবে। পরে তার স্ত্রী কেশিনীর ষাট হাজার ছেলে হয়, আর সুমতির হয় একটিমাত্র ছেলে। সুমতির ছেলের চরিত্র ছিল দেবতার মতো। কিন্তু কেশিনীর ছেলেরা ছিল ভীষণ অত্যাচারী। তারপরই রাজা সগর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন শুরু করলেন।

www.pathagar.com

রাজা সগর শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে শুরু করলে, ইন্দ্র ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ, কোনো রাজা একশ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে, তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। সে ভয়েই, ইন্দ্র রাজা সগরের শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ থামানোর ফন্দি আঁটলেন। তিনি কৌশলে যজ্ঞের ঘোড়াটিকে চুরি করলেন। তারপর ঘোড়াটিকে নিয়ে সোজা চলে এলেন পাতালে। বেঁধে রাখলেন কপিল মুনির আশ্রমে।

এই ঘোড়াটা দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল সগরের সেই ষাট হাজার অত্যাচারী ছেলে। ঘোড়া নেই দেখে ওরা তো হুলস্থুল লাগিয়ে দিল। ষাট হাজার ছেলে মিলে তন্নতন্ন করে যজ্ঞের ঘোড়া খুঁজতে লাগল। শেষে পাতালে এসে, কপিল মুনির আশ্রমে ঘোড়াটিকে পাওয়া গেল। তখন ওরা কপিল মুনিকে চোর ভেবে, তার উপর শুরু করল অত্যাচার। আর যায় কোথায়, কপিল মুনি তাদের প্রতি এমন ক্রোধ বর্ষণ করলেন, তাতেই রাজা সগরের ষাট হাজার ছেলে ভস্ম হয়ে গেল, মানে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সে খবর আবার নারদ নিয়ে গেলেন রাজা সগরের কাছে। রাজা তো এ খবর শুনে ভীষণ কষ্ট পেলেন। কিন্তু আর তো কিছু করার নেই। শেষে তার নাতি অংশুমানকে পাঠালেন, যজ্ঞের ঘোড়াটাকে নিয়ে আসতে। পরে অংশুমান এসে, কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করলেন। কপিল মুনিও তখন যজ্ঞের ঘোড়াটা ফিরিয়ে দিলেন। তারপরেই রাজা সগরের শততম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হলো।

এভাবে চুরি না করেও কপিল মুনিকে চুরির দোষ বইতে হয় ঠিকই। পরে শোধ নিলেও, চোরের লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয় তাকে। মানুষের জীবনেও তাই ঘটে। দোষীর সংসর্গে থাকলে, দোষ না করেও দোষের দায়ভার নিতে হয়। অপরাধীর সাথে থাকলে, নিরপরাধ ব্যক্তিকেও অপরাধের দণ্ড দিতে হয়। তেমন ঘটনা ঘটলে, এই কাহিনি স্মরণ করে বলা হয়—চোরা গরুর সঙ্গে (বা গরু চুরির অপরাধে) কপিলার বন্ধন।

রক্তবীজের ঝাড়

অর্থ : যা সহজে নির্বংশ করা যায় না

রম্ভ ছিল দানবদের রাজা। তিনি মারা গেলে তার মৃতদেহ চিতায় শোয়ানো হলো। তার স্ত্রীও সহমরণে যাওয়ার জন্য চিতায় উঠল। কিন্তু চিতায় আগুন দিতে না দিতেই, রম্ভের স্ত্রীর পেট চিরে বেরিয়ে এল তাদের ছেলে মহিষাসুর। এই ছেলের প্রতি রম্ভের ভালোবাসা ছিল খুব। রম্ভ মহাদেব, তথা শিবের তপস্যা করে, তাকে খুশি করে ত্রিলোক-বিজয়ী এক ছেলের বর চেয়ে

www.pathagar.com

নিয়েছিল। সেই ছেলেই এই মহিষাসুর। এমন প্রিয় যে ছেলে, তাকে ফেলে আর রম্ভ যেতে পারল না। সে নিজ দেহ রূপান্তরিত করে, চিতা থেকে উঠে এল। ছেলে থেকে দেহ রূপান্তর করে হয়ে গেল মেয়ে-দানব। ছেলে থেকে মেয়েতে রূপান্তরিত এই রম্ভের নামই রক্তবীজ।

পরে রক্তবীজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি হয়। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ ছিল কশ্যপের দুই ছেলে। ওরা পাতালে বাস করত। একাসনে বসে এরা অযুত বছর ব্রহ্মার তপস্যা করেছিল। তখন ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের বর চাইতে বললেন। তারা অমরত্বের বর চাইলে, ব্রহ্মা সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, সেই বর দেয়া যাবে না। অন্য কোনো বর চাইতে হবে। দুই অহংকারী বীর দানব তখন বর চাইল—কোনো পুরুষ দেব-দানব-অসুর-পশু-পাখির হাতে যেন তাদের মৃত্যু না হয়।

বরলাভের পর তারা ফিরে এসে রাজত্ব শুরু করল। বড় ভাই শুম্ভ সিংহাসনে বসল। তারপর শুরু হলো ওদের অত্যাচার। এদের আবার ছোট আরেক ভাই ছিল। তার নাম নমুচি। এই তিন ভাই-ই ছিল ভীষণ অত্যাচারী। নমুচি একবার গেল স্বর্গ দখল করতে। তখন স্বর্গ বাঁচানোর জন্য ইন্দ্র ওকে হত্যা করল। সে খবর পেয়ে, ভাইয়ের হত্যার বদলা নিতে ওরা স্বর্গ আক্রমণ করল। তারপর স্বর্গ দখল করে ওরা দেবতাদের পৃথিবীতে তাড়িয়ে দিল।

পরে ওদের সাথে দেখা হলো আরেক দানব বীর রক্তবীজের। তার কাছ থেকেই তারা জানতে পারল, আরেক দানবরাজ, রক্তবীজের ছেলে মহিষাসুর মারা গেছে। বিন্ধ্যপর্বতে কৌশিকী দেবীর হাতে, মানে দেবী দুর্গার হাতে তার মৃত্যু হয়। তার দুই সেনাপতি প্রাণভয়ে পানিতে আশ্রয় নিয়েছে। তখন শুম্ভ-নিশুম্ভ কৌশিকীকে হত্যার উদ্দেশ্যে রক্তবীজ আর চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে হাত মেলাল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ধূম্রলোচনসহ আরো সব দানব-বীর।

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুম্ভ-নিশুম্ভ বিন্ধ্যপর্বতে এক দূত পাঠাল। সে গিয়ে কৌশিকী দেবীকে জানাল, শুম্ভ-নিশুম্ভ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। আর দেবীও ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। কাজেই তাদের ইচ্ছা, তাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে থেকে দেবী একজনকে বেছে নিক। তার সাথেই দেবীর বিয়ে হবে।

ওদিকে দেবীও শুম্ভ-নিশুম্ভকে দমনের কথা ভাবছিলেন। কারণ দানবরা স্বর্গ দখল করার সময় যুদ্ধে একে একে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের—সবাইকেই হারিয়ে দিয়েছিল। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে, বৃহস্পতির পরামর্শে দেবতারা দেবী ভগবতীর আরাধনা করতে শুরু করেছিল। তখন দেবী ওই কৌশিকী আর মহাকালীর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মূলত শুম্ভ-নিশুম্ভকে দমন করতেই। দানবদের দমন করার অংশ হিসেবেই তিনি মহিষাসুরকে মেরেছিলেন। কাজেই শুম্ভ-নিশুম্ভের এই দূত মারফত দেবীও পাল্টা উত্তর

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দিলেন, যে তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে, দেবী তাকেই বিয়ে করবেন।

দেবীর উত্তর পেয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ পত্রপাঠ ধূম্রলোচনকে পাঠিয়ে দিল, দেবীকে ধরে আনতে। কিন্তু দেবীর সাথে ধূম্রলোচন পেরে উঠল না। দেবীর হাতে তার মৃত্যু হলো। এরপর গেল চণ্ড-মুণ্ড। তারাও দেবীর হাতে প্রাণ খোয়াল। তখন গেল রক্তবীজ। সঙ্গে ত্রিশ কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য। এক অক্ষৌহিণী সেনাদলে থাকে দুই লাখ আঠার হাজার সাতশ জন সৈন্য।

অবশ্য এই বিশাল সেনাদলের সঙ্গে নয়, দেবীর মূল লড়াইটা হল দানব রক্তবীজের সঙ্গে। কারণ, এই রক্তবীজকে মারলে, তার শরীর থেকে যত ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে, ততগুলো নতুন রক্তবীজের উদয় হয়। ফলে দেবী কোনোভাবেই রক্তবীজকে কাবু করতে পারছিলেন না। ইন্দ্র যখন নিজের বজ্র দিয়ে রক্তবীজকে মারতে গেলেন, উল্টো শয়ে শয়ে রক্তবীজের উদয় হলো। শেষে কৌশিকীর রূপে থাকা দেবী দুর্গা রক্তবীজকে দমন করার জন্য মহাকালীর সাহায্য চাইলেন। তাকে বিশাল করে হাঁ করতে বললেন। যাতে, তিনি রক্তবীজকে আঘাত করলে যত রক্ত ঝরবে, সব কালী পান করে নিতে পারেন। যাতে এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে না পড়ে। ফলে আর কোনো নতুন রক্তবীজের উদ্ভব ঘটল না। এভাবে দেবীর হাতে রক্তবীজের মৃত্যু ঘটল। দেবী প্রথমে শুম্ভকে, পরে নিশুম্ভকেও হত্যা করে স্বর্গ দেবতাদের অধিকারে ফিরিয়ে দিলেন।

একই রকম ভাবে যদি, নানা উদ্যোগ নেয়ার পরও যদি মশার বংশ বাড়তেই থাকে, মশার অত্যাচার বাড়তেই থাকে, বা এই ঘটনা এ ধরনের ঘটনা অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটে, যেমন পঙ্গপালের আক্রমণ, কিংবা ইঁদুরের বন্যা, তখন সে ঘটনা বোঝাতে এই বাগধারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চণ্ডমূর্তি

অর্থ : উগ্রমূর্তি, মারমুখী, যুদ্ধংদেহী

চণ্ড এক দৈত্যের নাম। সেই দৈত্য বেশ বিখ্যাতও বটে। দৈত্য বা অসুরদের রাজা ছিল দুই ভাই—শুম্ভ আর নিশুম্ভ। চণ্ড ছিল শুম্ভের সেনাপতি। তার অনুচরদের মধ্যে সে-ই ছিল প্রধান। যুদ্ধে-ধ্বংসে তথা উগ্রমূর্তি ধারণে চণ্ডের বিশেষ 'সুনাম'ও ছিল। দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে বেশ পারদর্শিতাও দেখিয়েছিল। চণ্ডের ছোট ভাই মুণ্ড-ও অসুর-যোদ্ধাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল।

নমুচি হত্যার বদলা নিতে শুম্ভ-নিশুম্ভ স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয়। তাদের এই স্বর্গ দখলের সময় চণ্ড-মুণ্ড বিশেষ বীরত্ব

www.pathagar.com

দেখিয়েছিল। বিশেষ করে চণ্ড। পরে মহিষাসুর হত্যার বদলা নিতে শুম্ভ-নিশুম্ভের সাথে সাথে তারাও রক্তবীজের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তারপর ধূম্রলোচন কৌশিকী দেবীকে মারতে ব্যর্থ হলে, চণ্ড তার ভাই মুণ্ডকে নিয়ে দেবীর সঙ্গে লড়তে যায়। গিয়ে দেবীর হাতে প্রাণ হারায় দুজনেই। পরে নিহত হয় রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভ সবাই। চণ্ডকে বিনাশ করেন বলে পরে কৌশিকী, বা দেবী ভগবতীর আরেক নাম হয় 'চণ্ডী' বা 'চণ্ডীকা'। আর তার ভাই মুণ্ডকে বিনাশ করায় তার নাম হয় 'চামুণ্ডা'।

চণ্ডীর হাতে নিহত এই দৈত্য 'চণ্ড'র নাম থেকেই 'চণ্ডমূর্তি' বাগধারাটির জন্ম। কেউ যখন এই উগ্র-যুদ্ধংদেহী দৈত্য বা অসুর চণ্ডর মতো আচরণ করতে থাকে, মানে উগ্র-মারমুখী মূর্তি ধারণ করে, তখন বলা হয়—সে চণ্ডমূর্তি ধারণ করেছে।

বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়

অর্থ : উপার্জন না করলে যত সম্পদই থাকুক তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়

ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন সাত জন। তাদের অন্যতম পুলস্ত্য। তিনি জন্মেছিলেন ব্রহ্মার কান থেকে। এই পুলস্ত্যের ছেলে বিশ্রবা। এই বিশ্রবা চার দফায় বিয়ে করেন চারজনকে। প্রথম স্ত্রী ছিলেন বৃহস্পতির মেয়ে দেববর্ণিনী। দ্বিতীয় স্ত্রী মাল্যবান রাক্ষসের মেয়ে বলাকা। তৃতীয় স্ত্রী মাল্যবানেরই আরেক মেয়ে পুষ্পোৎকটা। আর চতুর্থ স্ত্রী মাল্যবানের ভাই, রাক্ষসরাজ সুমালী রাক্ষসের মেয়ে কৈকসী বা নিকষা।

কুবের ছিলেন তার প্রথম স্ত্রী দেববর্ণিনীর ছেলে। জন্মের সময় অবশ্য কুবেরের নাম ছিল বৈশ্রবণ। এই বৈশ্রবণ দেখতে ছিলেন ভীষণ কুৎসিত। তার পা তিনটা, কিন্তু দাঁত মাত্র আটটা। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। কুৎসিত চেহারার জন্যই তার নাম হয় 'কুবের'। কুৎসিত অর্থে 'কু', আর শরীর অর্থে 'বের'; দুয়ে মিলে 'কুবের'।

তখন সত্যযুগ চলছিল। একবার দেবতারা এই কুবেরের জন্য বরুণের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ করে কুবেরকে সমস্ত সাগরের অধিপতি করে দিলেন। তখন সাগর তার সমস্ত সম্পদ কুবেরকে দিয়ে দিল। কুবের হয়ে গেলেন অগাধ সম্পদের মালিক।

এরপর কুবের তার তপস্যা শুরু করলেন। প্রথমে জলে মাথা ডুবিয়ে এক হাজার বছর তপস্যা করলেন। আরেক পুরাণে আছে, তিনি এই এক হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন হিমালয়ে গিয়ে। তারপর পঞ্চাগ্নির মধ্যে এক পায়ে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করলেন আরো এক হাজার বছর। এই দুই হাজার বছরের তপস্যায় ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট হলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে তিনটি বর চাইতে বললেন। কুবের তিন বরে যথাক্রমে অমর, উত্তর দিকের দিকপাল ও ধনপতি হতে চাইলেন। ব্রহ্মাও তার বর পূরণ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা তাকে একটি পুষ্পক রথও প্রদান করলেন।

এভাবে কুবের ধনপতি হলেন। দেবতা না হলেও, তিনি দেবতার মর্যাদাও লাভ করলেন। তাই সকল ধনের পতি বা অধ্যক্ষ যেমন তিনি, তেমনি ধনের প্রদাতাও তিনি। মানে সবাইকে ধন দেনও তিনি। সহজ করে বললে, তিনিই ধনসম্পত্তির দেবতার কাজ করেন।

মানুষের মধ্যেও অনেকেরই অনেক ধনসম্পত্তি থাকে, বলা যেতে পারে কুবেরের কল্যাণেই। অনেকে সে সম্পদ উপার্জন করে, অনেকে আবার উত্তরাধিকারসূত্রেই পায়। কিন্তু সে সম্পদের পরিমাণ যতই হোক না কেন, বসে বসে খেলে সে সম্পদ ফুরিয়ে যাবেই। উপার্জন না করার খেসারত দিয়ে তাদের পথে বসতে হবে। সে কথা বোঝাতেই এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

যক্ষের চোখে ঘুম নাই

অর্থ : টাকা চুরির ভয়ে যার ঘুম হয় না

যক্ষ এক জাতের দেবযোনি বা উপদেবতা। এরা মূলত কুবেরের অনুচর বা ভৃত্য। এদের গায়ের রং কুচকুচে কালো, চোখের রং হলদে। মুখগুলো বিকৃত। এদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার হাতেই। কিন্তু সে সময় ব্রহ্মা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন। খিদায়, রাগে অন্ধকারের মধ্যেই ওদের বানাতে থাকেন। তাতেই যক্ষরা অমন বিদঘুটে হয়ে ওঠে। তাই নিয়ে ওরা বেশ এক চোট হইচই করেছিল।

এদের সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা পানি সৃষ্টি করেছিলেন। পরে এই অন্ধকারে বানানো জীবদের মধ্যে একদল বলতে থাকে—"যক্ষামঃ"। মানে, আমরা পূজা করব। এরাই হলো যক্ষ। আর আরেক দল বলতে থাকে—"রক্ষামঃ"। মানে, আমরা পানি রক্ষা করব। এরা হলো রাক্ষস।

এই যক্ষরা হিমালয়ের উপত্যকায়, কুবেরের রাজ্যে থাকে। তাদের সাথে সেখানে আরো থাকে গন্ধর্ব, কিন্নর আর বিদ্যাধররা। যক্ষরা কুবেরের ভৃত্য তো বটেই, মানুষেরও বন্ধুগোত্রীয়। অবশ্য তাদের তেমন কোনো গুণের কথা জানা যায় না। কুবেরের অনুগত ছাড়া তাদের কেবল একটা গুণের কথাই জানা যায়, তারা ভীষণ সৎ। তবে তাদের কোনো দোষও নেই।

www.pathagar.com

কাজের মধ্যে তারা কেবল কুবেরের ধনসম্পত্তি পাহারা দেয়। কুবের তো ধনাধিপতি। পৃথিবীর সমস্ত ধনের অধিপতি বা অধ্যক্ষ সে। আর যক্ষরা তার ভৃত্য। ভৃত্য হিসেবে তারা কুবেরের সমস্ত ধনসম্পত্তি পাহারা দেয়। দিনরাত পাহারা দেয়।

তেমনি কিছু লোক আছে, যারা টাকাপয়সা ধনসম্পত্তি আগলে বেড়ায়। দিনরাত টাকাপয়সা আর ধনসম্পত্তি পাহারা দেয়া নিয়েই তাদের যত ভাবনা। টাকার চিন্তায় তাদের রাতের ঘুমও হয় না। তাদের ভয়, রাতে ঘুমালে যদি চুরি হয়! এ ধরনের লোকদের ব্যঙ্গ করে বলা হয়, যক্ষের চোখে ঘুম নাই।

যক্ষের ধন

অর্থ : অত্যন্ত কৃপণ লোকের ধনসম্পদ

যক্ষের ধন বাগধারাটি সরাসরি পৌরাণিক যক্ষদের কাহিনি থেকে আসেনি। এসেছে অন্য একটি প্রাচীন রীতি থেকে। এবং সে রীতি প্রাচীনকালে কেবল ভীষণ কৃপণ কিন্তু বড়লোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

কৃপণ লোক বড়লোক হলেও, সে খুব বেশি খরচ করতে পারে না। উল্টো তার মধ্যে সব সময় ভয় থাকে, কে কখন তার টাকাপয়সা খরচ করে ফেলে। প্রাচীনকালে অমন বড়লোকদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর রীতি প্রচলিত ছিল। তারা টাকা-পয়সা নিরাপদে রাখার জন্য মাটির নিচে একটা ঘর বানাত। তাতে ঘড়া, মানে কলসি ভরে ভরে টাকা বা মোহর রাখত। তারপর সেখানে কোনো এক ছেলেকে নিয়ে গিয়ে, পূজা করে, বাহির থেকে সে ঘর একেবারে বন্ধ করে দিত।

বিশ্বাস করা হতো, এভাবে পূজা দিয়ে কোনো ছেলেকে টাকার ঘরে আটকে রেখে দিলে, সেই ছেলে মরে গিয়ে যক্ষ (বা যক) হয়ে যায়। তারপর সেই যক্ষ তার কলসি-কলসি টাকাপয়সা পাহারা দেবে। পূজা দেয়ার সময় সে টাকাপয়সার উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেয়া হতো। যার টাকা, সে মারা গেলে, যক্ষ তার কাছে রক্ষিত সমস্ত টাকাপয়সা উত্তরাধিকারীর হাতে দিলে, তবেই মুক্তি পেত।

এভাবে রক্ষিত ধনকে বলা হয় যক্ষের ধন। ব্যাপারটা পুরাণের যক্ষদের মতোই। তবে এই রীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, ওর ফলে কেবল টাকাপয়সা নিরাপদেই থাকত না, সে টাকাপয়সাগুলোর এক রকম কবর দেয়াই হয়ে যেত। সে টাকাপয়সার পরিমাণ যতই থাকুক, আর কোনো কাজেই আসত না। যত প্রয়োজনই হোক, আর যত বিপদই আসুক, এসব যক্ষের ধন যক্ষের

www.pathagar.com

কাছেই থাকতো, ওই সব কৃপণ বড়লোকরা তার কানাকড়িও ব্যবহার করতে পারত না।

আর তাই যে সব অতি কৃপণ লোক কিছুতেই টাকাপয়সা খরচ করে না, হাতের ফাঁক গলে একটা আধুলিও বের হয় না, তাদের টাকাপয়সাকে বলা হয় যক্ষের ধন।

যমের খাতায় তলব পড়া/নাম ওঠা
(যমের ডাক আসা, যমলোকের ডাক আসা)
অর্থ : মৃত্যুকাল আগতপ্রায়

সংজ্ঞা ছিলেন বিশ্বকর্মার মেয়ে। তার বিয়ে হয় সূর্যের সঙ্গে। সূর্য তো সব সময় প্রচণ্ড তেজে জ্বলছে। তাই সূর্যের কাছে গিয়ে, তার আলোর প্রচণ্ডতায় সংজ্ঞা চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। তাতে রেগে গিয়ে সূর্য অভিশাপ দিলেন, তার ছেলেও প্রজাদের সংযমের যম হবে। এই কথা শুনে সংজ্ঞা চটজলদি সূর্যের প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করলেন। তাই দেখে এবার খুশি হয়ে উঠলেন সূর্য। তখন আবার বললেন, তোমার কন্যা পরিণত হবে চঞ্চলা নদীরূপে। পরে সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার এক ছেলে আর এক মেয়ে হয়—যম আর যমী। তারা যমজ ভাই-বোন।

এদের মধ্যে যমী পরে যমুনা নদীর রূপ লাভ করেন। আর যম হন পরলোকের দেবতা। তার পুরীর নাম সংযমনী। এই সংযমনী বা যমলোক মনুষ্যলোক থেকে ৮১ হাজার যোজন দূরে অবস্থিত। সে পুরী দৈর্ঘ্যে ৪ হাজার যোজন, প্রস্থে ২ হাজার যোজন। চারপাশ সোনার তৈরি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সে পুরীতে নরক আছে ২৩টি। আর দরজা আছে ৪টি।

পুবের দরজাটি বহুমূল্য রত্নখচিত। সেখানে সর্বদা অপ্সরারা গান গাইছে। সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধপুরুষগণ। পশ্চিমের দরজাটিও রত্নখচিত। সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন শিবভক্ত ও পুণ্যাত্মারা। উত্তরের দরজাটি চামর-পাখা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। সে দরজা দিয়ে ঢোকেন বিভিন্ন উচ্চ বংশের মানুষ। আর দক্ষিণের দরজাটি ভীষণ ভয়ঙ্কর। সে দরজা পাপীদের জন্য।

মৃত্যুর পর মানুষ এই যমলোকে বা সংযমনীতে যায়। সেখানে সকল জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার হয়। যম নিজে এই বিচার করেন। আর সে কাজ তিনি করেন একেবারে পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে। তাকে এ কাজে সাহায্য করেন

www.pathagar.com

তার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্তের মূল কাজ সকল জীবের চিত্র-বিচিত্র পাপ-পুণ্যের হিসাব গুপ্তভাবে রাখা। তার ভিত্তিতেই যম বিচার করেন, কে স্বর্গে যাবে, আর কে নরকে যাবে।

যমের সম্পর্কে বেদে বলা আছে, তিনি সকলের কাছে পরিচিত। পুণ্যবান বা পাপী, মৃত্যুর পরে সকলের গন্তব্য পথই তিনি বলে দিবেন। তিনি সকল জীবকে ইহলোক থেকে পরলোকে যাওয়ার উপযুক্ত শরীর দান করবেন। আর সেটা তিনি দিবেন সকলের কার্যফল অনুসারে। সেই কার্যফল বিচার করবেন পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে।

অর্থাৎ মানুষকে নিয়ে যমের যা কাজ, সবই মৃত্যুর পরে। যমের দুই জন অনুচর আছে, নাম মহাচন্দ্র ও কালপুরুষ। এরা যমদূত নামে পরিচিত। এদের কাজই হলো মৃত আত্মাদের যমালয়ে, মানে সংযমনীতে নিয়ে আসা। চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম উঠলেই মহাচন্দ্র ও কালপুরুষ মানুষের আত্মাকে নিতে আসে। তারা আত্মা নিয়ে গেলে তবেই মানুষের মৃত্যু হয়।

আর তাই কারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে, মানে মৃত্যুসময় আগতপ্রায় হলে, বলা হয় যমের খাতায় তলব পড়েছে (বা যমের খাতায় নাম উঠেছে, বা যমের ডাক এসেছে, বা যমলোকের ডাক এসেছে)।

যমের দোসর

অর্থ : অতি ভয়ানক ব্যক্তি

পরলোকের দেবতা যমের বাবা সূর্য, মা সংজ্ঞা। তো সূর্য যে ভীষণ তেজে জ্বলে, সারা দিন অমনটা সহ্য করা তো ভীষণই কঠিন। সংজ্ঞাও পারছিলেন না। শেষে তিনি তার ছায়াকে স্বামীর কাছে রেখে চলে গেলেন। সংজ্ঞার ছায়াই তার স্বামী-সন্তানদের দেখাশুনা করত। মানে সূর্য, যম, আর তার যমজ বোন যমীর দেখাশুনা করত।

কিন্তু সংজ্ঞার ছায়া তার সন্তানদের ঠিকঠাক মতো যত্ন নিত না। হোক মায়ের ছায়া, তবু তো সে ওদের সৎ-মা। সৎ-মা কি আর আসল মায়ের জায়গা নিতে পারে! তাই একদিন রেগে গিয়ে যম সংজ্ঞার ছায়াকে লাথিই মেরে বসলেন। মা হয়েছে তো কী হয়েছে, সে তো তার কাজ ঠিকমতো করছে না। লাথি খেয়ে তার সৎ-মা ছায়া তাকে অভিশাপ দিল। সে অভিশাপে তার দুই পায়েই ক্ষত হলো। তাতে পুঁজ জমে, কীটেরা সেখানে জড়ো হয়ে তার পা খেতে শুরু করল।

www.pathagar.com

শেষে আর উপায় না দেখে যম বাবা সূর্যের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। সূর্য সব শুনে যমকে একটা কুকুর দিলেন। সেই কুকুর তার পায়ের ক্ষতের পুঁজ আর কীটগুলো চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে তার দুই পায়ের ক্ষতই ভালো হয়ে গেল। কিন্তু পায়ে আগের মতো শক্তি আর হলো না। অমন দুর্বল পা নিয়ে তো আর যম ঘুরে বেড়াতে পারতেন না। তখন বাধ্য হয়েই তিনি মহিষে চড়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন। তখন থেকেই তার বাহন মহিষ।

যেই যম ওই ছোট্টবেলাতেই দায়িত্বে অবহেলার জন্য সৎ-মাকে লাথি মেরে বসেন, তিনি যে বড় হয়েও খুব একটা সহজ বিচারক হবেন না, তা তো বোঝাই যায়। ন্যায়বিচারের ব্যাপারে তিনি ভয়ঙ্কর রকমের শক্ত। আর দেখতেও বেশ ভয়ঙ্কর। তার গায়ের রং সবুজ, পরনের জামার রং রক্তের মতো লাল। তার যে দুজন অনুচর, মহাচন্দ্র ও কালপুরুষ, তারাও দেখতে খুব একটা সুবিধার নয়। অবশ্য তাদের যে কাজ, তাতে তাদের দেখতে সুন্দর হওয়ারও কোনো মানে হয় না। তাদের কাজই হলো মৃত আত্মাদের যমালয়ে নিয়ে আসা।

যে দেবতা এমনি ভয়ঙ্কর, তার দোসর তো ভয়ঙ্কর হবেই। আর তাই যমের দোসর বলতে অতি ভয়ানক ব্যক্তিদেরই বোঝানো হয়। যেসব লোকদের সবাই ভয় করে, ভয়ে কেউ তাদের সামনে পড়তে চায় না, তেমন লোকদেরই বলা হয় যমের দোসর।

যমের অরুচি

অর্থ : যে সহজে মরে না

যম পরলোকের দেবতা। তিনি সবার মধ্যে শান্তি বা নিবৃত্তি আনেন বলে তার আরেক নাম শমন। তিনি সবার 'অন্ত' বা শেষ করেন বলে তার নাম কৃতান্ত বা অন্তক। পিতৃপুরুষদের উপর তার প্রাধান্য আছে। তাই তার নাম পিতৃপতি। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি স্বয়ং ধর্ম বা ধর্মরাজ। কারণ দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে পুণ্যবান। সবচেয়ে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারকও তিনি।

মাণ্ডব্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি একবার খেলতে খেলতে একটা পতঙ্গের দেহে একটা ঘাসের ডগা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। যমের বিচারে পার পায়নি এই ছোট্ট ঘটনাটিও। তাকে এজন্য সাজাও ভোগ করতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

একদিন এই মাণ্ডব্য মৌনব্রতের তপস্যা করছিলেন। সে সময় তাকে এক দল দস্যুর সঙ্গে, দস্যু সন্দেহে আটক করা হয়। বিচারের সময় মাণ্ডব্য কিছুই বললেন না। কারণ তিনি মৌনব্রত পালন করছিলেন। রাজা তাকেও দস্যুদলের সদস্য বলে ভেবে নিলেন। বাকি দস্যুদের সাথে তাকেও শূলে চড়ানো হলো। কিন্তু শূলে চড়ানোর পরও, তপস্যার গুণে মাণ্ডব্য বেঁচে রইলেন।

তখন রাজা তার ভুল বুঝতে পারলেন। মাণ্ডব্যকে শূল থেকে নামানো হলো। কিন্তু শূলের মাথার খানিকটা ভেঙে মাণ্ডব্যের শরীরে থেকে গেল। কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে মাণ্ডব্যকে বাকি জীবন পশ্চাদ্দেশে ওই শূলের ভাঙা অগ্রভাগ বা 'অণী' নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তখন থেকে তার নাম হয় অণীমাণ্ডব্য।

যম ছিলেন এমনি পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারক। অবশ্য যমের কাছে যাওয়াটাও খুব একটা ভালো কথা নয়। কেউ মারা গেলে তবেই তো যমের কাছে যাওয়া যায়। তাই যমের কাছে বা যমালয়ে যাওয়াটা রীতিমতো অভিশাপের মতোই শোনায়। এমনি অভিশাপ একবার উদ্দালক মুনি দিয়েছিলেন তার পুত্র নচিকেতাকে। সে অভিশাপে নচিকেতাকে সত্যিই যমলোকে যেতে হয়। তাতে অবশ্য নচিকেতার লাভই হয়। তিনি যমরাজকে সন্তুষ্ট করে, তার কাছ থেকে গোমাহাত্ম্য ও গোদান মাহাত্ম্য শুনে আসেন।

আরেক নচিকেতা ছিলেন বাজশ্রবা রাজার ছেলে। বাজশ্রবা একবার এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করে, তার সব ধন-সম্পদ নচিকেতাকে দিয়ে দেন। কিন্তু নচিকেতা তারপরও তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, "কাকে দান করলেন? আমাকে দান করলেন?" শেষে বিরক্ত হয়ে বাজশ্রবা তাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, "যমালয়ে যাও"। তখন নচিকেতা সত্যি সত্যিই যমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে টানা তিন রাত্রি ঠায় বসে থাকেন যমের সাথে দেখা করার জন্য। শেষে যম সন্তুষ্ট হন। তিনি বর দেন, নচিকেতা চাইলেই তার বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু নচিকেতা আরো বড় বর চাইলেন। তিনি আত্মা সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব জানতে চাইলেন। যম তাতেও রাজি হলেন। এভাবে যমের কাছ থেকে আত্মা সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব জেনে ফিরে আসেন নচিকেতা।

এমনি ছিলেন যম। পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারক। পুণ্যবান ও পাপী, সবারই চলার পথের পরম সহায় তিনি। তিনিও যখন কারও থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন, তখন এটা ধরে নেয়া যেতেই পারে, সে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর রকমের পাপী লোক। এই ভাবনা থেকেই, যেসব দুষ্টু বা খারাপ লোকের মৃত্যু সবাই কামনা করে,

www.pathagar.com

কিন্তু তারা তো মরেই না, উল্টো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে, তাদের ব্যঙ্গ করে বলা হয়, তারা যমেরও অরুচি।

চিত্রগুপ্তের খাতা

অর্থ : কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের খাতা

চিত্রগুপ্ত হলেন যমের কর্মচারী। ব্রহ্মার অঙ্গ থেকে তার জন্ম। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। সে সময় তার শরীর থেকে দোয়াত-কলমসহ চিত্রগুপ্তের জন্ম হয়। ব্রহ্মার কায়া থেকে জন্মেছিলেন বলে ব্রহ্মা নিজেই তাকে কায়স্থ হিসেবে অভিহিত করেন। সে হিসেবে তাকে বলা হয় আদি কায়স্থ।

জন্মের পর চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার কাজ কী হবে? তখন ব্রহ্মা যোগনিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। তারপর ছেলেকে বললেন, তার কাজ হবে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখা। আর সেজন্য তাকে যমালয়ে বাস করতে হবে। তারপর থেকেই চিত্রগুপ্ত যমালয়ে যমরাজের অধীনে থেকে মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব রাখছেন।

মানুষের পাপ-পুণ্যের চিত্র-বিচিত্র হিসাব গুপ্তভাবে রাখেন বলেই তার নাম চিত্রগুপ্ত। তিনি শুধু হিসাবই রাখেন না, মানুষের ললাটে বা ভাগ্যে ভবিষ্যতের কর্মের শুভ-অশুভ ফলাফল লেখার কাজটাও তিনিই করেন। কাজেই মানুষের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে, চিত্রগুপ্তের খাতার প্রসঙ্গ আসবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

জড়ভরত

অর্থ : অকর্মণ্য ব্যক্তি

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে অন্তত তিনজন ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সবচেয়ে বিখ্যাত ভরত হলেন রামের ভাই ভরত। ভরত কিন্তু রামের আপন ভাই না; রামের মা কৌশল্যা, ভরতের মা কৈকেয়ী। ওদের বাকি দুই ভাই লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-র মা সুমিত্রা।

আরেক ভরত হল শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ছেলে। ওর জন্ম হয় কণ্বমুনির আশ্রমে। এই ভরত একসময় পুরো ভারতবর্ষ নিজের শাসনাধীনে নিয়ে আনেন। ভারতবর্ষের নামকরণও তার নামানুসারেই করা হয়। কুরু-পাণ্ডবরাও এই ভরতেরই বংশধর।

তবে এদের কেউ-ই জড়ভরত নয়; জড়ভরত যে ভরত, সে হল ঋষভদেবের পুত্র। তিনি আবার ভীষণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। এই ভরত পরে রাজা

www.pathagar.com

হলেন। তারপর বিয়ে করলেন বিশ্বরূপের মেয়ে পঞ্চজনাকে। ভরত-পঞ্চজনার পাঁচ ছেলে হলো। তখন ভরত তার রাজ্য পাঁচভাগ করে, পাঁচ ছেলের দায়িত্বে দিয়ে, চলে গেলেন বনে; তপস্যা করতে।

ভরত তো বনবাস শুরু করলেন। একদিন দেখলেন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এক গর্ভবতী হরিণী গিয়েছিল জলপান করতে। কাছেই ছিল এক সিংহ। হরিণী পানি খাচ্ছে, ঠিক তখনই সিংহ ভীষণ হুংকার করল। হরিণী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে ছুটতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেল। সেখানেই ওর গর্ভপাত ঘটল। মারাও গেল। এই ঘটনা দেখে ভরতের ভীষণ মায়া হলো। তিনি তখন তপস্যা বাদ দিয়ে বাচ্চা-হরিণটার কথা ভাবতে শুরু করলেন। আহারে! বেচারা! পৃথিবীর আলো দেখার আগেই, একদম অকারণে মারা গেল। বাচ্চা-হরিণটার কথা ভাবতে ভাবতে ভরত নিজেই দেহত্যাগ করলেন। পরজন্মে জন্মালেন মৃগ, মানে হরিণ হয়েই। তারপর জন্মান্তরে আবির্ভূত হলেন ব্রাহ্মণকুমার হিসেবে। মানে এক ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে জন্মালেন।

এই জন্মে ভরত আবার ছিলেন জাতিস্মর। মানে তিনি পূর্বজন্মের সব কথা মনে করতে পারতেন। আর সারাক্ষণ ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যস্ত থাকতেন। তার আরাধনায় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য কারও সাথে কথাও বলতেন না। কারণ, পূর্বজন্মে যে এক হরিণী আর বাচ্চা হরিণের কথা ভাবতে গিয়ে তার তপস্যা ভেঙে গিয়েছিল, তাদের কথা ভাবতে গিয়ে তার আর তপস্যাই করা হয়নি, সেটা তার ভালোই মনে ছিল।

এই ব্রাহ্মণের ছেলে জাতিস্মর ভরত সারা দিন ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। কোনো মানুষের সঙ্গেও কথা বলতেন না, কোনো কায়িক শ্রমের কাজও করতেন না। সারা দিন জড় পদার্থের মতো বসে থাকতেন, আর ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। তাই মানুষজনও তাকে জড়ভরত বলে ডাকতে শুরু করে।

সেই জড়ভরতের কাহিনি থেকেই, যেসব লোকেরা নিতান্ত কোনো কাজ পারে না বা করে না, কাজে-কর্মে অপটু, জড়প্রায়, তাদেরকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় জড়ভরত।

ঠুঁটো জগন্নাথ/ সাক্ষীগোপাল

অর্থ : যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, নিষ্ক্রিয়

সাক্ষীগোপাল বাগধারাটি ঠিক পৌরাণিক কোনো গ্রন্থ থেকে আসেনি। এর উৎস লোকপুরাণ। একবার নাকি কয়েকজন বিপ্র, মানে তীর্থযাত্রী

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন পুরীতে, তীর্থ করতে। সেখানে গিয়ে এক বয়স্ক তীর্থযাত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পরলেন। তখন তার এক তরুণ সঙ্গী সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। খুশি হয়ে বুড়ো কী দিয়ে তার প্রতিদান দেবেন, তা আর ভেবে পান না। শেষে আনন্দের আতিশায্যে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, সেই তরুণের সঙ্গে তিনি তার মেয়ের বিয়ে দেবেন।

কিন্তু গ্রামে ফিরে এসে বুড়ো তার সেই প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। কিন্তু পুরীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে যে অভিশাপগ্রস্ত হতে হবে। তাই সে তরুণ নিজে থেকেই সেই বুড়োকে গিয়ে তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিলেন। বুড়োর তো আর সে কথা মনে পরে না। তাই শর্ত দিলেন, তুমি যদি সেই প্রতিজ্ঞার কোনো সাক্ষী এনে দিতে পার, অমনি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

তরুণ অনেক খুঁজে-পেতে একজন সাক্ষী জোগাড় করতে পারল। সেই সাক্ষী স্বয়ং জগন্নাথ, মানে কৃষ্ণ। তারই আরেক নাম গোপাল। তবে এই গোপাল ওরফে কৃষ্ণ ওরফে জগন্নাথ সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে একটা শর্তও জুড়ে দিলেন। তিনি তরুণের পিছু পিছু যাবেন, সাক্ষ্যও দেবেন, তবে যাত্রাপথে তরুণ পিছন ফিরে তাকাতে পারবে না। পিছন ফিরে তাকালে তিনি সেখানেই থেমে যাবেন, আর এক পাও এগোবেন না। কিন্তু তাহলে যদি জগন্নাথ মাঝপথে দাঁড়িয়ে যান, তরুণ বুঝবে কীভাবে? তারও সমাধান হলো। জগন্নাথ পায়ে নূপুর পরে যাবেন। কাজেই তরুণ যেতে যেতে পিছে না তাকালেও, নূপুরের শব্দ শুনেই বুঝতে পারবে, জগন্নাথও পিছন পিছন চলেছেন।

তারপর তারা যাত্রা শুরু করলেন। মাঝপথে জগন্নাথদেব ভাবলেন, তরুণকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। তরুণের বিশ্বাস পরীক্ষা করতে, তিনি কিছুক্ষণের জন্য নূপুর চেপে ধরলেন। আর তরুণও ভাবল, জগন্নাথদেব বুঝি আর আসছেন না, ফিরে গেলেন বুঝি। ভয় পেয়ে সে পিছন ফিরে চাইল। আর জগন্নাথ, মানে কৃষ্ণ, মানে গোপালও সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আর একটুও সামনে এগোলেন না। ছেলেটারও আর সাক্ষী জোগাড় করা হলো না।

গোপাল জানতেন, তিনি সাক্ষ্য না দিলে ন্যায়বিচার হবে না, তবু তিনি সাক্ষ্য দিতে এলেন না। তাই এমনিভাবে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিয়ে চুপচাপ থাকে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, তেমন লোকদেরই বলা হয় সাক্ষীগোপাল, বা ঠুঁটোজগন্নাথ।

www.pathagar.com

সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে

অর্থ : সতী নারীদের প্রশংসা করতে ব্যবহৃত হয়

একবার এক লোকের কুষ্ঠ হলো। সে লোকের কুষ্ঠ হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। সে নিয়মিত পতিতালয়ে যাতায়াত করত। এমনকি কুষ্ঠ হওয়ার পরও লোকটি সেই দোষ কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে তখন লক্ষহীরা নামের এক মেয়ের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করত। এই লক্ষহীরা যে পেশায় একজন পতিতা ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কুষ্ঠ হওয়ার পরও সে লক্ষহীরার কাছে যেতে চাইল। অথচ তখন তার নিজের হাঁটারও শক্তি নেই।

লোকটির স্ত্রী আবার ছিল ভীষণ পতিপ্রাণা। স্বামী বলতে অজ্ঞান। স্বামী ছাড়া সে কিছুই বুঝত না। সে স্বামীর এই আবদার শুনে, নিজে কাঁধে করে স্বামীকে নিয়ে গেল লক্ষহীরার কাছে। লক্ষহীরার বাড়ি পৌঁছানোর পর, ব্যাপার দেখে লক্ষহীরাই ক্ষেপে গেল। যে লোকের এমন পতিপ্রাণা স্ত্রী আছে, সে কিনা অমন স্ত্রীকে ছেড়ে তার কাছে সোহাগ পেতে আসে! লক্ষহীরা লোকটির সঙ্গে কোনো ভাব-ভালোবাসা তো করলই না, উল্টো তাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে বের করে দিল।

তখন সে লোকের চেতনা ফিরে এল। তার স্ত্রীকে বলল, চলো, বাড়ি ফিরে যাই। লোকটির স্ত্রীও আবার তাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর রওয়ানা হলো বাড়ির পথে।

তারা যে পথে ফিরছিল, সে পথের পাশেই এক ঋষি ধ্যান করছিলেন। ওরা যেভাবে আসছিল, সেভাবে পথ চলা তো আর সহজ নয়। অসাবধানে লোকটির গা ঋষির গায়ে লেগে গেল। তাতে ঋষির ধ্যান গেল ভেঙে। ক্ষেপে গিয়ে ঋষি অভিশাপ দিলেন, যে আমার ধ্যান ভাঙাল, সূর্য ওঠার সাথে সাথে তার মৃত্যু হবে।

এবার আর লোকটির স্ত্রী সইতে পারলেন না। একে তার অসুস্থ স্বামীর জন্য তিনি এত কষ্ট করছেন। সব বাদ দিয়ে স্বামীর সেবা-যত্ন করছেন। আর সেই স্বামী কিনা অমন তুচ্ছ একটা কারণে মারা যাবে। কুষ্ঠ রোগী স্বামীকে দিনরাত সেবা করলেন, তার অন্যায় আবদার নিজে পূরণ করলেন। তারপরও তাকে এভাবে বিধবা হতে হবে! তিনিও উল্টো বলে বসলেন, তিনি যদি সত্যিই সতী হন, তাহলে সূর্যই আর উঠবে না। তার স্বামীরও মৃত্যু হবে না।

www.pathagar.com

এবার তো সূর্যদেব ভীষণ বিপদে পড়ে গেলেন। সূর্য ওঠার সময় পেরিয়ে যায়, কিন্তু তিনি আর উঠতে পারেন না। কারণ সেই সতী নারীর বাক্য। লোকটির স্ত্রী আসলেই ছিলেন সতী। কাজেই, সূর্য আর উঠতে পারেন না। সকালও হয় না। সে নারীর স্বামীও মারা যায় না।

তার স্বামী না হয় বাঁচল। কিন্তু এদিকে যে সমগ্র সৃষ্টি রসাতলে যায়! সূর্য না উঠলে তো গোটা পৃথিবীই এলোমেলো হয়ে যায়। তখন পুরো সৃষ্টিজগতেই একটা হুলস্থুল বেধে গেল। শেষে দেবতারা সবাই মিলে এক জরুরি সভায় বসলেন। এদিকে ঋষির কথাও রাখতে হবে। ওদিকে সেই সতী নারী সন্তুষ্ট হয়ে তার কথা উঠিয়ে না নিলে, সূর্যও উঠতে পারছেন না। তখন তারা ঠিক করলেন, সূর্য উঠবে। আর ঋষির কথা মতো সূর্য ওঠার সাথে সাথে লোকটিও মারা যাবে। দেবতারাও তখুনি লোকটিকে আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। তাহলেই সে নারীকে বিধবা হতে হবে না।

লোকটির স্ত্রী এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। তখন সূর্য উঠল। ঋষির কথা মতো লোকটি মারা গেল। দেবতারা তখুনি আবার লোকটিকে বাঁচিয়ে তুললেন। আর সৃষ্টিজগৎও রক্ষা পেল।

এরকম যে নারী সতী, পতিপ্রাণা, স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে, তাদের প্রশংসা করতে বলা হয়, সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে।

রসাতলে যাওয়া
অর্থ : অধঃপাতে যাওয়া, নষ্ট হওয়া
সমার্থক বাগধারা : গোল্লায় যাওয়া

মাটির নিচের জগৎকে সাধারণভাবে পাতাল বলা হয়। তবে পাতাল পৃথিবীর নিচের জগতের একদম শেষের অংশ। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, পৃথিবীর নিচের এই অংশকে সাতটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। অর্থাৎ, পাতালের আগের অংশটাই রসাতল।

পৃথিবীর নিচের প্রথম অংশে, অতলে বাস করে ময় দানবের ছেলে বল। যমের সংযমনী রাজ্যও পাতালের এই অংশে অবস্থিত। বিতলে হাটকী নদী অবস্থিত। সুতলে বাস করে বলি। তলাতলে থাকে ময় দানব ও ত্রিপুরাধিপতি। মহাতলে থাকে কদ্রুর ছেলেরা। এই মহাতলের পরে, পাতালের আগের অংশটাই রসাতল।

অনেক পুরাণে বলা আছে, রসাতল নাকি থাকার জন্য বেশ আকর্ষণীয়। এমনকি স্বর্গ আর নাগলোকের চেয়েও ভালো। কিন্তু ওখানে আবার

www.pathagar.com

দেবতাদেরও থাকার অনুমতি নেই। এখানে নিবাতকবচ দৈত্যরা, সুরভি, অনন্ত নাগ, কালকেয় দানবরা, হিরণ্যপুরের দৈত্যরাসহ অনেক দৈত্য-দানবই থাকে।

তবে থাকার জন্য যত ভালোই হোক, মোদ্দা কথা হলো, রসাতল মাটি থেকে অনেক দূরে, অনেক নিচে। ওখান থেকে আরেকটু নিচে নামলেই একেবারে পাতালে গমন করাই হয়ে যায়। আর তাই কারও অধঃপাতে যাওয়া বোঝাতে, মানে কেউ অনেক নিচে নেমে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে বোঝাতে বলা হয়—ও একদম রসাতলে গেছে।

www.pathagar.com

ভিনদেশি পুরাণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফিনিক্সের মতো জেগে ওঠা
ইংরেজি : টু রাইজ লাইক এ ফিনিক্স ফ্রম দ্য অ্যাসেজ
অর্থ : ধ্বংসের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো

পৌরাণিক পশুপাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতগুলোর একটি এই ফিনিক্স পাখি। এই পাখির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মিশরীয়দের পুরাণে-আখ্যানে। পরে গ্রিক পুরাণেও এই পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে মিশরীয় ফিনিক্স পাখি আর গ্রিক ফিনিক্স পাখির বিশেষত্ব ভিন্ন। মিশরীয়দের কাছে এই ফিনিক্স পাখি ছিল সূর্যদেবের এক অবতার। আর গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স নবজীবন আর অমরত্বের প্রতীক। গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির এই তাৎপর্য থেকেই বাগধারাটির উৎপত্তি।

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, পৃথিবীতে ফিনিক্স পাখি আছে একটিই। সেই পাখিটি যতবারই মারা যায়, তার শরীরের পোড়া ছাই থেকে ততবারই পাখিটির জন্ম হয়। একেক বারে পাখিটার আয়ু হয় পাঁচশ থেকে এক হাজার বছর। মৃত্যুর সময় হলে, পাখিটা যেখানেই থাকুক, উড়ে উড়ে চলে যায় আরবদেশে। তারপর বিভিন্ন মসলাপাতি মিশিয়ে এক বিশাল ঘর বানায়। তারপর নিজের হাতে বানানো সেই ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তার বিশাল দুই পাখা ঝাপটে ঝাপটে সেই আগুনে বাতাস দিতে থাকে। বাতাস পেয়ে আগুনও দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আর পাখিটা গাইতে থাকে বিষাদের সুর।

তারপর এক সময় সেই আগুনে আত্মাহুতি দেয় ফিনিক্স। আগুনে ফিনিক্সের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু শেষ হয়ে যায় না পাখিটা। শরীরের পোড়া ছাই থেকে আবার তার পুনর্জন্ম ঘটে। ফিনিক্সের ছাই থেকে ফিনিক্স নতুন করে জন্ম নেয়। এভাবেই জন্ম থেকে জন্মান্তরে আবর্তিত হতে থাকে ফিনিক্স।

পোড়া দেহাবশেষ থেকে পুনর্জন্ম লাভের এই আখ্যান থেকেই এই ইংরেজি বাগধারাটির জন্ম। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসার ঘটনাকে

www.pathagar.com

বর্ণনা করতে এই বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। কেউ একজন বা অনেকজন যখন ব্যর্থতা-হতাশার চূড়ান্ত পর্যায় থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্যের পথে এগোতে থাকে, তখন বলা হয়, সে যেন ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছে। বাংলাতেও অনেক লেখকই তাদের লেখালেখিতে ইংরেজি এই বাগধারাটি প্রয়োগ করে থাকেন।

প্যান্ডোরার বাক্স খোলা
ইংরেজি : ওপেন দ্য প্যান্ডোরা বক্স
অর্থ : এমন কিছু করা, যার মাধ্যমে অনেকগুলো অপ্রত্যাশিত নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়

এপিমিথিউস ও প্রমিথিউস—দুই ভাই। এই টাইটান দুই ভাই বিখ্যাত তাদের মানুষের প্রতি দরদের জন্য। তাদের এই দরদের জন্যই তারা অলিম্পাসের দেবরাজ জিউসকে রাগিয়ে তুলেছিলেন। এপিমিথিউস মানুষকে নানা ভালো ভালো স্বর্গীয় প্রবণতা প্রদান করেছিলেন। আর প্রমিথিউস অ্যাপোলোর অগ্নিরথ থেকে আগুন চুরি করে এনে দিয়েছিলেন মানুষকে। ফলে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে নেয়। আর দ্রুত উন্নতিও করতে থাকে। এসব মিলিয়ে জিউস তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন।

এই শাস্তির অংশ হিসেবেই বানানো হলো প্যান্ডোরাকে। গ্রিক পুরাণ মতে, প্যান্ডোরা পৃথিবীর প্রথম নারী। প্যান্ডোরাকে বানানোর দায়িত্ব দেয়া হলো দেবকারিগর হেফেস্টাসকে। হেফেস্টাস মাটি দিয়ে এক অনন্য নারীমূর্তি গড়লেন। সেই নারীমূর্তি গড়ার জন্য তিনি মডেল হিসেবে বেছে নিলেন তার স্ত্রী আফ্রোদিতিকে। এরপর সেই নারীমূর্তিকে সকল দেবতা একটু একটু করে তাদের সেরা গুণগুলো দিলেন। আফ্রোদিতি প্যান্ডোরাকে দিলেন তার সৌন্দর্য-লাবণ্য-আকাঙ্ক্ষার খানিকটা। হার্মিস দিলেন চাতুর্য-দৃঢ়তা। অ্যাপোলো শেখালেন সঙ্গীত। এমনি করে সবাই মিলে প্যান্ডোরাকে গড়ে তুললেন। সবশেষে জিউসের স্ত্রী হেরা দিলেন কৌতূহল। এরপর সেই অনন্যা-মূর্তি প্যান্ডোরাকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হলো এপিমিথিউসের কাছে।

প্রমিথিউস আবার দূরদর্শী হিসেবে বেশ বিখ্যাত ছিলেন। এই দূরদর্শিতার জন্য এমনকি অলিম্পাসের দেবতারাও তাকে সম্মান করতেন, তার বুদ্ধি-পরামর্শ নিতেন। কিন্তু এইবার এপিমিথিউস তার ভাইয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। কারণ, প্যান্ডোরাকে দেখেই তিনি তার প্রেমে পড়ে গেলেন। তাই প্রমিথিউসের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি প্যান্ডোরাকে ঘরে তুললেন।

www.pathagar.com

তারপর তাকে বিয়ে করাও মনস্থ করলেন। আর দেবতারাও এই বিয়েরই অপেক্ষায় ছিলেন।

এপিমিথিউস-প্যান্ডোরার বিয়েতে দেবরাজ জিউস তাদেরকে একটা অপূর্ব বাক্স উপহার দিলেন। অবশ্য বাক্সটা খুলতেও তিনি নিষেধ করে দিলেন। বাক্সটা খুলতে পইপই করে মানা করলেন প্রমিথিউসও। কিন্তু প্যান্ডোরা সেই নিষেধ মানতে পারলেন না। কারণ, হেরার দেয়া 'কৌতূহল'। বিয়েতে পাওয়া এই অসাধারণ বাক্সটার ভেতরে কী আছে, সেই কৌতূহল নিবারণ করতে ব্যর্থ হলেন প্যান্ডোরা। প্রবল আগ্রহে বাক্সটা খোলার সাথে সাথে ভেতরে থাকা রোগ-জরা-হিংসা-দ্বেষ-লোভ-লালসা বেরিয়ে এসে, ছড়িয়ে পরল পৃথিবীময়। প্যান্ডোরা অবশ্য দ্রুতই বাক্সটা বন্ধ করে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে বাক্স থেকে প্রায় সবই বেরিয়ে গেছে। ভেতরে থেকে গেল শুধু আশা।

গ্রিক পুরাণের এই জনপ্রিয় আখ্যান থেকেই পরে ইংরেজিতে এই বাগধারাটির প্রচলন হয়। বাগধারাটি বাংলা মুখের ভাষায় খুব একটা প্রচলিত না হলেও, অনেক লেখকই তাদের লেখায় এই বাগধারাটি ব্যবহার করেছেন।

অ্যাকিলিস হিল/অ্যাকিলিসের গোড়ালি
ইংরেজি : অ্যাকিলিস হিল
অর্থ : দুর্বলতা/ দুর্বল স্থান

গ্রিক পুরাণে আইন-শৃঙ্খলা-বিচারের ভার ছিল থেমিসের ওপর। তবে থেমিস টাইটান হওয়ায়, দেবীর মর্যাদা পাননি। কিন্তু সব সময়ই জিউসের ধারেকাছেই থাকতেন। এই থেমিসের পরামর্শেই জিউস রাজা পেলেউসের সঙ্গে সাগরপরী থেটিসের বিয়ে দেন। আবার, অনেক রচনায় পাওয়া যায়, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রমিথিউস জিউসকে জানিয়েছিলেন, থেটিস এমন এক সন্তানের জন্ম দেবে, যে জ্ঞানে-গুণে তার বাবাকেও ছাড়িয়ে যাবে। তখন জিউস প্রতিদ্বন্দ্বী সাগরদেবতা পসাইডনের সঙ্গে বিরোধ ভুলে রাজা পেলেউসের সঙ্গে থেটিসের বিয়ে দেন। এই পেলেউস-থেটিসের ঘরেই জন্ম নেন মহাবীর অ্যাকিলিস।

অ্যাকিলিসের জন্মের সময় ভাগ্যদেবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, অ্যাকিলিস হয় নিরুপদ্রব খ্যাতিহীন দীর্ঘ জীবনযাপন করবে, অথবা ট্রয় যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। থেটিস দ্বিতীয় সম্ভাবনার ভয়ে রীতিমতো ভীত হয়ে পরেন। ছেলেকে নিয়তির হাত থেকে বাঁচাতে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেননি তিনি। নিয়তি বদলানোর প্রথম চেষ্টা হিসেবে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে ছুটে যান স্টিক্স নদীতে।

www.pathagar.com

এই স্টিক্স নদী স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা পবিত্র নদী। এই নদী এমনকি দেবতাদের কাছেও পবিত্র। এই নদীর জল শরীরের যেখানে যেখানে লাগে, সে জায়গাগুলোতে কোনো ব্যথা-জরা স্পর্শ করতে পারে না। থেটিস ছেলের সম্পূর্ণ শরীর এই নদীতে ডুবিয়ে নেন। ফলে অ্যাকিলিসের শরীরেও ব্যথা-জরা স্পর্শ করতে পারে না। একমাত্র ব্যতিক্রম, অ্যাকিলিসের গোড়ালি। কারণ, পানিতে ডুবানোর সময়, থেটিস অ্যাকিলিসের গোড়ালি ধরে রেখেছিলেন। তাই গোড়ালির পিছন দিকটায় স্টিক্সের পানি স্পর্শ করতে পারেনি। সেটিই ছিল অ্যাকিলিসের একমাত্র দুর্বলতা।

আর তার এই একমাত্র দুর্বলতা দিয়েই মৃত্যু অ্যাকিলিসকে আলিঙ্গন করে। সেটা জগদ্বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের ঘটনা। ভাগ্যদেবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, সেই যুদ্ধে অ্যাকিলিসের বীরের মৃত্যু বরণ করার কথা। তাই অ্যাকিলিস যাতে সেই যুদ্ধে জেতে না পারে, তার সব চেষ্টাই থেটিস করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। অ্যাকিলিস বীরত্বের মোহেই সেই যুদ্ধে যোগ দেন। সে যুদ্ধে অ্যাকিলিস অসাধারণ বীরত্বও প্রদর্শন করেন। ইতিহাসের পাতায় তার নাম অমর হয়ে যায়। তিনি ট্রয়ের সেরা বীর হেক্টরকে মুখোমুখি লড়াইয়ে পরাস্ত করেন। তারপর মৃত হেক্টরকে রথের পিছে বেঁধে ট্রয়ময় উন্মত্তের মতো ছুটে বেড়ান।

গ্রিস ও ট্রয়ের এই যুদ্ধের কারণ ছিল ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত। আফ্রোদিতি প্যারিসকে বর দিয়েছিলেন, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনের সঙ্গে তার প্রেম করিয়ে দেবেন। আফ্রোদিতি তার কথা রাখেন। এই হেলেন ছিলেন গ্রিকদের অন্যতম প্রধান রাজ্য স্পার্টার রাজা মেনেলাউসের স্ত্রী। প্যারিস স্পার্টায় গিয়ে, মেনেলাউসের আতিথ্য গ্রহণ করে, মেনেলাউসের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম তো করেনই, পরে মেনেলাউসের অবর্তমানে হেলেনকে নিয়ে পালিয়েও আসেন। এই ঘটনার পটপরিক্রমাতেই গ্রিস ও ট্রয়ের মধ্যে বিখ্যাত ও ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে গ্রিকদের জয় হয় ঠিকই। কিন্তু জয়ের প্রাক্কালে মারা যান অ্যাকিলিস। মারা যান ওই প্যারিসের হাতেই। যুদ্ধবিদ্যায় তেমন পারদর্শী না হলেও, প্যারিস ধনুর্বিদ্যা ভালোই জানতেন। তার ছোঁড়া একটা বিষমাখা-তীর এসে লাগে অ্যাকিলিসের ঠিক গোড়ালিতে, তার শরীরের যে জায়গাটায় স্টিক্স নদীর পানি লাগেনি।

এভাবে প্রায় পুরো শরীর ব্যথা-জরা-রোধী হলেও, একটুখানি অংশের দুর্বলতা দিয়েই মৃত্যু অ্যাকিলিসের দেহে প্রবেশ করে। গ্রিক পুরাণের এই ঘটনা থেকেই পরে ইংরেজিসহ ইউরোপের অনেকগুলো ভাষাতে এই বাগধারাটির প্রচলন হয়। বাংলায় লেখকদের রচনাতেও বাগধারাটি দুর্লক্ষ্য নয়।

www.pathagar.com

কিউপিডের তীর
ইংরেজি : কিউপিড'স ডার্ট
অর্থ : প্রেমে পড়া

কিউপিড রোমান পুরাণের কামদেবতা। তার মা প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস। গ্রিক পুরাণে কিউপিডের মতো যে দেবতা, তার নাম এরস। এই এরস কেবল গ্রিক পুরাণের প্রেম ও কামের দেবতাই নন, প্রাচীনতম দেবতাদের একজনও বটেন। তার বাবা রণদেবতা অ্যারেস, মা প্রেমের দেবী আফ্রোদিতি। সম্ভবত আফ্রোদিতির অনুকরণেই, রোমান পুরাণে ভেনাসকে কিউপিডের মা হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

প্রথম দিকে অবশ্য দেবতা হিসেবে কিউপিড তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। মূলত রোমান লেখক-কবিদের আগ্রহেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। রোমান মহাকবি ভার্জিল তার 'ঈনিড' মহাকাব্যে কিউপিডকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেন। মহাকাব্যটিতে ঈনিয়াস ও দিদোর প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে কিউপিড বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে অ্যাপোলিয়াস তার 'গোল্ডেন অ্যাস' কাব্যে কিউপিড-সাইকির প্রেমকাহিনিটিকে নতুন করে আলোয় নিয়ে আসেন।

পরে কিউপিড পশ্চিমের ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক চরিত্র হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে কাহিনিটা দেব-মানবের প্রেমের হওয়ায়, রেনেসাঁর সময়ের শিল্পী-সাহিত্যিকরা বারবার এই প্রেমকাহিনির প্রতি ফিরে তাকিয়েছেন। আর সাধারণ প্রেমের প্রসঙ্গে কিউপিডের অনুষঙ্গ তো এখনও ঘুরে-ফিরে আসেই। তেমনই একটি অনুষঙ্গ বলা যেতে পারে এই বাগধারাটিকে।

কিউপিডের পিঠে পরীদের মতো দুটি পাখা আছে। আর আছে তীর-ধনুক। তার এই ধনুক দিয়ে তীর মেরেই তিনি মানুষকে প্রেমে ফেলেন, আবার প্রেম নষ্টও করেন। তার তূণে দুই ধরনের তীর থাকে। সোনা-রাঙা তীরটি প্রেম-কামের তীর। ওটা মারলে মানুষ প্রেমে পরে। আর রুপালি রঙের তীরটি ঘৃণা ও বিকর্ষণের তীর। ওটা মারলে প্রেম চলে যায়।

এই তীরের ব্যবহার প্রথমে 'ঈনিড'-এ ঈনিয়াস-দিদোর প্রেমে ব্যবহৃত হলেও, জনপ্রিয় হয় অ্যাপোলিয়াসের 'গোল্ডেন অ্যাস' দিয়ে। সেখানে সাইকির প্রেমে ফেলার জন্য কিউপিড যে তীর ছোঁড়ে, সেটা তার নিজের গায়েই এসে বিঁধে। আর এই আখ্যানটির জনপ্রিয়তা কিউপিডের তীর ছুঁড়ে মানুষকে

www.pathagar.com

আচমকা প্রেমে ফেলার ধারণাটিকেও জনপ্রিয় করে তোলে। তারই ফলাফল এই বাগধারাটি। এমনকি বাংলাতেও, বিশেষ করে কবিতায় ও রোম্যান্সমূলক আখ্যানে এই বাগধারাটির ব্যবহার দেখা যায়।

কুকুর-বিড়াল বৃষ্টি
ইংরেজি : রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস
অর্থ : আকাশ ভেঙে বৃষ্টি, প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি

ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাগধারাগুলোর একটি এটি। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তো বটেই। আমাদের দেশে রচনা লিখতে গিয়ে এই বাগধারাটি ব্যবহার করেনি, এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই বাগধারাটি ঠিক ইংল্যান্ড বা ব্রিটেনের আদি অধিবাসী ব্রিটনদের পুরাণ থেকে আসেনি। এসেছে নর্ডিক পুরাণ থেকে। এই নর্ডিকরা মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর আদি অধিবাসী। স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলতে মূলত বর্তমানের ডেনমার্ক, নরওয়ে আর সুইডেনকে বোঝানো হয়ে থাকে। এদের ভাষার সাথেও ইংরেজির খুব একটা ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। তাদের ভাষা ছিল ওল্ড নর্স। এটি মূলত নর্থ জার্মানিক একটা ভাষা।

এই নর্ডিক পুরাণের সবচেয়ে বড় দেবতার নাম উদান। জার্মান ভাষায় এই উদানকে বলা হয় ওটান, ইংরেজিতে ওডেন। আর এই ওডেনের দিন, মানে 'ওডেনস ডে' থেকেই বুধবারের ইংরেজি নাম হয়েছে 'ওয়েডনেস ডে'। তো এই উদান নর্ডিক পুরাণের সকল দেবতাদের দেবতা। নর্ডিক পুরাণে যুদ্ধ ও মৃত্যুর দায়িত্ব দেয়া আছে তার হাতে। জ্ঞান এবং কাব্যেরও দেবতা সে। জাদুবিদ্যাতেও সে বিশেষভাবে পারঙ্গম। উদানের ঘোড়ার নাম স্লেইপনির। ওর আটটা পা। তো এই উদানের সব ছবিতেই দেখা যায়, তার আশেপাশে কুকুর থাকেই। থাকবেই। আর উদান কেবল যুদ্ধ-মৃত্যু আর জ্ঞান-কাব্যেরই দেখাশুনা করে না, বাতাসও তার কথাতেই চলে-ফেরে। মানে কোথায় কখন ঝড়ো বাতাস বইবে, কেমন ঝড়ো বাতাস বইবে, সেসব উদানই ঠিক করে দেয়।

আবার নর্ডিক পুরাণ অনুযায়ী, ঝড়-তুফানের সঙ্গে ডাইনিদেরও যোগ আছে। ঝড়-তুফান বাড়লে ডাইনিরাও তাদের জাদুর ঝাড়ুতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। নর্ডিক পুরাণে ডাইনিদের নাম 'ভোলভা'। এই ভোলভাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান আবার ফ্রেইয়া। সে মূলত সৌন্দর্য, ভালোবাসা আর মনোহরণের দেবী। তবে যুদ্ধ, মৃত্যু আর সম্পত্তির ব্যাপারেও তার

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষমতা আছে। জাদুর ব্যাপারেও সে উদানের মতোই পারদর্শী। ভবিষ্যদ্বাণীতেও সে বেশ ভালো।

এই ফ্রেইয়া আবার বিড়াল খুব ভালোবাসে। ওর ছবিতে সব সময়ই বিড়াল থাকে। ফ্রেইয়া যেই রথে চড়ে স্বর্গে যাওয়া-আসা করে, সেই রথটা চালায়-ই দুটো বিড়াল। ওদের নাম বাইগুল আর ট্রাইগুল। ফ্রেইয়া কীভাবে বিড়ালগুলোকে পেল, তারও একটা গল্প আছে। একদিন সকালবেলা। ফ্রেইয়া তখনো ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ভীষণ বজ্রপাতের শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে দেখে, টরের (ইংরেজিতে 'থর') ছাগলে-টানা রথ যাচ্ছে ওর বাড়ির সামনে দিয়ে। তাতে শব্দ তো হবেই। টর নিজেই যে বজ্রের দেবতা। ও তখন টরকে যাচ্ছে-তাই বলে বকা দিতে লাগলো। টর বেচারা যাচ্ছিল মাছ ধরতে। ও কোনোমতে ফ্রেইয়াকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাছ ধরতে চলে গেল।

টর তো মাছ ধরতে বসেছে। মাছ-ধরা বললে কী হবে, আসলে ধরতে বসেছে পানির ড্রাগন। হঠাৎ কারা যেন হাউকাউ করে উঠল। তারপরই একটা সুরেলা গান ভেসে এল। এত মিষ্টি, সুমধুর, শুনতে শুনতে টর ঘুমিয়েই পরল। একটু পর আবার সেই হাউকাউ। ঘুম ভেঙে গেল টরের। ধড়মড়িয়ে উঠল সে। বিরক্তও হলো ভীষণ। এমন সুন্দর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। রেগেমেগে গিয়ে দেখে, বিড়াল। দুটো বাচ্চা বিড়াল হাউকাউ করছে। আর একটা বড় বিড়াল তাদের গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। বড় বিড়ালটা নাকি ওদের বাবা। কিন্তু ওদের মা নেই। তাতেই যত গোলমাল।

ওদিকে টর ভাবল, এগুলো তো ফ্রেইয়ার জন্য ভালো উপহার হতে পারে। তাহলে সকালের গোলমালটাও মিটে যায়। শুনে বাবা বিড়াল বেশ ভারিক্কি চালে বলল, এই ছানা দুটো কিন্তু সাধারণ বিড়াল নয়। ওদেরকে নিলে কোনো ভালো বাসাতেই নিতে হবে। শুনে টর গেল খেপে। যেই বাবা বিড়ালটাকে ধরতে যাবে, বাবা বিড়ালটা পাখি হয়ে উড়ে চলে গেল। তখন টর আর কী করে, বিড়ালছানা দুটোকে ওর রথে চড়িয়ে নিয়ে এসে, ফ্রেইয়াকে দিয়ে গেল। আর ফ্রেইয়াও বিড়াল দুটোকে এত পছন্দ করল, ওদেরকে ওর রথের চালক বানিয়ে নিল।

তো এই রকম নর্ডিক পুরাণে কুকুরের সাথে যোগ আছে ঝড়ো বাতাসের, আর বিড়ালের সাথে ঝড়-তুফানের। আর তাই যখন আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, সঙ্গে ঝড়-তুফান আর ঝড়ো হাওয়া মিলিয়ে মনে হয় এই বুঝি আকাশ ভেঙে পরল, তখন ইংরেজরা একজন আরেকজনকে বলে, 'ইট'স রেইনিং ক্যাটস এন্ড ডগস'।

www.pathagar.com

অবশ্য এই বাগধারাটা ইংরেজিতে আগে থেকেই এমন জনপ্রিয় ছিল, তা নয়। ১৭৩৮ সালে জোনাথন সুইফটের 'কমপ্লিট কালেকশন অফ জেন্টল অ্যান্ড ইনজিনিয়াস কনভার্সেশন' প্রকাশিত হয়। ব্রিটেনের উপরতলার মানুষেরা যে সব কৃত্রিম আর খটোমটো ইংরেজিতে কথা বলে, বইটিতে জোনাথন সুইফট সেগুলো একত্র করেছিলেন। তার লেখার উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল উপরতলার মানুষদের এই অদ্ভুত ইংরেজি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। আর তাতেই তিনি এই বাগধারাটি সংকলন করেন। সেখান থেকেই পরে বাগধারাটি উল্টো আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অকম্পন- ৫৩
অক্ষয় তূণ- ১৫১
অগস্ত্য মুনি- ৩৭-৩৮, ১৮৩-৮৫
অগ্নি- ৬৩, ১০২, ১৭৮-৮০
অগ্নিবেশ্য, মুনি- ১০২
অঘ- ১২৮, ১৩০
অঙ্গ- ১৫১
অঙ্গদ- ৪৮
অঙ্গারপর্ণ- ১০৭
অঙ্গিরা- ১৭৯-৮০
অজ- ২৪, ১৭৬
অঞ্জনা- ৫২
অঞ্জলিক বাণ- ১০৬
অজ্ঞাতবাস- ৮৫, ৮৯, ৯০, ৯২, ১০৮, ১১৪
অণীমাণ্ডব্য- ৯৪, ১৯৮
অতল- ২০৩
অদিতি- ১৪৯
অধর্ম- ১৭৭
অধিরথ- ৯৫
অনরণ্য- ৩৬, ৫৮, ১৭৬
অনবরথ- ১১৮
অনল- ৭৭
অনমিত্র- ১১৮
অন্ধক- ১৭০
অনন্ত নাগ- ২০৪
অনু- ১১৭
অনুরথ- ১১৮
অনুহ্লাদ- ১৫০
অন্নপূর্ণা- ১৬৯-৭০
অনিল- ৭৭
অন্তক- ১৯৭
অম্বরীষ- ৩৩
অজদেব- ১৩৮
অবতার- ১০৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৩৩, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৭৬, ১৭৭
অভিমন্যু- ৯৩, ১০৩, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১৭৭
অভেদ্যবিদ্যকবচ- ১০৮
অমাবস্যা- ১৩৯
অম্বা- ৭৯, ৯৮-৯৯
অম্বালিকা- ৭৬, ৭৯, ৮০, ৯৩, ৯৮
অম্বিকা- ৭৬, ৭৯, ৮০, ৯৩, ৯৮
অমৃত- ৩৩, ৫৮, ১৩৬-৩৮, ১৪০-৪১, ১৫১, ১৮৬
অযোধ্যা- ২৩, ২৭-২৯, ৩১-৩২, ৩৬, ৪৫, ৫৪, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১, ১৪৫, ১৪৮
অরিষ্ট- ১২৮, ১৩০
অরিষ্ঠা- ১৪৯
অরুণ- ১৮৬, ১৮৭
অর্জুন- ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২-৯৩, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৭-১১, ১১৩
অর্ধচন্দ্র বাণ- ৫২
অলকা (নগরী)- ৩৬, ৫৭
অশনা- ১৫০, ১৫১
অশ্ব- ১৪১
অশ্বত্থামা- ৯৭, ১০২-০৪, ১১০, ১৭৭
অশ্বত্থামা (হাতি)- ১০৪
অশ্বপতি- ১৬১

www.pathagar.com

অশ্বমেধযজ্ঞ- ২৪, ১৫২, ১৭৭, ১৮২-৮৩, ১৮৮-৮৯
অশ্বিনী- ৮১
অষ্টবসু- ৭৭
অসিতদেবল- ১০২
অস্তি- ১১৯, ১২৮
অহল্যা- ২৭
অংশ- ১১৮
অংশুমান- ১৮৯

আইহন ঘোষ- ১২৪, ১২৫
আশুতোষ- ১৫৯
আসুরব্রত- ৯৬

ইক্ষ্বাকু বংশ- ২৬, ১৪৮, ১৮৮
ইন্দ্র- ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৬৭, ৭১, ৮১, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১০২, ১০৩, ১০৫-০৭, ১০৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৫১, ১৬০, ১৬৪, ১৭৬, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০
ইন্দ্রজিত- ৪৮
ইন্দ্রপ্রস্থ- ৮৪, ৮৮
ইন্দ্রবর্মা- ১০৪
ইরাবান- ১০৭
ইল্বল- ১৮৪
ইলা- ১৪৯

উগ্রচণ্ডা- ৪২
উগ্রসেন- ১১৯, ১২৭, ১২৮, ১৭৭
উচ্চৈঃশ্রবা- ১০২
উজ্জ্বালক- ১৪৮
উতঙ্ক, মহর্ষি- ১৪৮
উত্তম- ১৪৬, ১৪৭
উত্তর- ৯২-৯৩
উত্তরা- ৯২, ১৭৭
উত্তানপাদ- ১৪৬-৪৭
উদ্দালক, মুনি- ১৯৮
উর্বশী- ৯২, ১০৮
উলূপী- ১০৭
উশনা- ১১৮

ঊর্মিলা- ২৬, ৩০, ৩১

ঋক্ষরজা- ৪০
ঋচীক- ২৬, ১৫৪
ঋত্বিক- ১৮২
ঋষভদেব- ১৯৯

একাগ্নী শক্তি- ৯৬
একলব্য- ১০৩

ঐন্দ্রাস্ত্র- ৫২

ককুৎস্থ - ১৭৬
কঙ্ক- ৯০, ৯২-৯৩
কণ্ব, মুনি- ১৯৯
কদ্রু- ১৮৬, ২০৩
কপর্দী- ১৫৯
কপিল, মুনি- ১৮৮-৮৯
কয়াধু- ১৫০
করম্ভি- ১১৮
কর্ণ- ৮৬, ৮৯, ৯৫-৯৬, ১০৫, ১১০, ১১২
কলি- ১৭৭-৭৯
কলিযুগ- ৩৪, ১৬৭, ১৭৬-৭৭, ১৭৯
কলিঙ্গ- ১৫১
কল্কি, অবতার- ১৩৩, ১৭৭, ১৭৯
কশ্যপ- ১০২, ১০৮, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৪, ১৬৯, ১৮৬-৮৮, ১৯০
কংস- ১০৮, ১১৮-২৩, ১২৭-৩০, ১৭৭
কামদেব- ১৩৩
কার্তবীর্য- ৩৬, ৫৭, ১৭৬
কালকা- ১০৮
কালকূট- ১৪১
কালকেয়, দানব (১)- ৩৭, ৪৬
কালকেয়, দানব (২)- ১০৮, ১৮৪, ২০৪
কালনেমি- ৫৫-৫৬
কালপুরুষ- ৭০-৭১, ১৯৫, ১৯৭
কালভৈরব- ১৬৭-৬৮
কালী- ৬৭, ১৬৪
কালীয় নাগ- ১০৯

www.pathagar.com

কার্তবীর্য- ১৫৪
কার্তবীর্যার্জুন- ১১৮
কার্তিক- ১৬৬
কাশ- ১৬৬
কাশী- ১৬৬-৬৮
কাশীরাজ (১)- ৭৯, ১৬৬
কাশীরাজ (২)- ১৩৮
কাষ্ঠা- ১৪৯
কিমিন্দম, মুনি- ৮১
কিষ্কিন্ধ্যা- ৪০, ৫৩
কীচক- ৯০-৯২
কুকুর- ১১৮
কুন্তিভোজ- ৮০
কুন্তি- ১১৮
কুন্তী- ৮০, ৮৪, ৮৭, ৯৫, ১০৫, ১০৭, ১১২
কুবলাশ্ব- ১৪৮-৪৯
কুবের- ৩৫, ৩৬, ৪৩, ৫৭, ৬১, ৯৯, ১০৭, ১৯০, ১৯২-৯৪
কুম্ভকর্ণ- ৪৩, ৪৪, ৪৮-৫২, ৫৭, ১৪২-৪৩
কুরু- ৯৭
কুরুক্ষেত্র- ৭৫, ৮২, ৮৫, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৮, ১১১, ১১২
কুরুবৎস- ১১৮
কুরুবংশ- ৭৫, ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৯৩, ১০৫
কুশ- ২৪, ৬৪, ৬৫, ৭১
কুশধ্বজ- ২৬-২৭, ৩০, ৩১, ৩৬
কূর্ম, অবতার- ১৩৩, ১৭৬
কৃতবর্মা- ৯৭, ১১০
কৃতান্ত- ১৯৭
কৃপাচার্য- ৯৭, ১১০
কৃষ্ণ- ৮৭, ৮৮, ৯৫-৯৭, ১০১-০৩, ১০৭-১০, ১১২, ১১৮-২১, ১২৩-৩০, ১৪২, ১৭৭, ২০১
কৃষ্ণ-বলরাম, অবতার- ১৩৩, ১৭৭
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস)- ৭৫, ৭৬, ৮০, ৯৩, ১৬৮
কৃপী- ১০২
কেতু- ১৩৯-৪০, ১৮০
কেতুমতী- ১০৪
কেতুমান- ১৬৬
কেশিনী- ১৮৮
কৈকেয়ী- ২৪-২৫, ২৮-৩১, ৬৯, ১৯৯
কৈলাস, পর্বত- ৩৬, ৫৮, ১৫৮
কৈকসী- ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৫৯, ১৯২
কৌমোদকী গদা- ১৩৩
কৌরব- ৭৫, ৮২, ৮৫, ৮৮, ৯১, ৯৩-৯৭, ১০০, ১০৩-০৫, ১০৯, ১১২, ১৯৯
কৌমার্য ব্রত- ৭৯, ৯৮
কৌশিকী- ১৯০-৯২
কৌস্তুভ- ১৪১
কৌস্তভ মনি- ১৩৩
কৌশল্যা- ২৪-২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৭০, ১৯৯
ক্রথ- ১১৮
ক্রোধবশা- ১৪৯
ক্রোধ- ১৭৭
ক্ষত্রধর্মা- ১০৩
ক্ষীরোদ সাগর- ১৩৬-৩৭, ১৪১

খর- ৩০
খাণ্ডবপ্রস্থ- ৮৪
খ্যাতি- ১৪১, ১৪৩

গঙ্গা, দেবী- ৩৬, ৭৭, ৯৯, ১৬৯
গঙ্গা (নদী)- ৩২, ৮৪, ৯১, ৯৯
গজকচ্ছপ- ১৮৫-৮৭
গণেশ- ১৬৮-৬৯, ১৮১
গন্ধমাদন- ৫৪, ৫৫
গন্ধর্ব- ১৫৩
গরুড়- ৪৮, ১৩৩, ১৮৬, ১৮৮
গরুড়, অস্ত্র- ৪৮
গয়- ৩৬, ৫৮
গাধি- ৩৬, ৫৮
গান্ধারী- ৮১, ১১২, ১১৩
গায়ত্রী- ১৬১
গোকুল- ১২০, ১২২-২৫

www.pathagar.com

গোপালক নন্দ- ১১৯-২০, ১২৩, ১২৮
গোপাল- ২০১
গ্রন্থিক- ৯০, ৯২

চণ্ড- ১৯০-৯২
চণ্ডী, চণ্ডীকা- ১৯২
চন্দ্র- ১৩৮, ১৮০
চন্দ্রগ্রহণ- ১৩৯
চন্দ্রবংশ- ৪২, ৯৭, ১১৭, ১৬৬, ১৭৭
চন্দ্রভাগা- ১৪২
চন্দ্রহাস খড়্গ- ৫৮
চাক্ষুষীবিদ্যা- ১০৭
চামুণ্ডা- ১৯২
চিত্রগুপ্ত- ১৯৫, ১৯৯
চিত্ররথ (১)- ১১৮
চিত্ররথ (২)- ১১৮
চিত্ররথ (৩)- ১৮০
চিত্রসেন (১)- ৮২, ৮৯
চিত্রসেন (২)- ৯২, ১০৮
চিত্রাঙ্গদ- ৭৫, ৭৯
চিত্রাঙ্গদা- ১০৭
চিন্তা- ১৪৫-৪৬
চির অম্লান মালা- ১৫১
চিরকুমার ব্রত- ১৮৩

ছায়া- ১৩৯, ১৪৪, ১৮০, ১৯৬
ছিন্নমস্তা- ৬৭, ১৬৪

জগন্নাথ- ২০১
জটায়ু- ৪৬
জতুগৃহ- ৮৩-৮৪, ৯৪, ৯৬
জনমেজয়- ১৭৭
জমদগ্নি- ১৫৩
জম্বুমালী- ৫৩
জরাসন্ধ- ১১৯, ১২৮, ১৭৭
জয়ন্ত- ৪৮
জয়কুণি- ১১৮
জয়দ্রথ- ১১০
জাতিস্মর- ২০০
জীমূত- ১১৮
জ্যামঘ- ১১৮

ডমরু- ১৫৮, ১৬০

তন্ত্রিপাল- ৯০, ৯২
তমসা (নদী)- ২৪, ৬৩, ৬৮
তমঃ- ১১৮
তলাতল- ২০৩
তাণ্ডব- ১৫৮, ১৬০
তাম্রা- ১৪৯
তারা (১)- ৪১
তারা (২)- ৬৭, ১৬৪
তারকা, দৈত্য- ১৬৫-৬৬
তাড়কা, রাক্ষসী- ২৯, ৩৭-৩৮
তিমি- ১৪৯
তুর্বসু- ১১৭
ত্রিকূট (পর্বত)- ৩৫, ৪৩, ৬০
ত্রিপুরাধিপতি- ২০৩
ত্রিপুরারি- ১৫৯
ত্রিলোচন- ১৫৯
ত্রিশঙ্কু- ১৭৬
ত্রিশিরা- ৫৩
ত্রিশূল- ৩৪, ১৫৮, ১৬৭, ১৭০
ত্রেতাযুগ- ৩৪, ৪২, ১৭৬

দই- ১৪১
দক্ষ- ৬৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ১৪৯, ১৬৫
দণ্ড- ১৭৫
দণ্ডকারণ্য- ২৯-৩১, ৩৭, ৩৮, ৪৫, ৬৬, ৬৫
দণ্ডধর- ১১০
দনু- ১৩৮, ১৪৯
দময়ন্তী- ১৭৮
দম্ভ- ১৭৭
দশরথ (১)- ২৪-২৫, ২৭-২৯, ৩১, ৩৮, ৪৫, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ১৭৬
দশরথ (২)- ১১৮
দশা- ১৪০, ১৪৫, ১৮১
দশার্হ- ১১৮

www.pathagar.com

দিতি- ১৪৯
দিবোদাস- ১৬৬-৬৭
দিব্য কবচ- ১৫১
দিব্য কিরীট- ১০৮
দিব্য শঙ্খ- ১৫১
দিব্যবস্ত্র-আভরণ- ১০৮
দিব্যরথ- ১৫১
দিরুক্তি- ১৭৭
দিলীপ- ২৪
দীর্ঘতপা- ১৬৬
দুন্দুভি- ৪০
দুর্জটি- ১৫৯
দুর্বাসা, মুনি- ৭০-৭১, ৮১, ৯৫, ১০৮, ১৩৭, ১৪১, ১৪৩
দুর্যোধন- ৮২-৮৫, ৮৮-৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৬, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১৭৭
দুষ্মন্ত- ৫৮, ১৩৭, ১৯৯
দুঃশলা- ৮২
দুঃশাসন- ৮২, ৮৮, ৮৯
দ্যু- ৭৭
দ্যুমৎসেন- ১৬১-৬৩
দূর্গা- ৪২-৪৩, ১৩৬, ১৫১, ১৬৮, ১৯০-৯১
দূষণ- ৩০
দৃঢ়স্যু- ১৮৪
দেবক- ১১৯, ১২৮
দেবকী- ১১৯-২১, ১২৩, ১২৮, ১২৯
দেবক্ষত্র- ১১৮
দেবদত্ত শঙ্খ- ১০৮
দেববর্ণিনী- ১৯২
দেবব্রত- ৭৮-৭৯
দেবযানী- ১১৭
দেবযোনি- ১৭০, ১৯৩
দেবরাত (১)- ২৬
দেবরাত (২)- ১১৮
দেবান্তক- ৫৩
দৈব দিন- ১৩৪, ১৬০, ১৭৬
দৈব বছর- ১৩৪, ১৬০, ১৭৬
দ্রুপদ- ৮৬-৮৭, ৯৮, ১০২-০৩
দ্রুহ্য- ১১৭
দ্রোণ- ৮৬, ১০০, ১০২-১০৫, ১০৭, ১১০, ১১৪
দ্রৌপদী- ৮৪-৮৯, ৯২, ১০৭, ১১৩
দ্বাপর- ১৭৮
দ্বাপরযুগ- ৩৪, ১৩৮, ১৭৬, ১৭৭

ধনুযজ্ঞ- ১২৮, ১৩০
ধন্ব- ১৩৮
ধন্বন্তরি- ১৩৭-৩৮, ১৬৬
ধর- ৭৭
ধরিত্রী- ১৩৬
ধর্ম- ৮১, ৯০, ৯৪, ১১২, ১১৩
ধর্মঠাকুর- ১৭১
ধর্মরাজ- ১৯৭
ধুন্ধু- ১৪৮-৪৯
ধুন্ধুমার- ১৪৮-৪৯
ধূমাবতী- ৬৭, ১৬৪
ধূম্রবর্ণ (সাপ)- ১১৮
ধূম্রলোচন- ১৯০-৯২
ধূম্রাক্ষ- ৫৩
ধৃতরাষ্ট্র- ৭৫-৮০, ৮৩, ৮৯, ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১১৩
ধৃষ্টকেতু- ১০৩
ধৃষ্টদ্যুম্ন- ৮৬-৮৭, ১০৪, ১০৫
ধ্রুব (১)- ৭৭
ধ্রুব (২)- ১৪৬-৪৮
ধ্রুবতারা- ১৪৮
ধ্রুবলোক- ১৪৭

নকুল- ৮১, ৮৩, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৭, ১০৬, ১১০
নচিকেতা- ১৯৮
নটরাজ- ১৫৯
নন্দক- ১৩৩
নন্দী- ৩৬, ৫৮, ১৬৪-৬৫, ১৭০
নবরথ- ১১৮
নমুচি- ১৯০, ১৯১
নরক- ১১৪, ১৯৫
নল (১)- ৪৭
নল (২)- ১৭৮

www.pathagar.com

নলকূবর- ৩৬
নাগপাশ (অস্ত্র)- ৪৭-৪৮
নারদ- ২৩, ৫৮, ৮০, ৮৪, ৮৮, ৯৮, ১০২, ১৪৭, ১৬১, ১৮৪, ১৮৮
নারায়ণ- ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৩৩-৩৫, ১৪৭, ১৮৪
নারায়ণী সৈন্যবাহিনী- ৯৫, ১০৯
নিকষা- ৪৩, ৪৪, ১৯২
নিকুম্ভ (১)- ৫৪
নিকুম্ভ (২)- ১৬৭
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ- ৭০
নিবাতকবচ- ১০৮, ২০৪
নিবৃতি- ১৭৭
নির্বৃতি- ১১৮
নিশুম্ভ- ১১১, ১৯০-৯২
নীলকণ্ঠ- ১৪১, ১৫৮
নৃসিংহ, অবতার- ১৩৩, ১৫০, ১৭৬

পঞ্চজন- ১০৯
পঞ্চজনা- ২০০
পঞ্চপাণ্ডব- ৮০-৮৪, ৮৬, ৯৫, ১০২, ১১২
পদ্ম- ১৩৩, ১৩৫, ১৪১
পদ্মা- ১২৩, ১২৫
পরশুরাম- ৭৮-৮০, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১৩৩, ১৫৩-৫৪, ১৭৬
পরাবৃৎ- ১১৮
পরাশর, মুনি- ৭৫-৭৬
পরীক্ষিৎ- ১১৩, ১৭৭
পল- ১৭৫
পশুপতি- ১৫৯
পাঞ্চাল- ৮৬, ১০২
পাঞ্চজন্য শঙ্খ- ১৩৩
পাণ্ডব- ৭৫, ৮২, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯১-৯৫, ৯৭, ১০১, ১০৩-০৫, ১০৭, ১০৯, ১১২, ১৯৯
পাণ্ডু- ৭৫, ৮০, ৮৩, ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১১২
পাতাল- ২০৩, ২০৪
পারিজাত- ১৪১
পার্বতী- ১৬৫-৬৯, ১৮১
পাশুপত অস্ত্র- ১০৭, ১৫৮
পিতৃপতি- ১৯৭
পিনাক- ১৫৮
পিনাকী- ১৫৯
পুণ্ড্র- ১৫১
পুতনা, রাক্ষসী- ১০৯, ১২২-২৩, ১২৮, ১৩০
পুত্রেষ্টিযজ্ঞ- ২৫
পুরু- ১১৭-১৮
পুরুকুৎসু- ৩৩
পুরুহোত্র- ১১৮
পুরূরবা- ৩৬, ৫৮, ১৭৬
পুলস্ত্য- ১৯২
পুলোমা- ১০৮
পুষ্পক রথ- ১৯৩
পুষ্পোৎকটা- ১৯২
পূর্ণিমা- ১৩৯
পূষণ- ১৬৪
পৃথু- ১৩৬
পৃথুযশা- ১১৮
পৃথুশ্রবা- ১১৮
পৃষত- ১০২-০৩
পৃষ্ণি- ১১৮
পৌলোম, রাক্ষস- ১০৮
প্রজাপতি- ৬৭, ১৩৬, ১৩৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৮২
প্রতিবিন্ধ্য- ৮৯
প্রত্যূষ- ৭৭
প্রব্রজ্যা ব্রত- ৮১
প্রভাস- ৭৭
প্রমীলা- ৪৮
প্রসূতি- ১৬৫
প্রস্বাপন অস্ত্র- ৮০
প্রহ্লাদ- ১৪৯-৫২
প্রাণ- ১৭৫
প্রাতিকামী- ৮৮
প্রাপ্তি- ১১৯, ১২৮

বক- ১২৮, ১৩০
বকাসুর- ১২২
বগলামুখী- ৬৭, ১৬৪

www.pathagar.com

বঙ্গ- ১৫১
বনবাস- ২৯-৩২, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৫৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯২, ১০৭, ১৪৬
বভ্রুবাহন- ১০৭, ১৭৭
বর- ২৫, ২৮-২৯, ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৭-৫০, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ১০০-১০২, ১০৮, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৭৮, ১৮৮, ১৯০, ১৯৩, ১৯৮
বরাহ, অবতার- ১৩৩, ১৪৯, ১৭৬
বরুণ- ৩৭, ৪৭-৪৮, ১০৭, ১৭৮, ১৮৩, ১৯২
বশিষ্ঠ, মুনি- ৭১, ৭৭
বসু (১)-৭৫, ৭৮
বসু (২)- ১৫৩
বসুদেব- ১১৮, ১১৯-২৩, ১২৮, ১২৯
বসুমতী- ৬৪-৬৬
বল- ২০৩
বলরাম- ১১৯, ১২৮-২৯
বলাকা- ১৯২
বলি- ১৩৬, ১৫০-৫৩, ১৭৬, ২০৩
বল্লভ- ৯০-৯২
বড়ায়ি- ১২৪
বংশকৃতি- ১১৮
বাজশ্রবা- ১৯৮
বাণ- ১৫১
বাণপ্রস্থ তপস্যা- ১১৮
বাতাপি- ১৮৪
বামন, অবতার- ১৩৩, ১৫২, ১৭৬
বালি- ৩৬, ৪০-৪১, ৫৩, ৫৭
বালী- ১২২
বালখিল্য, মুনি- ১৮৬-৮৮
বাল্মীকি- ২৩-২৪, ৬৩-৬৬, ৬৮
বায়ব্যাস্ত্র- ৫২
বায়ু- ৫২, ৫৩, ৮১, ১৯০
বাসুকী- ৯১, ১৩৭, ১৪০
বাহু- ১৮৮
বাহুক- ১৭৬
বিকর্ণ- ৮২, ৮৯
বিচিত্রবীর্য- ৭৫, ৭৯, ৮০, ৯৩, ৯৮
বিতল- ২০৩
বিতস্তা- ১৪২
বিদর্ভরাজ- ১৮৩
বিদুর- ৮৪, ৮৮, ৯৩-৯৫
বিদুরথ- ১১৮
বিদ্যুজ্জিহ্ব- ৩৭, ৪৪, ৪৬
বিনতা- ১৮৬, ১৮৭
বিনায়ক- ১৭০
বিন্দুমতী- ৩৩
বিন্ধ্যপর্বত- ১৮৪-৮৫, ১৯০
বিন্ধ্যাবলি- ১৫০, ১৫২
বিপল- ১৭৫
বিপাশা- ১৪২
বিপ্রচিত্তি- ১৩৮
বিভাবসু- ১৮৫-৮৬
বিভীষণ- ৩৫, ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৯-৫১, ৫৭, ৬০
বিরাট, রাজা- ৯০, ৯২, ১০৩, ১৭৭
বিরাট, রাজ্য- ৯০, ৯২
বিরুপাক্ষ- ১৫৯
বিরোচন- ১৫০
বির্ভ- ১১৮
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ- ১৫১
বিশ্রবা, মুনি- ৩৪-৩৫, ৪৩, ৪৪, ৫৯
বিশ্বকর্মা- ২৫, ৩৪, ৪৭, ৫৯, ১৯৫
বিশ্বামিত্র, মুনি- ২৭, ২৯, ৩৮
বিশ্বরূপ- ২০০
বিশ্বাবসু- ১৫৩
বিশ্রবা- ১৯২
বিষাণ- ১৬০
বিষ্কসেন- ১৭৭
বিষ্ণু- ২৫-২৬, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৫৯, ১০৮, ১১৯, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৩-৪১, ১৪৩, ১৪৭-৫৩, ১৫৭, ১৬০, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯
বীরভদ্র- ১৬৪-৬৫, ১৭০
বুদ্ধ, অবতার- ১৩৩, ১৭৭
বুধ- ১৩৯, ১৮০
বৃজিনীবান- ১১৮

www.pathagar.com

বৃত্রাসুর- ১৮৪
বৃন্দা, বৃন্দে- ১২৪-২৬
বৃন্দাবন- ১২২
বৃষকেতু- ৯৬
বৃষ্ণি (১)- ১১৮
বৃষ্ণি (২)- ১১৮
বৃহৎকর্ম- ১৫৩
বৃহৎক্ষেত্র- ১০৩
বৃহদশ্ব- ১৪৮
বৃহদ্ভানু- ১৫৩
বৃহন্নলা- ৯০, ৯২-৯৩
বৃহস্পতি- ১৩৯, ১৫১, ১৭৯-৮০, ১৯০, ১৯২
বৃহস্পতি যজ্ঞ- ৬৭, ১৬৪
বেণ- ১৭৬
বেণুহয়- ১১৮
বেদব্যাস- ৭৬
বৈকুণ্ঠ- ১৩৩
বৈবস্বত, মনু-১৭৬
বৈশ্রবণ- ১৯২
বৈশ্বানর- ১০৮
বৈষ্ণবযজ্ঞ- ৯৬
ব্যোমা- ১১৮
ব্রহ্মশির অস্ত্র- ১০৭, ১৭৭
ব্রহ্মা- ২৪, ২৬, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৮-৫০, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৬৭, ৭৬, ১১৯, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৪২-৪৩, ১৪৭-৫১, ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮৬, ১৯২, ১৯৩, ১৯৯
ব্রহ্মাস্ত্র- ১৪৯
ব্যাসদেব (ব্যাস)- ৭৫-৭৬, ৮০, ৮৮, ৯৩, ১০২, ১১২, ১৬৮

ভগদত্ত- ১১০
ভগবতী- ১৬৮, ১৯০, ১৯২
ভরত (১)- ২৫, ২৮-৩১, ৪৫, ৬৯, ৭০, ১৯৯
ভরত (২)- ১৯৯
ভরত (৩)- ১৯৯-২০০
ভদ্রকালী- ৪২
ভরদ্বাজ (১)- ২৩
ভরদ্বাজ (২)- ১০২, ১৩৮
ভয়- ১৭৭
ভীম- ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৯-৯২, ৯৫, ৯৭, ১০৪, ১১০, ১১৩
ভীমরথ (১)- ১১৮
ভীমরথ (২)- ১৬৬
ভীষ্ম- ৭৭-৮০, ৯৮, ১০১-০৫, ১১০, ১১২
ভুবনেশ্বরী- ৬৭, ১৬৪
ভূত- ১৭০-৭১
ভূমি- ১৬৯
ভূষণ্ডি, কাক- ১১০-১১
ভৃঙ্গি- ৫৮, ১৬৪-৬৫, ১৭০
ভৃগু, প্রজাপতি- ২৬, ১৪১, ১৪৩, ১৬৪
ভৈরব- ১৫৯
ভৈরবী- ৬৭, ১৬৪
ভোজ- ১১৮

মঙ্গল (১)- ১৬৯
মঙ্গল (২)- ১৩৯, ১৮০
মতঙ্গ, মুনি- ৪১, ৫৩
মৎস্য, অবতার- ১৩৩, ১৭৬
মৎস্যগন্ধা- ৭৫-৭৬
মৎস্যরাজ- ৯০
মথুরা- ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩০
মদন- ১৬৫-৬৭
মধু- ৩৪, ১১৮
মধুকৈটভ- ১৪৮
মনু- ১৭৬
মন্বন্তর- ১৭৬
মন্থরা, দাসী- ২৮, ৩১, ৪৫
মন্দর (পর্বত)- ৪৭
মন্দার (পর্বত)- ১৩৭, ১৪০
মন্দোদরী- ৫৬-৫৭
মরুত্ত- ৩৬, ৫৮, ১৭৬
ময়- ৫৯, ২০৩
ময়ূরধ্বজ- ১৭৭

www.pathagar.com

মহাকাল- ১৫৯
মহাকালী- ১৯০-৯১
মহাচন্দ্র- ১৯৫, ১৯৭
মহাতল- ২০৩
মহাদেব- ৬৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৮৯
মহামায়া- ১১৯, ১২৮, ১২৯
মহাযজ্ঞ- ১৫৪, ১৮৭
মহালক্ষ্মী- ৬৭, ১৬৪
মহাহয়- ১১৮
মহিষাসুর- ৪২, ১৮৯, ১৯০, ১৯২
মহেন্দ্র (পর্বত)- ১০২, ১৫৪
মাণ্ডবী- ২৬-২৭, ৩১
মাণ্ডব্য- ৯৪, ১৯৭-৯৮
মাতঙ্গী- ৬৭, ১৬৪
মাদ্রী- ৮০, ১০৫
মানবীয় বছর- ১৩৪, ১৬০, ১৭৫
মান্ধাতা- ৩২-৩৪, ১৭৬
মারীচ- ৩১-৩২, ১০৮
মালতী- ১৬১
মালী- ৩৪-৩৫, ৪৩, ৫৯
মাল্যবান- ৩৪-৩৫, ৪৩, ৫৯, ১৯২
মায়া- ১৭৭
মায়াবিদ্যা- ৩৮
মায়াবী- ৪০-৪১
মিত্রাবরুণ- ৪৭
মিথিলা- ২৬-২৭, ২৯, ৩১, ৬৪, ৬৬
মিথ্যা- ১৭৭
মুচুকুন্দ- ৩৩
মুণ্ড- ১৯০-৯২
মুনি- ১৪৯
মুহূর্ত- ১৭৫
মৃগয়া- ২৫, ৮১, ১৪৬, ১৪৭
মৃত্যু- ১৭৭
মেঘনাদ- ৪৮, ৭০
মেনকা- ৬৭, ১৬৫-৬৭

যক্ষ- ৩৫, ৩৭, ৫৭, ৯৯, ১৯৩-৯৪
যজমান- ১৮১
যজ্ঞদেব- ১৫১
যদু- ১১৭-১৮
যদুবংশ- ১১৩, ১১৭-১৯, ১২৭, ১২৯
যম- ৩৬, ৫৮, ৭০-৭১, ১০৭, ১৬২-৬৩, ১৭৮, ১৯৫-৯৯, ২০৩
যমদূত- ১৯৫
যমলোক- ১৯৫, ১৯৮, ১৯৯
যমালয়- ১৯৯
যমী- ১৯৫, ১৯৬
যমুনা- ৭৮, ১২২, ১৯৫
যযাতি- ১১৭
যশোদা- ১২০-২৩, ১২৮
যাজক- ১৮২
যাদবী- ১৮৮
যুধাজিৎ- ১১৮
যুধিষ্ঠির- ৮১, ৮৩-৮৫, ৮৭-৯০, ৯২-৯৩, ৯৫, ৯৭, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১২-১৪, ১৭৭
যুবনাশ্ব- ৩২-৩৩
যুযুৎসু- ১১৩
যুযুধান- ১১৮
যোগমায়া- ১২০, ১৪৯

রক্তবীজ- ১৯০-৯১
রঘু- ২৪, ১৭৬
রঘুবংশ- ২৪
রত্নাকর- ২৩
রবি- ১৩৯, ১৮০
রম্ভ- ৪২, ১৮৯-৯০
রম্ভা- ৩৬, ১৪১
রসাতল- ১৫২, ২০৩-০৪
রসায়ন- ৯১
রাজচক্রবর্তী- ১৮২
রাজ-রাজেশ্বরী- ৬৭, ১৬৪
রাজসূয় যজ্ঞ- ৮৩, ৮৪
রাবণ- ৩১-৪৬, ৪৮-৫০, ৫২-৫৭, ৫৯-৬৩, ৬৫, ৬৮-৬৯, ১১১
রাধা (১)- ১২১, ১২৪-২৭
রাধা (২)- ৯৫
রাবতী- ১৪২
রাম- ২৩-২৫, ২৭-৩২, ৩৬-৩৮, ৪০-

www.pathagar.com

৪৭, ৫০-৫৯, ৬২-৬৬, ৬৮-৭২, ১১১, ১৭৬, ১৯৯, ১৩৩, ১৭৬
রাহু- ৫২, ১৩৮-৪০, ১৮০
রুক্মকবচ- ১১৮
রুক্মেষু- ১১৮
রুদ্র- ১৫৭-৫৯, ১৭০
রুষদ্র- ১১৮
রেণুকা- ১৫৩
রেবন্ত- ৮১
রোহিণী- ১১৯, ১২৮

লক্ষ্মণ- ২৪, ২৫, ২৭-৩২, ৩৭-৪৭, ৫১, ৫৩-৫৫, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৮-৭২, ১৯৯
লক্ষ্মী- ১২৪-২৬, ১৩৩, ১৪১-৪৬, ১৬৯
লঙ্কা- ৩২, ৩৫, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৮-৫১, ৫৩, ৫৫-৫৭, ৫৯-৬১, ৬৩, ৬৮
লব- ২৪, ৬৪, ৬৫, ৭১
লবণ, অসুর- ৩৪
লোপামুদ্রা- ১৮৩-৮৪
লোভ- ১৭৭

শকট, অসুর- ১২২
শকুন্তলা- ১৩৭, ১৯৯
শকুনি- ৮৪-৮৬, ৮৮-৮৯, ১০৭, ১১৮
শঙ্খ- ১০৩
শতঘ্নী অস্ত্র- ৬০
শতদ্রু- ১৪২
শতানীক- ১০০
শত্রুঘ্ন- ২৫, ২৮-৩১, ৭০, ১৯৯
শনি- ১৩৯, ১৪৪-৪৬, ১৬৮, ১৮০
শমন- ৫৮, ১৯৭
শরদ্বান- ১০২
শর্মিষ্ঠা- ১১৭
শল্য- ৮০, ১০৪-০৬, ১১২
শশবিন্দু- ৩৩, ১১৮
শান্তনু- ৭৫, ৭৭-৭৯
শাস্তা- ২৪, ২৮
শার্ঙ্গ- ১৩৩
শাল্বরাজ- ৭৯, ৯৮, ১৭৭
শিখণ্ডী- ৯৯-১০১, ১০৫
শিতেষু- ১১৮
শিনি (১)- ১১৮
শিনি (২)- ১১৮
শিব- ২৫-২৬, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৮, ৬৭, ৯৯, ১০৭, ১১৯, ১২৮, ১৩৩-১৩৫, ১৪১, ১৫৭-৬০, ১৬৩-৭২, ১৮১, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯
শিশুপাল- ১৭৭
শুক্র (১)- ১১৭, ১৫১, ১৫২
শুক্র (২)- ১৩৯, ১৮০
শুক্লা একাদশী- ৩৩
শুম্ভ- ১১১, ১৯০-৯২
শূর (১)- ১১৮
শূর (২)- ১১৮
শূর্পণখা- ৩০, ৩১, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৫৩, ৬৫, ৬৮
শৈব্যা- ১৬১-৬৩
শ্যাম- ১২৭
শ্রদ্ধা- ১৭৯
শ্রী- ১৬৯
শ্রীকৃষ্ণ- ৮৮, ১১৮
শ্রীবৎস- ১৪৫-৪৬
শ্রুতকর্মা- ১০৭
শ্রুতকীর্তি- ২৬-২৭, ৩১

সগর- ১৭৬, ১৮৮-৮৯
সদাশিব- ১৬০
সতী- ৬৭, ১৬৩-৬৫, ১৬৯
সত্বত- ১১৮
সত্যক- ১১৮
সত্যজিৎ- ১১৮
সত্যবতী- ৭৫-৭৬, ৭৮-৮০, ৯৩
সত্যবান- ১৬১-৬৩
সত্যযুগ- ৩৩, ৩৪, ৪২, ১৭৬
সপ্তপুরী- ১৬৬
সপ্তর্ষি- ১৪৭, ১৭৬
সপ্তসিন্ধু- ১৪২
সমন্তপঞ্চক- ৯৭
সমুদ্র- ৪৭

www.pathagar.com

সম্মোহন অস্ত্র- ৯৩
সরমা- ১৪৯
সরযূ (নদী)- ৭১
সরস্বতী, দেবী- ৪৯, ১৩৩, ১৪১-৪৩
সরস্বতী (নদী)- ১৪২, ১৭৭
সহদেব- ৮১, ৮৩, ৮৬, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৭, ১০৬, ১১০
সহস্রজিৎ- ১১৮
সংজ্ঞা- ১৩৯, ১৪৪, ১৮০, ১৯৫, ১৯৬
সংযমনী- ১৯৫, ২০৩
সংহ্লাদ- ১০৪, ১৫০
সাগর- ১২৩, ১২৫
সাবিত্রী (১)- ১৬১-৬৪
সাবিত্রী (২)- ১৬১
সাত্যকি (১)- ৯৭, ১১০
সাত্যকি (২)- ১১৮
সিন্দুর- ১৬৯
সিন্ধু- ১৪২
সিংহিকা- ১৩৮
সীতা- ২৪, ২৬-২৭, ৩০-৩২, ৩৭, ৩৮-৪১, ৪৪-৪৬, ৫৩, ৬২-৬৭, ৬৯, ৭০
সীরধ্বজ, জনক- ২৬-২৭, ২৯, ৩১, ৬৪, ৬৬
সুকেতু- ৩৭
সুগ্রীব- ৪০-৪১, ৪৬, ৫১, ৫৩, ৬২
সুতল- ২০৩
সুদর্শন চক্র- ১৩৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৫
সুদেষ্ণা (১)- ৯০
সুদেষ্ণা (২)- ১৫০
সুনীতি- ১৪৬-৪৭
সুন্দ- ৩৭
সুপ্রতীক- ১৮৫-৮৬
সুবল- ৮১
সুমতি- ১৮৮
সুমালী- ৩৪-৩৫, ৪৩-৪৪, ৫৯, ১০৪, ১৯২
সুমিত্রা- ২৪-২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৭০, ১৯৯
সুমেরু (পর্বত)- ৩৩, ৪৩, ১৮৪
সুষশা- ১৬৭
সুরথ- ৩৬, ৪২, ৫৮
সুরভি (১)- ১৪৯
সুরভি (২)- ২০৪
সুরসা- ১৪৯
সুরা- ১৪১
সুরুচি- ১৪৬
সুষেণ- ৫৪, ৫৫
সূক্ষ্ম- ১৫১
সূর্য- ৪০, ৫২, ৯৫, ৯৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৬৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৫-৯৭, ২০২-০৩
সূর্যগ্রহণ- ১৩৯
সূর্যবংশ- ২৪, ২৫, ২৮, ৩২, ৬৮, ১৭৬
সৈরিন্ধ্রী- ৯০-৯২
সোম (১)- ৭৭
সোম (২)- ১৩৯, ১৮০
সোম (৩)- ১৪১
সৌভপতি দ্রুমিল- ১২৭
সৌভরি, ঋষি- ৩৩
স্কন্দ- ১৭০
স্বর্গ- ৪২, ৪৮, ৪৯, ৯২, ৯৭, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ১৫১, ১৯০, ১৯১, ১৯৫, ২০৩
স্বর্ণধেনু- ১৫১
স্বাহি- ১১৮
স্মরহর- ১৫৯
স্থূণাকর্ণ- ৯৯

হনুমান- ৪৬, ৫১-৫৬, ৬০
হর- ২৫, ২৯, ১৫৭, ১৫৯
হরধনু- ২৫-২৭, ২৯
হরি- ১৪৭, ১৫০, ১৫৭
হরিশ্চন্দ্র- ১৭৬
হস্তিনাপুর- ৭৮, ৮২, ৮৪, ৯৫, ৯৭, ১০২
হংসধ্বজ- ১৭৭
হাটকী (নদী)- ২০৩
হিমালয়- ৬৭, ১৬৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ১৯৩
হিরণ্ময়ী মালা- ১০৮
হিরণ্যকশিপু- ১৩৬, ১৩৮, ১৪৯, ১৫১
হিরণ্যকশিপু (বংশ)- ৩৭

www.pathagar.com

হিরণ্যপুরের দৈত্য- ২০৪
হিরণ্যবর্মা- ৯৯
হিরণ্যাক্ষ- ১৪১
হিংসা- ১৭৭
হেহয়- ১১৮
হৃদিক- ১১৮
হ্রাদ- ১৫০

ভিনদেশি পুরাণ

অলিম্পাস পর্বত- ২০৮
অ্যাকিলিস- ২০৯-১০
অ্যাপোলো- ২০৮
অ্যারেস- ২১১
আফ্রোদিতি- ২০৮, ২১০-১১
ঈনিয়াস- ২১১
উদান (ওডেন)- ২১২
এপিমিথিউস- ২০৮-০৯
এরস- ২১১
কিউপিড- ২১১-১২
গ্রিস ও ট্রয়ের যুদ্ধ- ২০৯-১০
জিউস- ২০৮-০৯
টাইটান- ২০৮-০৯
টর (থর)- ২১২-১৩
ট্রাইগুল- ২১৩
থেমিস- ২০৯
দিদো- ২১১
প্যান্ডোরা- ২০৮-০৯
প্রমিথিউস- ২০৮-০৯
পেলেউস- ২০৯
প্যারিস- ২১০
ফিনিক্স- ২০৭-০৮
ফ্রেইয়া- ২১২-১৩
বাইগুল- ২১৩
ভেনাস- ২১১
ভোলভা- ২১২
মেনেলাউস- ২১০
স্পার্টা- ২১০
সাইকি- ২১১
স্টিক্স নদী- ২০৯
স্লেইপনির- ২১২
হার্মিস- ২০৮
হেরা- ২০৮
হেফেস্টাস- ২০৮
হেক্টর- ২১০
হেলেন- ২১০

অ্যাপোলিয়াস- ২১১
ঈনিড- ২১১
কমপ্লিট কালেকশন অফ জেন্টল অ্যান্ড ইনজিনিয়াস কনভার্সেশন- ২১৪
গোল্ডেন অ্যাস- ২১১
জোনাথন সুইফট- ২১৪
ভার্জিল- ২১১
রেনেসাঁ- ২১১

www.pathagar.com

বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অ

১. অকালবোধন ৪২
২. অগস্ত্য যাত্রা ১৮৩
৩. অগ্নিপরীক্ষা ৬৩
৪. অতি মন্থনে বিষ (গরল) ওঠে ১৪০
৫. অতি দানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই ১৫০
৬. অতিথি নারায়ণ ১৩৪
৭. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ১৭১
৮. অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে ১৬৯
৯. অমৃতে অরুচি ১৩৫
১০. অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই ১৫০
১১. অভেদাত্মা হরিহর ১৫৭
১২. অশ্বত্থামা হত ইতি গজ (অশ্বত্থামা হত) ১০২

এ

১৩. একাদশে বৃহস্পতি ১৭৯
১৪. এক রামে রক্ষা নাই দোসর সুগ্রীব ৩৮
১৫. এক রামে রক্ষা নাই দোসর লক্ষ্মণ ৩৮

ক

১৬. কলিকাল ১৭৫
১৭. কংস মামা ১২৭
১৮. কংস রাজার বদ ফরমাশ ১২৯
১৯. কাক ভূষণ্ডি ১১০
২০. কানায়ে ভাগিনা ১২৫
২১. কাশীতে ভূমিকম্প ১৬৬
২২. কাল রাম রাজা হবে, আজ রামের বনবাস ২৮
২৩. কালনেমির লঙ্কাভাগ ৫৬
২৪. কুম্ভকর্ণের ঘুম/নিদ্রা ৫০
২৫. কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙা/ নিদ্রা ভঙ্গ ৫১
২৬. কীচক বধ ৮৯
২৭. কুঁতিয়ে ম'ল দেবকী, নাম পাড়ান যশোদারাণী ১২১
২৮. কুরুক্ষেত্র ৯৭

গ

২৯. গজকচ্ছপ লড়াই (গজকচ্ছপী লড়াই) ১৮৫
৩০. গণেশ উল্টানো ১৬৮
৩১. গন্ধমাদন বয়ে/তুলে আনা ৫৪
৩২. গরু চুরির অপরাধে কপিলার বন্ধন ১৮৮
৩৩. গুণের কথা বলব কত, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত ৪৮
৩৪. গোকুলের ষাঁড় ১২১

ঘ

৩৫. ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট ৪৫
৩৬. ঘর-সন্ধানী বিভীষণ ৪৩
৩৭. ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট ৪৫
৩৮. ঘরের শত্রু বিভীষণ ৪৩
৩৯. ঘোর কলিকাল, ঘোর কলি ১৭৫

www.pathagar.com

চ
৪০. চণ্ডমূর্তি ১৯১
৪১. চিত্রগুপ্তের খাতা ১৯৯
৪২. চোরা গরুর সঙ্গে কপিলার বন্ধন ১৮৮

জ
৪৩. জড়ভরত ১৯৯

ত
৪৪. তাণ্ডবলীলা ১৬০

ঠ
৪৫. ঠুঁটোজগন্নাথ ২০০

দ
৪৬. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ১৬৪
৪৭. দাতা কর্ণ ৯৫
৪৮. দেবর লক্ষ্মণ ৩১
৪৯. দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ১৪৯
৫০. দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ৮৬

ধ
৫১. ধনুক ভাঙা পণ ২৫
৫২. ধন্বন্তরি বিদ্যা ১৩৭
৫৩. ধর লক্ষ্মণ ২৯
৫৪. ধরণী দ্বিধা হও ৬৩
৫৫. ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ১১২
৫৬. ধর্মের ষাঁড় ১২১
৫৭. ধুন্ধুমার কাণ্ড ১৪৮
৫৮. ধ্রুব সত্য ১৪৬

ন
৫৯. নগদ নারায়ণ ১৩৩
৬০. না বিয়ায়ে কানায়ের মা ১২০
৬১. নাগপাশে আবদ্ধ করা, নাগপাশে বাঁধা ৪৭

প
৬২. পঞ্চপাণ্ডব ৮০
৬৩. পরশুরামের কুঠার ১৫৩
৬৪. পাণ্ডববর্জিত দেশ ৮৩
৬৫. পুতনা রাক্ষসী ১২২

ব
৬৬. বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায় ১৯২
৬৭. বালখিল্য স্বভাব (বালখিল্যতা) ১৮৬
৬৮. ব্যাস-কাশী ১৬৭
৬৯. বিদুরের খুদ ৯৩
৭০. বিনা দানে মথুরা পার ১২৬
৭১. বৃন্দে দূতী ১২৩
৭২. বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার ৯২

ভ
৭৩. ভগবানের আসন বটপত্র ১৩৪
৭৪. ভারত ছাড়া কথা নাই ৭৫
৭৫. ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেল, শল্য হলো রথী ১০৪
৭৬. ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ৭৭
৭৭. ভীষ্মের শরশয্যা ১০১
৭৮. ভূতের মুখে রামনাম ১৭০
৭৯. ভূষণ্ডির কাক (ভূষণ্ডি কাক, ভূশণ্ডি কাক) ১১০

ম
৮০. মনে মনে লঙ্কা ভাগ ৫৬
৮১. মান্ধাতার আমল ৩২
৮২. মারীচের দশা ৩৭

য
৮৩. যদুবংশ ১১৭
৮৪. যক্ষের চোখে ঘুম নাই ১৯৩
৮৫. যক্ষের ধন ১৯৪
৮৬. যজ্ঞের ঘোড়া ১৮১
৮৭. যমের অরুচি ১৯৭
৮৮. যমের খাতায় তলব পরা/ নাম ওঠা ১৯৫
৮৯. যমের দোসর ১৯৬
৮০. যমের (বা যমলোকের) ডাক আসা ১৯৫
৯১. যশোদা কী ভাগ্যবতী, পরের পুতে পুত্রবতী ১১৯
৯২. যা নাই ভারতে, তা নাই 'ভারতে/ভূ-ভারতে ৭৫

www.pathagar.com

৯৩. যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ ৬৬
৯৪. যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ ৩৪

র
৯৫. রক্তবীজের ঝাড় ১৮৯
৯৬. রসাতলে যাওয়া ২০৩
৯৭. রাম না হতেই রামায়ণ ২৩
৯৮. রাম বলেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বলেন এক্ষণ ৭০
৯৯. রাম-রাবণের যুদ্ধ ৪৫
১০০. রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব ৩৭
১০১. রামের ভাই লক্ষ্মণ ৭০
১০২. রামরাজ্য ৬৮
১০৩. রামরাজত্ব ৬৮
১০৪. রামের হনুমান ৫২
১০৫. রাবণের চিতা ৫৬
১০৬. রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন ৪৬
১০৭. রাবণের পুরী ছারখার ৫৯
১০৮. রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ ৩৭
১০৯. রাহুর গ্রাস ১৩৮
১১০. রাহুর দশা ১৩৯
১১১. রুদ্রমূর্তি ১৫৮
১১২. রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ১৪১

ল
১১৩. লক্ষ্মণের ফল ধরা ২৯
১১৪. লক্ষ্মণের মতো দেবর হোক ৩১
১১৫. লঙ্কাকাণ্ড ৪৫
১১৬. লঙ্কা ভাগ করা ৫৫
১১৭. লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা ৬১
১১৮. লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা ৬১
১১৯. লঙ্কায় সোনা সস্তা ৬০
১২০. লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড় ১৪৩
১২১. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ১৪৪

শ
১২২. শকুনি মামা ৮৩
১২৩. শনির দশা ১৮০
১২৪. শনির দৃষ্টি হলে, পোড়া শোল পালায় ১৪৪
১২৫. শনির ফের/ আছর ১৮০
১২৬. শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম ৫৭
১২৭. শরশয্যা ১০১
১২৮. শাপে বর ২৪
১২৯. শিখণ্ডী খাড়া করা ৯৮
১৩০. শিব নাচে রঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে ১৬৫
১৩১. শিবের কোনো খোঁজ নাই, গাজনের ঘটা ভারি ১৭২
১৩২. শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ১২৬

স
১৩৩. সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ? ১০৭
১৩৪. সতী সাবিত্রী ১৬১
১৩৫. সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে ২০২
১৩৬. সদাশিব ১৫৯
১৩৭. সবে কলির সন্ধ্যা ১৭৯
১৩৮. সাক্ষীগোপাল ২০০
১৩৯. সাত খণ্ড (সারা রাত) রামায়ণ পরে, বলে সীতা কার বাপ/ভাই? ৬২
১৪০. সাপকে মারলে শিবেরও লাগে ১৫৮
১৪১. সীতা সতী ৬৬
১৪২. সীতাদুঃখ ৬৪
১৪৩. সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই ৬৯
১৪৪. সোনার লঙ্কা ছারখার ৫৯

হ
১৪৫. হরিহর আত্মা ১৫৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Pouranik Bagdhara

by Nabeel Onusurjo

www.abosar.com
www.protikbooks.com

Abosar Prokashana Sangstha

Pouranik Bagdhara

9 789848 798034